প্রতিচিন্তা

খাতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

তৃতীয় বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০১৩

সম্পাদক

মতিউর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক

বিনায়ক সেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

খন্দকার সাখাওয়াত আলী

উপদেষ্টা পর্ষদ

নুরুল ইসলাম ❑ আনিসুজ্জামান
আজিজুর রহমান খান ❑ সিরাজুল ইসলাম
রওনক জাহান ❑ আকবর আলি খান
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ❑ মাহবুব হোসেন

সম্পাদনা পর্ষদ

নজরুল ইসলাম ❑ বদরুল আলম খান ❑ হাসান ফেরদৌস
আলী রীয়াজ ❑ আল মাসুদ হাসানুজ্জামান ❑ সাজ্জাদ শরিফ

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

শিল্প নির্দেশক : অশোক কর্মকার

সহকারী সম্পাদক : খলিলউল্লাহ্

দাম : ৫০ টাকা

ওয়েবসাইট : www.protichinta.com
ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2013; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

ইতিহাস

মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান (১৭৮৪-১৮৩০)
সিরাজুল ইসলাম ৭

রা জ নী তি

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?
মির্জা হাসান ২৯

স মা জ

খনার বিজ্ঞান-দর্শন
পাভেল পার্থ ৫৫

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শূদ্র সম্প্রদায়
রাহমান চৌধুরী ১০৯

অ নু স্মৃ তি

'সওগাত' ও আমার জীবনকথা
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাক্ষাৎকার ১৩২

ব ই আ লো চ না

কর্মী থেকে নেতা : উত্তরণের অসমাপ্ত কাহিনি
আবুল মোমেন ১৮০

লেখক পরিচিতি ১৯৪

ইতিহাস

মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান
(১৭৮৪-১৮৩০)

সিরাজুল ইসলাম

আঠারো শতকের শেষ পাদে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের পর উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনা খুবই অপ্রত্যাশিত, কেননা মার্কিনরা আদর্শগতভাবে শিল্পায়নে বিশ্বাসী ছিল না। উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিল কৃষি অর্থনীতি। এ আদর্শের ভিত্তি ধর্মীয় বিশ্বাস। খ্রিষ্টধর্মে কৃষিকে আদর্শায়িত করা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পকে নয়। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও আদর্শগতভাবে মার্কিনরা সমকালীন ফরাসিদের মতো ফিজিওক্রেসি তত্ত্ব অনুসরণ করত। এ তত্ত্বমতে, সামাজিক সুখ ও শান্তির জন্য একমাত্র প্রাকৃতিক উপায় কৃষি, যা খ্রিষ্টধর্মে বরাবর নন্দিত ছিল। মার্কিনরা কৃষিকে অর্থনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল মূলত ধর্মীয় কারণেই। বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, টমাস জেফারসন, জেমস মেডিসন প্রমুখ প্রথম সারির নেতা সবাই ছিলেন ফিজিওক্রেসি দর্শনে বিশ্বাসী। স্বাধীনতার পর মার্কিন কংগ্রেস বাজার অর্থনীতি, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা অর্থনীতি, ব্যাংক প্রভৃতির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। তবে বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও, বিশ্ববাস্তবতার নিরিখে মার্কিন কংগ্রেস সীমিতভাবে মুদ্রা ও ব্যাংক প্রবর্তনের অনুকূলে সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করে ১৭৯০ সালে। তবে মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত মার্কিন দেশে কৃষি ও পণ্য বিনিময় অর্থনীতি ছিল সবচেয়ে প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত। এ ধারা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাজার অর্থনীতির রূপ ধারণ করে শিল্পবিপ্লবের পর। অর্থাৎ ১৮২০-এর দশক থেকে।

যে অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল না, যেখানে

অর্থনীতি সঞ্চালিত হয়েছে সাধারণত সরাসরি কৃষিপণ্য ও শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে এবং যে অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল শিল্পবিরোধী ফিজিওক্রেসি; বিশেষ করে যেখানে ১৮১৩ পর্যন্ত সব রাষ্ট্রপতিই ছিলেন ফিজিওক্র্যাট অর্থাৎ শিল্পায়নের বিপক্ষে, সেখানে ১৮১৩ থেকে অর্থনীতিতে স্পষ্টত একটি শিল্পবিপ্লবের সূচনা বিস্ময়কর ঘটনা বটে। এই বিস্ময় বহুগুণ বেড়ে যাবে এটা মনে রাখলে যে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে মার্কিনদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনব্যবস্থা নয়; এর অন্তর্নিহিত কারণ তদানীন্তন বাংলার সাথে বাণিজ্য বা সংক্ষেপে বাংলা-বাণিজ্য। অথচ, এ বাংলা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য না ছিল মার্কিন সরকারের কোনো সমর্থন-সহযোগিতা, না ছিল ভারত মহাসাগর ও বাংলা সম্পর্কে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং না ছিল কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি জোগানের ব্যবস্থা। এমনকি ভারতের কোনো স্থানীয় সরকার বা অন্য কোনো এজেন্সির সঙ্গে মার্কিনদের কোনো যোগাযোগও ছিল না। এমনকি ভারত মহাসাগরের নাব্যতা-নৌ-চালনা বিষয়ে তাদের কাছে কোনো চার্ট পর্যন্ত ছিল না। এমতাবস্থায় মার্কিনরা স্বাধীনতালাভের পরপরই কীভাবে বঙ্গোপসাগরে এসে নোঙর ফেলল, এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেক নৌ-ঐতিহাসিক।[১] যা হোক, নিউ ইংল্যান্ডের ইয়াংকিরা[২] এ বিপ্লবের নায়ক। ইয়াংকি বণিকদের কলকাতা বাণিজ্যে যোগদান করার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম মার্কিন দেশে বাজার অর্থনীতি প্রচলিত হয় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই বাজার অর্থনীতিরই সরাসরি প্রভাবে অচিরেই ঘটে আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব, যা কি না পৃথিবীর শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঘটনা।

বাংলায় ইয়াংকি বণিকদের আগমন

১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপরই, অর্থাৎ ১৭৮৪-৮৫ সাল থেকেই আমেরিকার ইয়াংকিরা বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে যোগদান করে এবং বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালায় এবং অচিরেই কলকাতার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। প্রশ্ন তোলা যায়, যেখানে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায় মার্কিনদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো, সেখানে ব্রিটিশ ভারতে তাদের এমন সুস্বাগত জানানোর কারণ কী? এ অঞ্চলে বাণিজ্য করার

১ নৌ-ঐতিহাসিকদের অভিমত জানতে দেখুন, Tyler Dennett, *Americans in Eastern Asia*, (New York, The Macmillan Comany, 1922); Northcote C. Parkinson, *Trade in the Eastern Seas*, 1793-1813, (The University Press 1937).

২ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পরস্পর লাগালাগি ছয়টি অঞ্চল বা স্টেটস নিয়ে গঠিত ছিল নিউ ইংল্যান্ড; যথা কানেটিকাট, মেইন, ম্যাসাচুসেট্স, নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যান্ড ও ডারমন্ট। বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে এমন জুটি মার্কিন রাষ্ট্রে আর নেই। নিউ ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা অধিকাংশই আদিতে ব্রিটিশ এবং ইয়াংকি নামে পরিচিত।

কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা সম্পর্ক না থাকা এবং হাতে কোনো পুঁজি না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করে এর পরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব বাংলায় এসে খোদ ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে? এদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের পুঁজি ও নৌ-বল জোগাল কারা? কৃষিনির্ভর ও ফিজিওক্রেটিক মার্কিনদের পক্ষে অজানা-অচেনা বঙ্গোপসাগরে এসে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত এসব প্রশ্নের উদ্রেক করে। তবে এসব প্রশ্নের জট খুলে যায় যখন দেখি বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ানরা লুটপাট এবং বেআইনিভাবে গড়ে তোলা বিশাল অর্থসম্ভার পণ্যে রূপান্তরিত করে তা ইয়াংকিদের মাধ্যমে স্বদেশে চালান করছে। অর্থাৎ ইয়াংকিদের ভারত ব্যবসার মূলে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সহযোগিতা। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের লুটপাটের মাধ্যমে গড়ে তোলা ব্যক্তিগত সম্পদ স্বদেশে প্রেরণের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ ইয়াংকি জাহাজে করে স্বদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ইয়াংকিদের বঙ্গ বাণিজ্যে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়।[৩] সোজা কথায়, বাংলায় ইয়াংকিদের আগমনের মূলে ছিল প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসা করা নয়, যা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না, কেননা তাদের পুঁজির অভাব ছিল। এর মূল কারণ ছিল দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনকারী ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের চোরাই সম্পদ মার্কিনদের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করার সংকল্প।

মার্কিন-বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কের স্বর্ণযুগ ছিল ১৭৯৫ থেকে ১৮২০ পর্যন্ত, যখন মার্কিন শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়। যা হোক, এ প্রচেষ্টায় দেখাতে চাই যে বাংলা-বাণিজ্য থেকে মার্কিনরা বিপুলভাবে বাণিজ্যিক পুঁজি নির্মাণের সুযোগ পেয়েছিল ১৮০৭ সাল পর্যন্ত। এর পর থেকে ইউরোপে ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমাগত ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের পরিবেশে এবং প্রায়ই মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা ও বণিকদের বন্দী করে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করার পটভূমিতে মার্কিন কংগ্রেস এমবার্গো অ্যাক্ট (১৮০৭)-এর মাধ্যমে মার্কিনদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে মার্কিন বণিকদের মহালাভজনক বাংলা-বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক পুঁজি বিনিয়োগের বাইরে এসে অলস পুঁজিতে পরিণত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে অলস বাণিজ্যিক পুঁজিকে উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করার

৩ কোম্পানি সিভিলিয়ানদের দুর্নীতির ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের সভায় বিতর্ক দ্রষ্টব্য, Court of Directors to Governor General of India, 6 November 1807, (British Library, Home Miscellaneous Series, vol. 524, Secret Department).

লক্ষ্যে বঙ্গ বাণিজ্যে রত ফ্রান্সিস কেবট লয়েল ও প্যাট্রিক ট্রেসি জ্যাকসনের নেতৃত্বে কতিপয় ভারতীয় বণিক ইংল্যান্ডের আদলে আমেরিকায়ও একটি শিল্পবিপ্লব বিকাশের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮১২ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যেই তাঁরা নিউ ইংল্যান্ডে বেনিয়া পুঁজিবাদ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের মতো একটি শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তনে সমর্থ হন।[৪] ঐতিহাসিক ভেরা শ্লেকম্যান এই গ্রুপটির নাম দেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস (Boston Associates)।[৫] এই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসই আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের রূপকার। এ গোষ্ঠীর সবাই কোনো না কোনো সময় কলকাতা বাণিজ্যের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করেন। এটা এখন সর্বস্বীকৃত সত্য যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের রূপকার ছিল বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস। এ প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য হবে মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসদের চিহ্নিত করা এবং মার্কিন শিল্পবিপ্লবে তাঁদের অবদান মূল্যায়ন করা।

শিল্পবিপ্লবের আগে মার্কিনদের অর্থনৈতিক জীবনধারা

কলকাতা বাণিজ্যে যোগদানকালে মার্কিনদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল, এ ব্যাপারে সামান্য দৃষ্টিপাত প্রাসঙ্গিক। দাসশ্রমভিত্তিক কৃষি ছিল স্বাধীনতা-পূর্ব মার্কিন অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। আদর্শিকভাবে মার্কিন কৃষক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ সবাই ছিলেন ফিজিওক্রেসি মতবাদে বিশ্বাসী। এ মতবাদ অনুসারে, মানুষে মানুষে সাম্য ও সম্প্রীতি রক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ কৃষি অর্থনীতি। ফিজিওক্রেসি তত্ত্বমতে, অর্থনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত কৃষি, কেননা একমাত্র কৃষি অর্থনীতিই সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে সক্ষম। সর্বোচ্চ সুখ ও শান্তির জন্য ফিজিওক্রেসি দর্শন সুপারিশ করে মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রেখে জীবনধারণের জন্য, অর্থাৎ কৃষির ওপর মূল উৎপাদনকাঠামোকে স্থাপিত করার জন্য। ফিজিওক্রেসি মতবাদ অনুসারে অর্থনৈতিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প মানুষে মানুষে আর্থসামাজিক ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং ওই ব্যবধান থেকে উদ্ভূত হয় শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ। মার্কিন সমাজ ফিজিওক্রেসিকে এমন একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যে আদর্শ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বহীন ও ভারসাম্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আদর্শিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মার্কিনদের মধ্যে কৃষি এমনই একটি আদর্শ ছিল যে, কোনো বিদেশি নতুন ঔপনিবেশিক আগন্তুক এলে তিনি

৪ সেকালের ভারতে যেসব স্থানীয় বণিক বিদেশি বণিকদের জন্য বাজারে মধ্যস্থতাকারী ও পুঁজি লগ্নিকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন তাঁরা বেনে বা বানিয়া হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। অভিজ্ঞতা ও ভাষাজ্ঞান ব্যবহার করে তাঁরা বিদেশিদের সহায়তা করতেন।

৫ নামটি প্রথম ব্যবহার করেন ইতিহাসবিদ Vera Shlakmen তাঁর *Economic History of a Factory Town: A Study of Chicopee,* Massachusets (1935) শীর্ষক গ্রন্থে।

নির্দ্বিধায় কৃষিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন। মার্কিনদের বিশ্বাস ছিল, মানুষে মানুষে সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র কৃষি, যা প্রকৃতির ভারসাম্য কখনো বিনষ্ট করবে না। উল্লেখ্য যে, মার্কিন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কট্টরভাবে ফিজিওক্রেসি মতবাদের অনুসারী। ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন, অ্যাডামস, জেফারসন, ম্যাডিসন প্রমুখ নেতা কৃষিকে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও জাতির আদর্শ হিসেবে গণ্য করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কৃষিই ছিল মার্কিন অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

প্রাচীনকাল থেকেই আন্তএশীয় বাণিজ্য এবং আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল, বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল। কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী, সুশীল চৌধুরী, রজত দত্ত, ওম প্রকাশ, অনিরুদ্ধ রায়, সঞ্জয় সুব্রামনিয়ম, রিচার্ড ইটন, ডাইটমার রটরমন ও আরও অনেক নৌ-পণ্ডিতের গবেষণায় দেখা যায়, বঙ্গোপসাগর ছিল প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডল। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত আন্তমহাসাগরীয় বাণিজ্যে ভারত মহাসাগর, বিশেষ করে এর বঙ্গোপসাগর এলাকা, বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক ইতিহাসে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁদের মতে, আধুনিক ইউরোপে প্রথমে বাণিজ্যিক বিপ্লব এবং পরে শিল্পবিপ্লব পুষ্টি লাভ করেছে মূলত ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য থেকে। তবে তাঁদের গবেষণায় পশ্চিমা দেশের একটি জাতির বাণিজ্যিক উপস্থিতি ও গুরুত্ব এখনো ঐতিহাসিকভাবে আলোচনায় আসেনি, যদিও সে জাতির প্রাথমিক রূপান্তরে সবচেয়ে বড় এবং সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য। এটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই মার্কিন দেশের ইয়াংকিদের অর্থাৎ নিউ ইংল্যান্ডের বণিকদের বঙ্গোপসাগর এলাকায় আগমন মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু যদিও এ ঘটনার পরিব্যাপ্তি মার্কিনদের বিশ্বসমাজে আবির্ভাব ও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, তথাপি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমেরিকার বিদ্যমান ইতিহাসে কোনো আলোচনা দেখা যায় না। মার্কিন জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বঙ্গ-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক, কেননা এ অধ্যায়টি হলো আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের অধ্যায়। এ প্রবন্ধে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে ১৮১২-১৮২৫ সময়কালে প্রথম মার্কিন শিল্পবিপ্লব যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই পুঁজির মালিক হয়েছেন বাংলা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং বাংলা-বাণিজ্য থেকে অর্জিত পুঁজিই তাঁরা বিনিয়োগ করেছেন আমেরিকার শিল্পায়নে। কিন্তু মার্কিন শিল্পায়নের ইতিহাসে বাংলা-বাণিজ্যের ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত।

মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসে শিল্পবিপ্লবের পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে অনেক

লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নিউ ইংল্যান্ডের এই শিল্পবিপ্লবের পুঁজি কীভাবে এবং কোথা থেকে আহরিত হলো সে ব্যাপারে সব ঐতিহাসিক নীরব। মার্কিন শিল্পবিপ্লবের উদ্যোক্তারা বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে পরিচিত। কারা ওই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস? কোথা থেকে এল এঁদের পুঁজি? মার্কিন ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে নীরব। তাঁরা জোর দিয়েছেন জাতীয় চরিত্রের ওপর, মেধা ও নেতৃত্বের ওপর। এ প্রবন্ধে আমরা জানাতে চাই যে মার্কিন দেশের প্রথম শিল্পবিপ্লবের যাঁরা কর্ণধার, বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে যাঁরা ইতিহাসে খ্যাত, তাঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত এবং কলকাতা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই তাঁরা মার্কিন মুলুকের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি পুঁজিপতি শ্রেণীতে পরিণত হন। ইয়াংকি বণিকেরা নিরপেক্ষ জাতি হিসেবে যখন কলকাতা বাণিজ্য থেকে অধিক থেকে অধিক হারে মুনাফা অর্জন করছিলেন, তখন শুরু হয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের ওপর। মার্কিন বাণিজ্যের ওপর ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের প্রভাব লক্ষ করার আগে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিনদের বাণিজ্যের পরিধি ও তাৎপর্যের ওপর কিছু আলোকপাত প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে ইয়াংকি বণিকদের যোগদান

মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলে ও মার্কিন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষরকারী ও ধনী ব্যবসায়ী রবার্ট মরিস (১৭৩৪-১৮০৬) সর্বপ্রথম বঙ্গোপসাগরে 'Empress of China' নামের একটি জাহাজ ১৭৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেরণ করেন। এর চার মাস পরই টমাস বেল-এর নেতৃত্বে 'The United States of America' নামে একটি পণ্যবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে এসে উপস্থিত হয়। ১৭৮৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর মাদ্রাজ বন্দরে এসে জাহাজটি নোঙর ফেলে। এ ঘটনার ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক তাৎপর্য নিয়ে মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড মেকার্টনি (১৭৮১-৮৫) গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উদ্দেশ করে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠান। এর মর্ম ছিল এমন যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যে মার্কিনদের যোগদান ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।[৬] মেকার্টনির ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল, তবে উল্টোভাবে। সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি ঘটেছিল ব্রিটিশ ভারতে নয়, আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডে, যেখানে ভারত বাণিজ্যের অভিঘাতে ১৮১৩-১৮২০ সময়কালে

৬ Madras Governor Lord Macartney to Governor General Warren Hastings, 30 January, 1785, Madras Public Department, Home Miscellaneous Series, (British Library, Oriental Records), vol. 605, পৃ. ৭৫।

একটি শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। যা হোক, রোড-আইল্যান্ড থেকে 'Hydra' নামে আরেকটি মার্কিন জাহাজ হুগলি বন্দরে এসে নোঙর ফেলে ১৭৮৫ সালের জুন মাসে। প্রভিডেন্স থেকে উইলিয়াম ব্রাউন 'General Washington' নামের একটি জাহাজ মাদ্রাজে প্রেরণ করেন ১৭৮৭ সালে।

উল্লেখিত সব কটি অভিযাত্রা ছিল পরীক্ষামূলক। সেলেমের ইলিয়াস হাস্কেট ডার্বিই সর্বপ্রথম বণিক, যিনি নিয়মিতভাবে কলকাতায় একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজ পাঠানো শুরু করেন। তাঁর প্রতিটি অভিযাত্রাই ছিল সফল এবং অসাধারণ মুনাফা অর্জনকারী। ১৭৯০ থেকে কলকাতার সঙ্গে নিউ ইংল্যান্ডের ব্যবসা নিয়মিতভাবে শুরু হয়, বিশেষ করে ডার্বির বন্দর সেলেম থেকে। তখন থেকে প্রতিবছর নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বন্দর থেকে কলকাতাগামী জাহাজের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। প্রতিটি জাহাজই নিরাপদে এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১৭৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধি জে ট্রিটি সম্পাদিত হয়। ওই চুক্তির অধীনে মার্কিনরা কলকাতায় অন্যান্য স্বাধীন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর মতো বিশেষ সুবিধায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। এর পর থেকে ইয়াংকিদের কলকাতা বাণিজ্য পৌনঃপুনিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৭৯৫ সাল থেকে তা ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করে।

কলকাতায় ইয়াংকি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

কলকাতা তথা বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে ইয়াংকিদের বাণিজ্য ব্যাপকভাবে চলে ১৮২০ সাল পর্যন্ত, যখন মার্কিন শিল্পবিপ্লবের সূচনাপর্ব শেষ হয়। এ সময়কালে বঙ্গোপসাগরে ইয়াংকিদের ব্যবসার পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ বা অসম্ভব। কারণ প্রথমত, ইয়াংকিরা কলকাতায় বাণিজ্য করেছে কোম্পানিরূপে নয়, একেবারেই ব্যক্তিগতভাবে। ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবারই পুঁজি ছিল সীমিত এবং প্রায় সবাই পুঁজি ধার করতেন কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বানিয়াদের কাছ থেকে। অনেকেই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করতেন বাকিতে, আবার অনেকে সুদে ধার করা পুঁজিতে। কলকাতার বাঙালি বানিয়ারা ছিলেন তাঁদের প্রধান পুঁজি সরবরাহকারী। পুঁজি গড়ে তোলার জন্য কোনো কোনো ইয়াংকি প্রথমে কলকাতায় কেনাকাটা করতেন এবং প্রাচ্যের অন্য কোনো বন্দরে নিয়ে তা বিক্রি করতেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে ফের পণ্য কিনতেন অন্য কোথাও রপ্তানির জন্য। সমকালীন বাণিজ্য সমাজে এ ব্যবস্থাকে বলা হতো কান্ট্রি ট্রেড বা কোস্টাল ট্রেড। এসব উপকূলীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি তাঁরা অনুসরণ করতেন আরেকটি লাভজনক বাণিজ্য। সেটি ছিল ভাড়া বা পরিবহন বাণিজ্য ক্যারিং ট্রেড। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে অন্য বণিকদের পণ্য পরিবহন ছিল একটি বিনিয়োগবিহীন বাড়তি

ব্যবসা। মার্কিন বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের গোটা আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসত ভাড়া-বাণিজ্য থেকে।[৭] স্থানীয় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করাও ছিল ইয়াংকিদের আরেকটি লাভজনক ব্যবসা। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা দুর্নীতির মাধ্যমে যে আয় করতেন, তা তাঁরা দেশে পাঠাতেন সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে। কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে পণ্য কিনে তাঁরা তা ইয়াংকিদের মাধ্যমে স্বদেশে পাঠিয়ে দিতেন। রেমিট্যান্স ট্রেড নামে পরিচিত এ ব্যবসায় ইয়াংকিরা ব্রিটিশ আমলাদের বে-আইনিভাবে অর্জিত টাকা পণ্যাকারে ইউরোপে রপ্তানি করতেন। কলকাতা থেকে মালাক্কা পর্যন্ত সমগ্র এলাকার ভাড়া-বাণিজ্যের এক বড় অংশ ছিল ইয়াংকিদের নিয়ন্ত্রণে। এমনিভাবে প্রাচ্য-বাণিজ্যের সব সুযোগ ব্যবহার করে ইয়াংকিরা কলকাতায় ফিরে আসতেন শেষ লেনদেন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য। দেশে ফেরার পর বাড়তি পণ্য পুনরায় রপ্তানি করা হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে।

পুনরায় রপ্তানির বিপরীতে রৌপ্যমুদ্রা অর্জন করে এঁরা আবার পাড়ি জমাতেন কলকাতায় রৌপ্যের বিনিময়ে প্রাচ্যপণ্য ক্রয় করার জন্য। গোপনীয়তাসহ নানা কারণে এই ত্রিমুখী বাণিজ্যের কোনো সঠিক তথ্য নেই। অতএব, প্রাচ্য-বাণিজ্য থেকে কোন ইয়াংকি বণিক বার্ষিক কত আয় করলেন, তা বাইরের কারোর পক্ষে জানার কোনো উপায় ছিল না। তবে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় খবর উঠত, প্রাচ্য-বাণিজ্য করে কে কত বিত্তের অধিকারী হলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং পারস্পরিকভাবে সংঘবদ্ধ ব্যাপারিরা নিউ ইংল্যান্ডে পরিচিত ছিলেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে। এই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসরাই হলেন মার্কিন শিল্পবিপ্লবের প্রথম উদ্যোক্তা। মার্কিন শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে ওই দেশের পাঠ্যপুস্তকে, এমনকি গবেষণাগ্রন্থেও বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস সাধারণভাবে আমেরিকার প্রথম ধনীগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু মজার ব্যাপার, ওই ধনীগোষ্ঠী যে কলকাতা বাণিজ্য থেকে পুঁজির অধিকারী হলেন, সে বিষয়ে কোনো গবেষণায় উল্লেখ নেই। কোনো পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ নেই যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের নায়কেরা প্রথম পুঁজির অধিকারী হলেন কলকাতা বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং পরে বিশ্বপরিস্থিতি পরিবর্তনের ধাক্কায় তাঁরা সে পুঁজিকে ব্যবহার করলেন আমেরিকার শিল্পায়নের জন্য। এ তথ্যের সার্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য।

উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ইন্ডিয়া হোয়ারফ (India Wharf) নামে বোস্টন

৭ অতিরিক্ত কর আরোপের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসের নিকট বাংলায় বাণিজ্যে রত ম্যাসাচুসেটস বণিক সংঘের একটি পত্রে নিউ ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক রূপান্তরে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যের অবদান বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে করা মন্তব্য, ডিসেম্বর ৩১, ১৮১৯, Baker Library, Harvard Business School, Boston.

বন্দরের সর্ববৃহৎ জেটি বা জাহাজঘাটের মালিক ফ্রান্সিস কেবট লয়েলের নেতৃত্বে বাংলায় বাণিজ্য করে ধনবান হয়েছেন এমন একটি গোষ্ঠী সমকালীন ইউরোপে যুদ্ধময় পরিবেশের প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ঝুঁকিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা তাঁদের পুঁজি স্বদেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগ করবেন। তাঁরা সমাজে ছিলেন অসাধারণ প্রভাবশালী। উল্লেখ্য যে, নিউ ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী এ গোষ্ঠীর সব সদস্যই যে কলকাতা বাণিজ্য থেকে প্রথম পুঁজি নির্মাণ করেছেন, এ পটভূমির কথা কোনো মার্কিন ইতিহাসে এখনো স্থান পায়নি। কলকাতায় ইয়াংকিদের ব্যবসার অধিকাংশ পুঁজির উৎস ছিল তাঁদের বাঙালি বানিয়া। বানিয়াদের কাছ থেকে সুদে বা অন্য শর্তে টাকা ধার করে মার্কিন বণিকেরা কলকাতায় পণ্য ক্রয় করে তা মার্কিন অভ্যন্তরীণ বাজারসহ বিশ্ববাজারে রপ্তানি করতেন। মার্কিনদের পুঁজির আরেকটি উৎস ছিল কলকাতার স্থানীয় বাজারে পণ্য কেনাবেচা করা। এ খাতে মুনাফার হার ছিল বিপুল। ইয়াংকিদের পুঁজি সংগ্রহের আরেকটি উৎস ছিল ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ভাড়া-বাণিজ্য (ক্যারিং ট্রেড)।[৮] ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বেনেবাদী কোম্পানিসমূহ ও প্রাইভেট বণিকেরা তাঁদের আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহনের জন্য জাহাজ ভাড়া করতেন। এ ভাড়া-বাণিজ্যে মার্কিনরা ছিলেন একটি বড় উৎস। ভারত মহাসাগরের ভাড়া-বাণিজ্যে সাশ্রয়, দক্ষতা ও গতির জন্য ইয়াংকিরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারত মহাসাগরে ইয়াংকিদের আরেকটি আয়ের উৎস ছিল উপকূলীয় বাণিজ্য (কোস্টাল ট্রেড) অর্থাৎ এক বন্দর থেকে পণ্য কিনে আরেক বন্দরে নিয়ে বাজারজাত করা বা অন্য বণিকদের ভাড়া বাওয়া। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ স্বদেশে পাচার করার একটি বড় মাধ্যম ছিল ইয়াংকি বণিকদের টাকা ধার দেওয়া। ইয়াংকিরা পণ্যের মাধ্যমে ওই অর্থ ব্রিটেনে পৌঁছে দিতেন। স্থানীয় বানিয়াদের কাছ থেকে ধারে পুঁজি সংগ্রহ করে পণ্য রপ্তানি করা হতো। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে নিউ ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ছিল ওই সব খাতে সংগ্রহ করা পুঁজিরই সরাসরি ফল। কিন্তু মার্কিন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা মার্কিন বহির্বাণিজ্যের এই দিকটি সম্পর্কে একেবারেই নীরব। ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের উদ্যোক্তা হলেন একটি অতি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী, যাঁরা মার্কিন ইতিহাসে বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে পরিচিত। কিন্তু বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস শিল্পায়নে যে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল, সে পুঁজির উৎস যে কলকাতা বাণিজ্য এ বিষয়ে সব

৮ Paper from the Historical Seminary of Brown University, edited by Franklin Jameson; VI; *The East India Trade of Providence from 1787 to1807* by Gertrude Selwyn Kimball, (Providenc, Rhode Islam, 1896; পৃ ১-৩৪।

ঐতিহাসিকই নীরব। এমনকি রবার্ট ডালজেল, যিনি বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসদের নিয়ে নামী গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তিনিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।[৯]

সব পণ্ডিতই একমত যে কলকাতা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ফিজিওক্রেসি বা কৃষি ও কৃষিজাত বাণিজ্যই ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনের আদর্শ। উল্লেখ্য যে, মার্কিন অর্থনৈতিক চিন্তায় এ আদর্শকে সমুন্নত রেখেই এর পাশাপাশি সৃষ্টি করা হয় আধুনিক পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন। এ পথে এগোতে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস, যার সদস্যরা পরে 'বোস্টন ব্রাহমিন' (ব্রাহ্মণ) নামেও সুখ্যাত হন তাঁদের সুনাম, ঐশ্বর্য ও প্রভাবের জন্য। বোস্টন অ্যাসোসিয়েটদের নেতা ফ্রান্সিস লয়েল ছিলেন বোস্টন বন্দরের ইন্ডিয়া হোয়ারফ ও ইন্ডিয়া স্টোরসের মালিক। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ, নেপোলিয়নিক যুদ্ধ ও সমকালীন বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে লয়েল ও তাঁর সহযাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের পুঁজি ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য থেকে প্রত্যাহার করে শিল্পায়নে বিনিয়োগ করার জন্য। এ পরিকল্পনায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত কলকাতা বণিক অ্যাপেলটন ও জ্যাকসন।

পুঁজির উৎস

ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যে যোগদান করার জন্য কৃষিভিত্তিক ইয়াংকিরা পুঁজি পেলেন কোথায়—এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় এবং হয়েছেও। ফার্বার, পারকিনসন, বাঘাত প্রমুখ নৌ-ঐতিহাসিক এ প্রশ্ন তুলেছেন। আটলান্টিকের উপকূল থেকে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে বাণিজ্য স্থাপন করা মানে বড় আকারের জাহাজ, বিপুল আকার নগদ পুঁজির জোগান। জাহাজ ভাড়া বা নির্মাণ, মহা দূরত্ব লঙ্ঘন, পণ্য ক্রয়ে পুঁজি বিনিয়োগ, জাহাজ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রবক্ষে জলদস্যু থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, সামুদ্রিক দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি বিমা, জাহাজে উচ্চমৃত্যুহার ও ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি কারণে একটি দূরবর্তী বাণিজ্য অভিযাত্রা ছিল বড় পুঁজির ব্যাপার। এ পুঁজি ইয়াংকি কৃষি অর্থনীতি থেকে পাওয়া ছিল অসম্ভব। ক্যালকাটা বোর্ড অব ট্রেড প্রশ্ন তুলেছিল ইয়াংকি বণিকেরা এত পুঁজি পান কোথায়? বোর্ড অব ট্রেডের তদন্তে ধরা পড়ে যে ইয়াংকিদের পুঁজি আসে নানা উৎস থেকে। সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ ও লুটপাটের যে টাকা ইয়াংকিদের মাধ্যমে দেশে পাঠাতেন সেই টাকা। ইয়াংকিরা ওই টাকা ব্যবহার করতেন ধার করা পুঁজি হিসেবে। আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয় করে প্রাপকের টাকা লন্ডনে পরিশোধ করা

৯ দেখুন, Robert F. Dalzell, *Enterprising Elite: The Boston Associates and the World They Made* (Harvard University Press 1987).

হতো। মার্কিন ঐতিহাসিক ফার্বারের হিসাবমতে, ইয়াংকিদের মাধ্যমে এভাবে বছরে প্রায় তিন লাখ স্টারলিং গোপনে লন্ডনে প্রেরিত হতো।[১০] এ ছাড়া বাংলায় ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মার্কিন জাহাজে সুদে বা মুনাফার ভিত্তিতে অসদুপায়ে অর্জিত টাকা বিনিয়োগ করতেন। পারকিনসন মার্কিনদের বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পুঁজি সংগ্রহে চারটি অসদুপায়ের কথা উল্লেখ করেন।[১১] যথা :

১. সাগরবক্ষে অতি সস্তায় জলদস্যুদের লুট করা মাল কেনা;
২. ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা ধার করে এনে পণ্য কেনা এবং তা বিশ্ববাজারে বিক্রি করে প্রাপকের কাছে তাঁর পুঁজির সুদ বা লভ্যাংশসহ ফেরত দেওয়া;
৩. সুযোগ পেলে নিজেরাই খোলা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া এবং তা জাহাজের ক্রুদের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা; এবং
৪. Isle de France-এ অবস্থিত জলদস্যুদের বাজার থেকে অতি সস্তায় পণ্য কেনা ইত্যাদি।

এ ছাড়া ভারতে না এসেও নিউ ইংল্যান্ডের অনেক ব্যবসায়ী বঙ্গোপসাগরীয় ব্যবসায় জাহাজের কাপ্তান ও সুপারকার্গোর মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। জাহাজ ছাড়ার প্রস্তুতি ও দিনক্ষণ ঘোষণা দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো আগ্রহী খুদে বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্শ্ব ব্যবসা হিসেবে এসব খুদে বিনিয়োগকারীর বৈদেশিক ব্যবসা কমিশনের বিপরীতে দেখাশোনা করতেন জাহাজের কাপ্তান নিজেই।[১২]

ইয়াংকিদের কলকাতা বাণিজ্যের পরিমাণ

ইয়াংকি বণিকেরা কলকাতা বাণিজ্য শুরু করেছেন ১৭৮৪ সালে। তাঁদের প্রথম ১০ বছরের বাণিজ্যের পরিধি পরিমাপের কোনো উপায় অবশ্য নেই। মার্কিনসহ বিদেশিদের জন্য কলকাতা বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। তা সত্ত্বেও ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত বন্দরের আমদানি-রপ্তানির কোনো দেশওয়ারি হিসাব রাখার নিয়ম করা হয়নি। কলকাতা বন্দরের বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় ১৭৯৫ সাল থেকে। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি

১০ Holder Furber, *John Company at Work: A Study of European Expansion in India in the Late Eighteenth Century*; (Cambridge: Mass, Harvard University Press, 1951, পৃ. ১৩৯-১৪৪)।

১১ C. Northcote Parkinson, *Trade in the Eastern Seas*, 1793-1813, (Cambridge: University Press, 1937), পৃ. ৬৫-৬৭।

১২ G. Baghat, *American in India, 1784-1860*, (New York: University Press, 1970), Chapter 3.

হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১৭৯৫ সাল থেকে কলকাতা বন্দরে ইয়াংকি বণিকদের আমদানি এবং রপ্তানি উভয়ই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১৭৯৫-৯৬ সালে ইয়াংকি বণিকদের কলকাতা বন্দরে মোট আমদানির পরিমাণ প্রায় ৮ লাখ টাকা থেকে ক্রমাগত বেড়ে ১৮০৫-০৬ সালে ৬৭ লাখ টাকায় উন্নীত হয়। প্রায় আট গুণ বেড়ে যায় মার্কিনদের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ। ১৭৯৫-৯৬ সালে কলকাতায় তাঁদের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১৯ লাখ টাকা থেকে ক্রমাগত বেড়ে ১৮০৫-০৬ সালে উন্নীত হয় ৬৩ লাখ টাকায়।[১৩] রপ্তানি পণ্য হিসেবে কলকাতা থেকে ইয়াংকিদের মূল পণ্য ছিল বাংলার কুটির শিল্পোৎপাদিত বহু রকমের বস্ত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ সময়ে কলকাতা থেকে ইয়াংকিদের একক রপ্তানির পরিমাণ ছিল এশিয়া ও ইউরোপের বণিকদের সম্মিলিত রপ্তানির চেয়েও সিকি ভাগ বেশি।[১৪] নিচের ছক থেকে ইয়াংকিদের কলকাতা ব্যবসার একটি পরিমাণগত চিত্র ফুটে উঠবে :

ছক- ১ : কলকাতা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান ১৭৯৫-১৮২০

সাল	মোট আমদানি	মোট রপ্তানি
সাল	টাকা	টাকা
১৭৯৫-৯৬	৮,৪৩,১১৮	১৯,৪৯,৩১৯
১৭৯৬-৯৭	১৫,৪৯,৭৭৩	২৫,৬০,২৬৭
১৭৯৭-৯৮	১০,৪০,১০৮	২০,২৫,৬০২
১৭৯৮-৯৯	৩৫,২৪,৬১৪	৩৭,৮৭,৯৩৭
১৮০০-০১	৪৯,৭৫,৭০০	৬১,০৬,৭০০
১৮০১-০২	৫০,৬৫,৭৬৫	৬৭,১৭,৪৩৩
১৮০২-০৩	৫১,৫৬,০৩১	৬৭,১৭,৪৩৩
১৮০৩-০৪	৪৫,১২,৬৪০	৪৮,৬২,১৪৭
১৮০৪-০৫	৩৯,২৩,৩১৭	৩৩,৪০,৫৯৩
১৮০৫-০৬	৬৭,৬৭,৯১০	৬২,৭৮,০৫৫
১৮০৬-০৭	১,০৯,৯২,৯৭০	৯০,২৭,৪৭২
১৮০৭-০৮	৫৮,২৯,০৬৩	৭১,১৩,২৮১
১৮০৮-০৯	----	৫,৭১,২১৮
১৮০৯-১০	৬৯,৯২,৫৬৫	৬৮,০২,৪৮৯
১৮১০-১১	৬৭,৭১,৮৯৪	৬৮,৩৬,৩৬৫
১৮১১-১২	৫,৮৫,৪৩৪	১৫,৯৫,৩৭৪
১৮১২-১৩	৬,১৭,৩৯১	১০,৯৪,৬০৯
১৮১৩-১৪	২,১৫,৭৬,৯৬৫	৪,৬৪,৫১,০৬৯
১৮১৪-১৫	২,৬৮,২৭,২২০	৪,৭৪,৯৯,৫০৩
১৮১৫-১৬	৩,৫৮,৯৮,৪০৩	৫,৬৪,১০,৮৩৫
১৮১৬-১৭	৬,১৯,৬০,৬০৭	৬,১৩,৫৩,৩৫১
১৮১৭-১৮	৬,২৮,৪২,৯০০	৬,৫৪,১৭,৯০৭
১৮১৮-১৯	৭,৯২,২৯,৪৪১	৫,৮৬,১১,৭৩২
১৮১৯-২০	৫,৮৬,০৬,৬৪৭	৬,০৯,৭৮,৮১০

Source: Amales Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833,* (Calcutta 1979), Appendix Charts on Trade between Calcutta and USA, pp. 273-295.

ভাড়া-বাণিজ্য ও পুনরায় রপ্তানি

উল্লেখ্য যে, এই সারণির হিসাব শুধু ইয়াংকিদের কলকাতা বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য থেকে ইয়াংকিদের প্রকৃত আয় আরও কয়েক গুণ বেশি গণ্য করার কারণ আছে এ জন্য যে এই হিসাবে ইয়াংকিদের ভাড়া-বাণিজ্য (ক্যারিং ট্রেড) বাবদ আয় অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ছাড়া মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরীসহ ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য-বন্দরগুলোর সঙ্গে কোস্টাল ট্রেড নামে যে আন্তবন্দর বাণিজ্য হতো এবং সে বাণিজ্য বাবদ যে বিপুল আয় হতো, ওই হিসাবে তা দেখানো হয়নি। তা ছাড়া অন্যান্য অনিয়মিত ব্যবসা থেকে আয় এই হিসাবে আনা হয়নি। এসব সূত্র থেকে পাওয়া লাভ নিয়মিত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যোগ করলে যে বিপুল বাণিজ্যিক আয় দাঁড়ায় তা ছিল এমনই বিশাল যে সমকালীন ইয়াংকিরা বিস্মিত হয়েছে ভারত বাণিজ্যের বিশালতা দেখে।[১৫] ১৮০০ সালে সমকালীন ইয়াংকি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক স্যামুয়েল মিশেল যেমন মন্তব্য করেন যে কলকাতা বাণিজ্য নিউ ইংল্যান্ডের ছোট-বড় সব ব্যবসায়ীর মধ্যে একটি চমকপ্রদ হিড়িক সৃষ্টি করেছে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে সর্বত্র সবার মুখে শুধু একই কথা : 'Join Calcutta Commerce. It is all Commerce!

১৩ Merchant Jacob Crowninshield to Captain Silsbee, Washington, February 5, 1804, See, Jacob Crowninshield Papers, vol. 5; Peabody Museum.

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯.

১৫ John H. Reinochl, ed. "Some Remarks on the American Trade: Jacob Crowninshield to James Madison, 1806", *William and Mary Quarterly* 16, no. 1 (1959).

Commerce!, and at all events Commerce'।[১৬] এক দশক আগেও যেখানে অর্থনীতির প্রথম কথা ছিল কৃষি, সেখানে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে যোগদানের এক দশকের মধ্যেই ইয়াংকিদের চিন্তাধারার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে পুঁজিবাদী ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য এবং তজ্জনিত বিপুল আমদানি-রপ্তানি।[১৭]

১৭৯৫ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে সব ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগীর সম্মিলিত আমদানি-রপ্তানির তুলনায় মার্কিনদের একক ব্যবসা ছিল দ্বিগুণেরও বেশি।[১৮] লক্ষণীয় যে ইয়াংকিদের এই ব্যাপক আমদানির লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানো নয়; এর লক্ষ্য ছিল পুনরায় রপ্তানি। সীমিত অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর পর আমদানিকৃত বাকি পণ্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি করা হতো, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। এই মহালাভজনক বাণিজ্যে হঠাৎ ধস নামে যখন ইউরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় ভারত মহাসাগরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উভয় পক্ষই মার্কিন বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর লুটপাটমূলক তল্লাশি চালিয়ে বিপুল আর্থিক ক্ষতি সাধন করতে থাকে। আমেরিকার কোনো নৌবাহিনী না থাকায় উপায়ান্তর না দেখে মার্কিন কংগ্রেস ১৮০৭ সালের এমবার্গো অ্যাক্ট শীর্ষক আইন প্রণয়ন করে আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত ইয়াংকিদের ভারত বাণিজ্য নিবু নিবু অবস্থায় থাকে। ফলে ভারত বাণিজ্যে বিনিয়োজিত বিপুল পুঁজির ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিয়ে ভারত-বণিকদের মধ্যে এক পরম উৎকণ্ঠা ঘনিয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে যুক্ত বণিকদের অনেকেই তাঁদের পুঁজি বাংলা বাণিজ্য থেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী তাদের পুঁজি দেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মার্কিন শিল্পায়নের প্রাথমিক উদ্যোগ

আগেই বলেছি যাঁরা দেশের শিল্পায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং এর

১৬ Bernard Bailyn et al., *The Great Republic: A History of the American People*, (D. C. Health and Company, Lexington, Massachusetts), 1977, পৃ. ৩৯৩।

১৭ এখানে উল্লেখ করা দরকার ইয়াংকিরা একই সময়ে বঙ্গোপসাগর ও চীনা উপসাগর বাণিজ্যে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু যেখানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁদের বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য ছিল ব্যাপক এবং যুগান্তকারী সে তুলনায় তাঁদের চীনা বাণিজ্য ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তথাপি সমকালীন মার্কিন সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতো চীনা বাণিজ্য।

১৮ Holden Furber, "The Beginnings of American Trade with India, 1784-1812," *New England Quarterly*, (11 June 1938), পৃ. ২৫৮।

বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাঁরা সবাই ছিলেন ইতিপূর্বে কলকাতা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মার্কিন শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে এঁরা বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে খ্যাত। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসের সব সদস্যই যে ধনবান হয়েছেন বাংলা বাণিজ্য থেকে, এ সম্পর্কে মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। সেলেমের ডার্বি পরিবার, বিভালির থর্নডাইক পরিবার ও নিউইয়র্কের গ্রেজ ও এসটর্স পরিবার আমেরিকার প্রথম কোটিপতি হিসেবে সামাজিক পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের ধনের উৎস যে বঙ্গ-বাণিজ্য সে সম্পর্কে মার্কিন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা নীরব। এসব নব্য কোটিপতির সবাই যে প্রথম থেকেই জাহাজের মালিক বা বড় পুঁজির অধিকারী ছিলেন তা নয়। বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁদের অনেকে জাহাজের মালিক ছিলেন, আবার অনেকে ছিলেন না। তাঁরা অন্যের জাহাজে ভাড়ায় মাল তুলে তা বিশ্ববাজারে রপ্তানি করেছেন। অনেকে বাড়িতে বসে থেকেই কমিশন দালালের মাধ্যমে কলকাতা থেকে মালামাল আমদানি করেছেন বা পুঁজি খাটিয়েছেন অন্যান্য বণিক বা কাপ্তানের মাধ্যমে। অনেকে ছিলেন একই সঙ্গে জাহাজের কাপ্তান এবং বণিক। অনেকে খালি হাতে কলকাতায় গমন করেছেন এবং স্থানীয় বানিয়াদের কাছ থেকে নানা শর্তে লাভ দেওয়ার বিনিময়ে পুঁজি সংগ্রহ করেছেন। কলকাতার যেসব বানিয়া মার্কিনদের সঙ্গে অংশীদারি বা নির্দিষ্ট লাভের বিপরীতে পুঁজি খাটিয়েছেন এবং পুঁজিদাতা হিসেবে নিউ ইংল্যান্ডে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামদুলাল দে, দুর্গা প্রসাদ, রাম সুন্দর মিত্র, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, কালি শংকর, রঘুরাম, রামসুন্দর ও আরও অনেকে।[১৯] উল্লেখ্য, কৃতজ্ঞতাবশত অনেক মার্কিন বণিক তাঁদের বানিয়াদের আবক্ষ ও আপাদমস্তক মূর্তি বানিয়ে দেশে সংরক্ষণ করেছেন। সেলেম পিবডি জাদুঘরে এখনো সংরক্ষিত আছে এসব প্রতিমূর্তি। নিউ ইংল্যান্ড থেকে জাহাজের কেবিন বয় হিসেবে অনেকেই কলকাতায় আগমন করেছেন এবং কলকাতার সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে কোটিপতিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম উল্লেখ করা দরকার, কেননা তাঁরা ছিলেন আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক উদ্যোক্তা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্যাট্রিক ট্রেসি জ্যাকসন, জোসেফ লি, স্টিফেন হিগিনসন, জর্জ কেবট। এঁরা সবাই প্রাথমিকভাবে জাহাজের কেবিন বয় হিসেবে কলকাতা এসেছিলেন এবং অচিরেই

১৯ Susan S. Bean, *Yankee India: American Commercial and cultural Encounters with India in the Age of Sail, 1784-1860*, (Peabody Essex Museum 2001), পৃ. ৩৯-৪০, ১১১-১২, ১২৮-৩০, ১৭৭।

বঙ্গ-ব্যবসার মাধ্যমে কোটিপতিতে পরিণত হন।[২০]

সমকালীন পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, চুক্তিপত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে হার্ভার্ড অধ্যাপক কেনেথ উইগিন্স পোর্টার বঙ্গ-বাণিজ্যে রত সমকালীন ইয়াংকি বণিকদের একটি আর্থসামাজিক পটভূমি তুলে ধরেছেন তাঁর সম্পাদিত *দ্য জ্যাকসন অ্যান্ড দ্য লিস* শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে।[২১] জ্যাকসন ও লি উভয়ই কলকাতায় গমন করেন সাধারণ কেবিন বয় হিসেবে এবং উভয়ই অল্পকালের মধ্যে বাংলা-বাণিজ্যের সুযোগে মহা পুঁজিপতিতে পরিণত হন। শিল্পবিপ্লবে পুঁজিপতিদের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

শিল্পায়নে 'বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস'-এর উদ্যোগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে থেকেই আদর্শিক কারণে কৃষি অর্থনীতি অনুসরণ করছিল এবং স্বাধীনতার প্রথম ১০ বছর পর্যন্ত তারা যে একই তাত্ত্বিকরণে কৃষি অর্থনীতির আদর্শ পালন করে আসছিল সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি কীভাবে মার্কিনদের ফিজিওক্রেসি দর্শন মোতাবেক স্বাধীনতার পরও মুদ্রা, ব্যাংক, বিমা বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বাজার অর্থনীতির উপাদান বিকশিত করার ব্যাপারে সরকার ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। মার্কিনরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করে ১৭৯০ সালের কারেন্সি অ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে। এর আগে পর্যন্ত ব্রাজিল থেকে আমদানিকৃত রৌপ্যমুদ্রা, মদিরা থেকে সংগৃহীত মদ এবং নৌ-সামগ্রীই ছিল ইয়াংকিদের বঙ্গ বাণিজ্যের মাধ্যম। ১৭৯০ থেকে ১৮০৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গ-বাণিজ্য ছিল ইয়াংকিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র। এদেরই একটি গোষ্ঠী বোস্টন বন্দরের ইন্ডিয়া হুয়ার্ফ ও ইন্ডিয়া স্টোরসের মালিক ফ্রানিস ক্যাবট লয়েলের নেতৃত্বে একটি শিল্প উদ্যোক্তা গোষ্ঠী গঠন করে, পরবর্তী সময়ে যাঁরা বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের কারণে, বিশেষ করে ১৮০৭ সালে, মার্কিন সরকার কর্তৃক মার্কিনদের ওপর বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ভারত বাণিজ্য পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে মার্কিন বণিকদের একটি গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ভারত বাণিজ্য পরিত্যাগ করে স্বদেশের শিল্পায়নে পুঁজি বিনিয়োগ

২০ কেবিন বয় থেকে বড় বণিক বনে যাওয়া ও পরিশেষে শিল্পবিপ্লব রচনা করার নেপথ্য কাহিনির বিপুল সংখ্যক দলিল সংগ্রহ করেছেন পোর্টার। দ্রষ্টব্য, Kenneth Wiggins Porter, *The Two Generations of Massachuseettss Merchants, 1765-1844*, 2 vols, (Harvard University Press, 1937), পৃ. ৮৮-৯০।

২১ Kenneth Porter, *The Jacksons and the Lees* (Cambridge: Mass, Harvard University Press, 1937.

করার জন্য। এরই ফলে ১৮০৭ থেকে এক দশকের মধ্যে আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডে ব্রিটেনের আদলে একটি শিল্পবিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।[২২]

ইয়াংকিদের মধ্যে যাঁরা বঙ্গ বাণিজ্যে যোগদান করেন, তাঁরা বিভিন্ন আর্থসামাজিক পটভূমি থেকে আগত। পোর্টারের মতে, ১৭৯০ সালে সমগ্র নিউ ইংল্যান্ডে বড় মাপের পুঁজির অধিকারী ছিলেন গুটি কয়েক মাত্র, যেমন সেলেমের ডার্বি পরিবার, বিভারলির থর্নডাইক পরিবার ও নিউইয়র্কের গ্রেজ ও এস্টারস পরিবার।[২৩] এসব পরিবার ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন হয় অল্প পুঁজির অধিকারী, নয় একেবারেই পুঁজিহীন। এঁদের অনেকেই কলকাতা এসেছিলেন জাহাজের সাধারণ কেবিন বয় হিসেবে। অনেকের জাহাজ ছিল বটে, কিন্তু পুঁজি ছিল না। তাঁরা পুঁজি সংগ্রহ করেছেন কলকাতায় এসে তাঁদের বানিয়াদের কাছ থেকে, যাঁদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন রামদুলাল দে (১৭৫২-১৮২৫), রাজকৃষ্ণ মিত্র (১৮১১-১৮৭২), রাজেন্দ্র দত্ত (১৮১৮-১৮৮৯) ও আরও অনেকে। তাঁরা ছিলেন নিউ ইংল্যান্ডের বণিক সমাজে সুপরিচিত নাম। অনেক ব্যবসায়ী কলকাতায় এসেছিলেন কোনো জাহাজ এবং পুঁজি ছাড়াই। তাঁরা স্থানীয়ভাবে কার্গো কেনাবেচা করেছেন কমিশন এজেন্টদের মাধ্যমে। অনেকে ছিলেন শুধুই বণিক এবং কলকাতায় না এসেই মাল কিনতেন কমিশন এজেন্ট, জাহাজের সুপার কার্গো, কাপ্তান প্রভৃতির মাধ্যমে। অনেকে আবার বাংলায় এসে বিভিন্ন বাজার-বন্দরে পণ্য কেনাবেচা করতেন এবং ফেরার সময় সঞ্চয় ও ধারে কার্গো কিনতেন। একেবারেই পুঁজি ছাড়া বা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসব ফাটকাবাজের অধিকাংশই কলকাতা আসতেন নিউ ইংল্যান্ডের কয়েকটি অঞ্চল থেকে। যেমন সেলেম, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, বিভারলি ও নিউবেরি পোর্ট এবং এঁরাই মূলত মার্কিন শিল্পবিপ্লবের পুরোধায় ছিলেন।[২৪]

যে পটভূমিতে শিল্পায়ন শুরু

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কৃষিনির্ভর মার্কিন অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অনুকূল ছিল না। সরকার কট্টর ফিজিওক্রেসিপন্থী বিধায় বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল এই শর্তে যে বৈদেশিক বাণিজ্যজনিত কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে সে সমস্যা নিরসনে সরকার কোনো ভূমিকা পালন করবে না। এরপরও নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলীয় বাণিজ্যে রত কতিপয় বণিক পরিবার বঙ্গোপসাগরীয়

২২ দেখুন, Robert F. Dalzell, *Enterprizing Elite: the Boston Associates and the World they Made*, (Harvard University Press), পৃ. ২৮-২৯।

২৩ Porter Wiggins Porter, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৯০।

২৪ প্রাগুক্ত।

বাণিজ্যে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তে সাহস জোগান ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেই সব দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা, যাঁরা কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর দুর্নীতি, শোষণ ও ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে ব্যাপক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। নিজ নামে ওই সম্পদ দেশে পাঠানো সম্ভব ছিল না বিধায় তাঁরা তা দেশে প্রেরণের জন্য ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গ বাণিজ্যে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেন।

ব্রিটিশ পুঁজি জোগানদারদের সহযোগিতায় ইয়াংকি বণিকেরা বঙ্গ বাণিজ্যে বিপুল মুনাফা লাভ করেন এবং এর ওপর ভিত্তি করে ইয়াংকিরা অচিরেই বঙ্গ বাণিজ্যে অন্যতম সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ছাড়াও ইয়াংকি বণিকেরা বিপুল ব্যবসা করেন আরও কয়েকটি সেক্টরে, যেমন ভাড়া-বাণিজ্য, উপকূল বাণিজ্য এবং পুনরায় রপ্তানি বাণিজ্য। বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যের এসব সেক্টরে ইয়াংকি বণিকদের ব্যবসা তুঙ্গে ওঠে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় যখন বঙ্গোপসাগরে ইংরেজ ও ফরাসিদের ব্যবসার ব্যাপক অংশ যুদ্ধজনিত কারণে ইয়াংকি বণিকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু ১৮০৭ সাল থেকে যুদ্ধরত ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয় পক্ষ সমুদ্রবক্ষে ব্যাপক হারে নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক জাহাজ ও বণিক আটক করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন সরকার প্রথমে এমবার্গো অ্যাক্ট, ১৮০৭ এবং পরে নন-ইন্টারকোর্স অ্যাক্ট, ১৮০৯ প্রণয়ন করে মার্কিন বহির্বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অবস্থার ক্রমাবনতিতে ১৮১২ সালে শুরু হয় ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ১৮০৭ থেকে ১৮১২ পর্যন্ত ইয়াংকিদের ১৫৯২টি বাণিজ্যিক জাহাজ যুদ্ধরত ইউরোপীয়দের হাতে আটক হয়।[২৫] এর ফলে মার্কিনদের বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ ও বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ পাঠানো প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে এবং বাণিজ্যে ব্যবহৃত কোটি কোটি ডলারের পুঁজি বিনিয়োগের বাইরে এসে এর মালিকের অনুৎপাদনশীল অলস সম্পদে পরিণত হয়।

এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে রত ইয়াংকি বণিকগোষ্ঠীর একটি প্রভাবশালী অংশ তাঁদের পুঁজি ভারত বাণিজ্য থেকে গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এই ভেবে যে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ফলে ভবিষ্যতেও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে তাঁদের পুঁজির ক্ষতি সাধন করতে পারে। ঝুঁকি ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ বাণিজ্যিক বিনিয়োগের বিকল্প হিসেবে তাঁরা একটি ব্যবসাগোষ্ঠী গঠন করে

২৫ Proceedings of the 17th Congress, 1st Session, No. 256, Communicated to the House of Representatives, March 15, 1822, পৃ. ৬৩৫।

শিল্পায়নে বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এ চিন্তাধারার নেতৃত্ব দেন বোস্টন বন্দরের ইন্ডিয়া হুয়ার্ফ ও ইন্ডিয়া স্টোরের মালিক ও ভারত বাণিজ্যে বিনিয়োগকারী বণিক ফ্রান্সিস কেবট লয়েল (১৭৭৫-১৮১৭)। তাঁর শিল্পায়ন পরিকল্পনায় প্রধান পুঁজিদাতা হিসেবে যোগদান করেন তাঁর শ্যালক এবং অন্যতম বড় কলকাতা বণিক প্যাট্রিক ট্রেসি জ্যাকসন (১৭৮০-১৮৪৭), যিনি কলকাতায় এসেছিলেন জাহাজের একজন কেবিন বয় হিসেবে এবং পরে কলকাতা ব্যবসার বদৌলতে পরিণত হন একজন মহা কোটিপতিতে। শিল্পায়ন পরিকল্পনায় ট্রেসি জ্যাকসনের তিন ভাইও যোগদান করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যে রত এবং পরিশেষে মহাধনী। শিল্পায়নে পুঁজি বিনিয়োগে লয়েল-এর পরিকল্পনায় আরও শরিক হন কলকাতা বণিক নাথান এপলটন (১৭৭৯-১৮৬১), চার্লস জেমস ও অ্যাবট লরেন্স। মার্কিন শিল্পবিপ্লবের ঐতিহাসিক ভেরা শ্লেকমেন এসব প্রাথমিক উদ্যোক্তার নাম দেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস।[২৬] কারণ, তাঁরা সবাই ছিলেন বোস্টনবাসী।

তাঁদের যৌথ উদ্যোগ এবং যৌথ পুঁজিতে ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বোস্টন ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি নামে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, যা কি না যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পায়নের ইতিহাসে প্রথম পুঁজিবাদী শিল্পপ্রতিষ্ঠান। বোস্টন ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি ১৮১৪ সালে বোস্টনের অদূরে ওয়ালথামে স্থাপন করে এর প্রথম বস্ত্র কারখানা, যে কারখানায় সর্বপ্রথম একযোগে এবং একই প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয় সুতা পাকানো থেকে বস্ত্র বয়নের সব প্রক্রিয়া এবং এর প্রতিটি প্রক্রিয়াই ছিল বিদ্যুৎচালিত। এভাবেই সূচিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শিল্পবিপ্লব এবং এ বিপ্লবের নায়ক যাঁরা, তাঁরা সবাই পুঁজির মালিক হয়েছেন বঙ্গ-বাণিজ্য থেকে।[২৭] ১৮৬০ সালে দ্বিতীয় মার্কিন শিল্পবিপ্লব পর্যন্ত এই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস সূচিত প্রথম শিল্প বিপ্লবই এগিয়ে নেয় মার্কিন শিল্পায়নধারা।

মার্কিন শিল্পবিপ্লবের পথিকৃৎ জাহাজ নির্মাণশিল্প। এর বিকাশ লাভ হয়েছে প্রধানত মার্কিনদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। নিরাপত্তাব্যবস্থা ও কার্গো ধারণক্ষমতার দিক থেকে মার্কিন উপকূলীয় বাণিজ্যে ব্যবহৃত সনাতন

২৬ Vera Shlakmen, *Economic History of a Factory Town: A Study of Chicopee*, Massachusets, 1935.

২৭ ইয়াংকি বণিকেরা যে কলকাতা বণিজ্য থেকে প্রথম পুঁজির অধিকারী হলেন এ সম্পর্কে অনেক মৌলিক তথ্য পরিবেশন করেছেন সেলেম পিবডি জাদুঘরের পরিচালক Susan S. Bean। ২০০১ সালে প্রকাশিত তাঁর *Yankee India: American Commercial and Cultural Encounters with India in the Age of Sail 1784-1860* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন 'It is a little known fact that from 1795 through 1805, total American trade with India exceeded that of all the continental European nations together.' পৃ. ৭।

জাহাজ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট বিধায় এগুলো ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের জন্য তেমন অনুকূল ছিল না। তা ছাড়া মার্কিনদের বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক দিক ছিল ভাড়া-বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক ভাড়া-বাণিজ্যে সুবিধা লাভের জন্যও প্রয়োজন ছিল বড় ধারণক্ষমতার জাহাজ। পরিবহনব্যয় সাশ্রয়ের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাল পবিবহনের জন্য মার্কিন জাহাজ ভাড়া করত। তা ছাড়া ব্রিটিশ প্রাইভেট বণিক ও অনেক ইউরোপীয় প্রাইভেট বণিক মার্কিন জাহাজ ভাড়া করত পণ্য পরিবহনের জন্য। অতএব ১৭৮৫ সাল থেকেই নিউ ইংল্যান্ডের জাহাজ নির্মাণশিল্প ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় (অন্তত ১৮১২ সাল পর্যন্ত) নিরাপত্তার খাতিরে ব্রিটেন নিরপেক্ষ মার্কিন জাহাজে কলকাতা থেকে পণ্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি করত। এসবের প্রভাবে নিউ ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে বড় জাহাজ নির্মাণশিল্প। জাহাজশিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অনেক পুঁজিপতি পরিবার, যেমন সেলেমের এলিয়াস হাস্কেট ডার্বি (১৭৩৯-১৭৯৯), যিনি জাহাজশিল্প ও কলকাতা বাণিজ্যের মাধ্যমে মার্কিন মুলুকের প্রথম কোটিপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এমনিভাবে প্রভিডেন্সের মোজেস ব্রাউন (১৭৩৮-১৮৩৬) কোটিপতিতে পরিণত হন কলকাতা বাণিজ্য ও জাহাজশিল্পের মাধ্যমে। একই সময়ে কলকাতা বাণিজ্যের মুনাফায় মার্কিন মুলুকের কোটিপতির কাতারে যোগ দেন ক্যাবট, গ্রে ও থর্নডাইক পরিবারসমূহ।[২৮] তাঁরাই সর্বপ্রথম আমেরিকায় শিল্পায়নের চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং শিল্পায়নের পথে কিছু সক্রিয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। যেমন ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত বিভারলিতে ভারত বণিক এন্ড্রু কেবট ও ইসরাইল থর্নডাইক ১৭৯০ সালে স্থাপন করেন মার্কিন দেশের প্রথম শিল্পকারখানা, যদিও এর উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সুতা পাকানোর মধ্যে।[২৯] কিন্তু ওই কারখানা কোনো পুরোদস্তর আন্দোলন তৈরি করতে পারেনি, কেননা এর পরপরই কলকাতাকে কেন্দ্র করে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য এমন জমজমাট হয়ে ওঠে যে মুনাফার দিক বিচার করলে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ছিল প্রাচ্য বাণিজ্য।

২৮ ইয়াংকিদের কলকাতা বাণিজ্য ও নিউ ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের ওপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য G. Baghot, *Americans in India (1784-1860)*, New York University Press, 1970), পৃ. ৫৫-৮৫।

২৯ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, John H. Reinoehl, ed, "Some Remarks on the American Trade : Jacob Croowninshield to James Madison, 1806" , *William and Mary Quarterly* 16, no. (1959). পৃ. ৮৫-৯১; Ronald P. Formisano, *The Transformation of Political Culture: Massachusetts Parties, 1790-1840s* (London: Oxford University Press, 1983). পৃ. ১৬৩।

শেষের মন্তব্য

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মার্কিন শিল্পবিপ্লব অঙ্কুরিত হয়েছে ১৮১৩ সালে, যখন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামের একটি উদ্যোক্তা গোষ্ঠী ফ্রান্সিস কেবট লয়েলের নেতৃত্বে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি স্থাপন করে। এসব উদ্যোক্তা সবাই ছিলেন আসলে ভারত বণিক। ১৭৮৫ থেকে তাঁরা ভারত বাণিজ্যে যোগদান করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য পরিচালিত হতে থাকে। ভারত বাণিজ্য বাকি অন্যান্য বাণিজ্যের চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক বিধায় ইয়াংকি বণিকেরা প্রায় সবাই ভারত বাণিজ্যে রত হন। কিন্তু নেপোলিয়নিক যুদ্ধে মার্কিন বণিকেরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। ব্রিটিশ ও ফরাসি উভয় যুযুধান জাতি নিরপেক্ষ মার্কিন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ গভীর সমুদ্রে আটক করতে থাকে। নিরপেক্ষ আমেরিকা উপায়ান্তর না দেখে এমবার্গো অ্যাক্ট, ১৮০৭ নামের আইন পাস করে মার্কিন নাগরিকদের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। তদুপরি ১৮১২ সালের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ মার্কিনদের বঙ্গোপসাগরীয় ব্যবসা আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। ফলে ভারত বাণিজ্যে নিয়োজিত মার্কিন বণিকদের বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের বাইরে চলে আসে। এমতাবস্থায়, ভারত বণিকদের একটি বড় গোষ্ঠী কেবট লয়েলের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা ভারত বাণিজ্য পরিত্যাগ করে স্বদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে। তাঁরা ১৮১৩ সালে যৌথভাবে বোস্টনের অদূরে চার্লস নদীর উজানে ওয়ালথামে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বস্ত্রকল। নাম বোস্টন ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি। ওয়ালথাম বস্ত্রকলকে ঘিরে স্থাপিত হয় একটি শিল্পনগর, যা আমেরিকার শিল্প ইতিহাসে প্রথম। অচিরেই বিভিন্ন জায়গায় তাঁদেরই নেতৃত্বে একের পর এক বিভিন্ন বস্ত্রকল স্থাপিত হয়, যেমন : লয়াল টেক্সটাইল টাউন, বোস্টন ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি, ম্যারিম্যাক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি, অ্যাপলটন ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি, হেমিলটন কোম্পানি, ডোভার ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি এবং সাফোকস ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি।[৩০] এক দশকের কম সময়ের মধ্যে একের পর এক বিভিন্ন স্থানে শিল্পকারখানা স্থাপন মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ বিপ্লব বটে। এ বিপ্লবের ধারক-বাহকেরা ছিলেন একই স্থানের, একই মনের, একই পেশার এবং একই প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্যের একটি গোষ্ঠী, যাদের ঐতিহাসিক ভেরা শ্লেকম্যান যথার্থই নাম দিয়েছেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস। কিন্তু এই গোষ্ঠীর সব সদস্যই যে জীবনে প্রথম অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছেন বঙ্গ-বাণিজ্য

৩০ Kenneth W. Porter, *The Jacksons and the Lees: Two generations of Massachusetts Merchants 1765-1844*, প্রাগুক্ত।

থেকে এবং বঙ্গ-বাণিজ্য থেকে পাওয়া পুঁজি ও বাজারজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই যে শিল্পায়নের পথে আমেরিকার অভিযাত্রা শুরু সে সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক বা অর্থনীতিবিদ আলোকপাত করেননি।[৩১] মজার ব্যাপার যে আমেরিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব বিষয়ে বিপুল লেখালেখি হয়েছে এবং হবেও নিশ্চয়ই। কিন্তু আমেরিকার প্রথম শিল্পবিপ্লবের পুঁজি ও নেতৃত্ব যাদের হাত ধরে এসেছে সেই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস-এর সব সদস্যই যে কলকাতা বাণিজ্য থেকে ধনবান হয়েছেন এবং কলকাতায় কোনো না কোনো সময় অবস্থান করেছেন—এ বিষয়ে কেউ কোনো আলোকপাত করেননি। এ নীরবতা কৌতূহলোদ্দীপক বৈকি।

৩১ এ নিয়ে বর্তমান লেখকের বিস্তৃত গবেষণার জন্য দেখুন, "The Cargo and Culture of the New Englanders Voyages to Calcutta 1785-1850", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, (Humanities), vol. 39. No. 1, June 1994;
"American Maritime Contact with Bengal, 1785-1870, Commerce, Competition, Knowledge", Golden Jubilee Volume, *Asiatic Society of Bangladesh* (1952-2002);
"American Maritime Activities in Calcutta: Cases of Elephant and Ice, 1785-1880", *Journal of Asiatic Society of Bangladesh* (Hum.), vol. 49 no, 1 June 2004;
"Contributions of Asian Trade to the Early Transformation of the United States of America", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, (Hum.), vol. 54, no 1 June 2009;
"Americans in Calcutta Bazaars", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Hum.), Golden Jubilee Volume (1956-2005).

খাতি
রাজনীতি
চিন্তা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?

মির্জা হাসান

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ধাঁধার ওপর আলোকপাত করা। আলোচনার এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধাঁধাটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ তো সম্ভব নয়ই, বরং আমি সন্তুষ্ট থাকব বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রেক্ষাপটে ধাঁধাটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু তত্ত্বের অবতারণা করা, যাতে করে ধাঁধাটিকে পর্যালোচনা করা যায়। বিষয়টির মূলে যাওয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার ধারণা পাঠকের কাছে খোলাসা করে নেওয়া দরকারি বলে মনে করছি। 'রাজনৈতিক উন্নয়ন' বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি? 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' ধারণাটি যেমন অনেকের কাছে কমবেশি স্পষ্ট (যদিও পণ্ডিতদের ও সমাজ সংগঠকদের ভেতর এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই), রাজনৈতিক উন্নয়ন কথাটি অনেক পাঠকের কাছে হয়তো তেমন স্পষ্ট নয়। এই ধারণাটির বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়া এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। যাঁরা আধুনিক কালপর্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বাবলির খোঁজখবর একটু-আধটু রাখেন, তাঁরা হয়তো জানবেন, পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকটায় এবং ষাটের দশকজুড়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দুনিয়ায় অনেক দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন এমন একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যাঁরা 'আধুনিকায়ন তত্ত্ব'-এর পতাকাতলে সংগঠিত হয়েছিলেন। তাঁরাই রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটির উদ্ভব ঘটান। তবে ধারণাটির সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণতি ঘটে স্যামুয়েল হান্টিংটনের হাত ধরে, যার প্রভাব ও রেশ বর্তমান কালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি।[১] আমি রাজনৈতিক উন্নয়ন ধারণাটি বর্তমান আলোচনার জন্য ধার করেছি তাঁর কাছ থেকে নয়, বরং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি (সরাসরি ছাত্র) আরেক প্রখ্যাত (এবং দারুণভাবে বিতর্কিত) সমাজবিজ্ঞানী বা দার্শনিক ইয়োশিহিরো ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার কাছ থেকে। ফুকুইয়ামা তাঁর সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত প্রভাবশালী গ্রন্থ *অরিজিনস অব পলিটিক্যাল অর্ডার*-এ (২০১১) রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে বুঝিয়েছেন তিনটি দিকের মধ্যে স্থিতিশীল ভারসাম্য অর্জনকে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে রাষ্ট্রনির্মাণ (স্টেট বিল্ডিং), আইনের শাসনের সুসংহতকরণ (কনসলিডেশন অব রুল অব ল) এবং গণতন্ত্রে উত্তরণ (ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন)। এ তিনটি দিক পৃথক ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

আমি বর্তমান লেখাটি স্বল্প পরিসরের কথা ভেবে ফুকুইয়ামার ওই তিনটি ধারণাকে সংক্ষিপ্ত পরিধিতে আলোচনা করব। রাষ্ট্র নির্মাণের অর্থ হলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তি নিরপেক্ষতার (ইমপার্সোনালিজম) উদ্ভব এবং রাষ্ট্রের 'বৈধ সহিংস ক্ষমতা' প্রয়োগের সুসংহতকরণ (কনসোলিডেশন অব লেজিটিমেট ভায়োলেন্স কেপাবিলিটি অব দ্য স্টেট)। আইনের শাসন সুসংহতকরণের বিষয়টি এই লেখার অনেক সীমিত পরিসরে বিবেচনা করছি, অর্থাৎ সীমিত থেকেছি শুধু রাজনৈতিক এলিটদের ভেতরে আইনের শাসনের উদ্ভব ও সংহতকরণের প্রশ্নের মধ্যে। একইভাবে গণতন্ত্রের ধারণাটিও খুব সীমাবদ্ধ অর্থে এই লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে। গণতন্ত্র এখানে শুধু 'রাজনৈতিক এলিটদের মাঝে অবাধ প্রতিযোগিতা' হিসেবেই বোঝানো হচ্ছে।[২] এই ন্যূনতম প্রণালিগত গণতন্ত্রের (মিনিমালিস্ট প্রসিডিউরাল ডেমোক্রেসি) সংজ্ঞাধীনে গণতন্ত্রের সফলতা বা বিফলতার মূল্যায়ন হয় শুধু গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ সবার কাছে বা ন্যূনপক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এলিটদের কাছে) ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে সুষ্ঠু ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছে কি না তার ভিত্তিতে। নির্বাচন-উত্তর 'গণতন্ত্রের মান' আমাদের এ আলোচনার বিবেচ্য বিষয় নয়।

লেখার শুরুতে উত্থাপিত ধাঁধার বিষয়টিতে এবার ফিরে আসা যাক। বাংলাদেশের বর্তমান ধাঁচের গণতন্ত্রের বয়স দুই দশক ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ করুন, কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক উন্নয়নের কোনো দেখা নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের বেলায় চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ নিয়ে বাংলাদেশে

১ স্যামুয়েল হান্টিংটনের *পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটি* (১৯৬৮) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় একটি চিরায়ত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

২ গণতন্ত্রের এই ধরনের ধারণার বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনার জন্য দেখুন অ্যাডাম সেভরস্কি (Adam Prezworski), ১৯৯১।

অনেক আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে।[৩] আমরা সেই আলোচনায় যাব না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন যে ঘটছে না, তা আমার কাছে একটি ধাঁধার মতো মনে হয়। একটি দেশে বিস্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক (সমাজ সংগঠন, নারী উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতির বিকাশ, মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ইত্যাদি) উন্নয়ন ঘটে চলেছে, অথচ রাজনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, দুই দশকের বেশি সময় ধরে আমরা কম করে হলেও একটা আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরেই আছি। অবশ্য মাঝখানে ২০০৭-০৮ কালপর্বে যখন সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় ছিল সেটা বাদ রেখে মোটা দাগে কথাটা বলছি। তবে মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক উন্নয়নের যে তিনটি বিষয়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য বেশ কিছু ভালো কাজ সেনাসমর্থিত সরকার করে গিয়েছিল, যার অধিকাংশই আবার রাজনীতিবিদগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে এসে কমবেশি ধ্বংস করেছেন। অনেক সময় ধরে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটছে, সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রও টিকে রয়েছে, অথচ রাজনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে না। এটা অনেক দেশ, যারা আমাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করেছিল, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক ডাকসাইটে সফল তত্ত্বের সঙ্গেও এটা মেলে না। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কিছু নগণ্যসংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিলে সব দেশেই বর্তমানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সরকারের অধীনে থেকেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হচ্ছে। আমাদের মতো তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি লাগছে না। তত্ত্বের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কোনো কোনো তত্ত্ব, যেগুলো গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে মধ্যবিত্তের বিকাশ ও অর্থনীতির একটি পর্যায়ের উন্নয়নকে আবশ্যিক বলে বিবেচনা করে, (যার প্রমাণ যেমন পাওয়া যায় দক্ষিণ কোরিয়া অথবা তাইওয়ানের বর্তমান রাজনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতায়) সেই সফল তত্ত্বগুলোও বাংলাদেশের বেলায় খাটছে না। প্রসঙ্গত, এ দুটো দেশই বাংলাদেশের মাত্র কয়েক বছর আগে গণতান্ত্রিক উত্তরণ-প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় আসা যাক। এই আলোচনার বর্ণনামূলক দিকটি অতি সংক্ষিপ্ত রাখব। কেননা, আমি ধরে নিচ্ছি, এ লেখার বাঙালি পাঠকের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের আলোচনা (এর গতিশীলতা, আপেক্ষিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক অনুন্নয়ন) মূলত বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে করার চেষ্টা

৩ বিশ্বব্যাংক, ২০০৮; বিশ্বব্যাংক, ২০১৩; মাহমুদ, আহমেদ ও মহাজন, (২০০৮)।

করব এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক (পলিটিক্যাল ইকোনমি) তাত্ত্বিক ফ্রেমের ভেতরে থেকেই আলোচনায় অগ্রসর হব। এ তাত্ত্বিক ফ্রেমটি (নিচে দেখুন) সমাজব্যবস্থার (অথবা সীমিত অর্থে রাজনৈতিক উন্নয়ন, যেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয়) পরিবর্তন বা উত্তরণে এলিটদের প্রণোদনা[৪] বুঝতে বিশেষভাবে উপযোগী বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তাত্ত্বিক চিন্তাটি জটিল, তাই এর বর্ণনায় কিছুটা সময় আমাদের দিতেই হচ্ছে।

প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা : তত্ত্ব

তাত্ত্বিক কাঠামোটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে access order বা প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার ধারণাটি।[৫] লেখকত্রয় নর্থ (North), ওয়েনগাস্ট (Weingast), ও ওয়ালিস (Wallis) (সংক্ষেপে এখন থেকে এদের NWW বলব) তাঁদের বিশ্লেষণের মূল কেন্দ্রে রেখেছেন সামাজিক ব্যবস্থার (সোস্যাল অর্ডার) ধারণাটি। লেখকদের মতে, সামাজিক ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর উদ্ভব ও বিন্যাস ঘটার প্রক্রিয়া এবং এই সংগঠনগুলোতে কার প্রবেশাধিকার থাকবে, বা কার থাকবে না, তা নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়া। এই সমাজব্যবস্থায় সম্ভাব্য নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পদ ও ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার সহিংস প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। সমাজব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সংগঠনগুলো কার নিয়ন্ত্রণে আছে অথবা নেই। অর্থাৎ, কে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে আর কে পাচ্ছে না। তাই এ সামাজিক ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা (বা access order)। NWW-এর তাত্ত্বিক কাঠামোতে 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে' ক্ষমতাধারী এলিটদের মাঝে বিদ্যমান সহিংসতা কমানো বা বৃহত্তর অর্থে সহিংসতার ব্যবস্থাপনা (এলিট ভায়োলেন্সকে 'ম্যানেজ' করা)। যারা ক্ষমতাসীন তারা উপরোক্ত ও সংগঠনগুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারুক বা না পারুক, তারা কার্যত এলিট গোষ্ঠীকে কী প্রণোদনা দিয়ে বা কী পদ্ধতিতে সহিংসতাকে একটা সীমার ভেতর রাখতে পারছে (বা পারছে না), সেটাই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রণোদনার ধরন বা সহিংসতা কমানোর পদ্ধতির তারতম্যের ওপর নির্ভর করে প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা (limited access order) ও উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা (open access order)। এই দুটি ব্যবস্থা আসলে দুই ধরনের সামাজিক ভারসাম্যের (সোস্যাল ইকুইলিব্রিয়াম)[৬] রূপ এবং এগুলো টিকে থাকে অথবা পুনরুৎপাদিত হয় ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম (মেকানিজমস) ব্যবহার করে।

সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় এলিটদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অথবা দ্বন্দ্ব নিষ্পন্ন হয় ব্যক্তিক পর্যায়ে 'বিশেষ বিবেচনার' (ডিসক্রিশেনারি) অধীনে। এভাবেই দ্বন্দ্ব হয় চলতে থাকে অথবা তা সমঝোতার দিকে অগ্রসর হয়। এতে কাউকে কাউকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে অথবা অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে অতিমাত্রায় সীমিত করে সচেতনভাবে বিশেষ rent[৭] পাইয়ে দেওয়ার সুযোগের সৃষ্টি করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোনো খাতই এই বাড়তি সুবিধা (rent) বণ্টনের বাইরে থাকে না। এলিটদের মধ্যে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে দেনদরবার ও দর-কষাকষি চলে এই 'বাড়তি' সুবিধা পাওয়াকে কেন্দ্র করে। একেই 'বাড়তি সুবিধা' বা rent-এর উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা বলা হয়েছে। এই বণ্টন-প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের লাভ দুই ধরনের। এর মাধ্যমে এলিটদের ভেতর সহিংসতা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলে এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে প্রণোদনা দেওয়া হয়। এই আনুগত্য বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে অটুট রাখতে অনেকটা আঠার মতো কাজ করে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থার বিপরীতে রয়েছে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা, যা মূলত বর্তমানে বহুল প্রচলিত সুশাসন (গুড গর্ভনেন্স) ধারণার অনুরূপ। এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুত্ববাদী (প্লুরালিস্টিক) এবং উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেটি আইনের শাসন ও সর্বজনীন সম্পত্তি তথা মালিকানার অধিকারসমূহকে নিশ্চিত করে।[৮] এ ছাড়া এই ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলো বা 'ট্রানজাকশনস' মূলত

৪ প্রণোদনা শব্দটি ইংরেজি incentive শব্দের অনুবাদ। এলিনিয়র ওস্ট্রম এটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'The rewards and punishments that are perceived by individuals to be related to their actions and those of others.' (Ostrom cited in McLoughlin, and Bately, 2012: 6)

৫ দেখুন, নর্থ, ওয়ালিস, ওয়েনগাস্ট (২০০৯)।

৬ এই লেখায় আমি 'ইকুইলিব্রিয়াম'-এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে 'ভারসাম্য' শব্দটি ব্যবহার করছি। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি* গ্রন্থটিতে অবশ্য শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'সমস্থিতি' হিসেবে। আমি পাঠকের কাছে অধিক পরিচিত 'ভারসাম্য' শব্দটিই রাখলাম।

৭ NWW Rent-এর সহজ সংজ্ঞা ও যে অর্থে তাদের তত্ত্বে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : '...return to an asset that exceeds the return which the asset can recieve in its best alternative...rents can be created or increased by limited access-for example, when the state grants an individual monopoly privileges over an activity' (NWW 2009, p- 68).

৮ মালিকানার অধিকারসমূহের (প্রপার্টি রাইটস্) মধ্যে রয়েছে তিনটি প্রধান অধিকার, যথা সম্পত্তি পরিচালনার অধিকার, সম্পত্তি পরিচালনার সূত্রে প্রাপ্তব্য আয়ের উপর অধিকার এবং সম্পত্তিকে সংরক্ষণের অধিকার ('রাইট টু ম্যানেজ', 'রাইট টু ইনকাম' ও 'রাইট টু প্রটেকশন' হিসেবে অভিহিত)।

নৈর্ব্যক্তিকভাবে চলে। এই ব্যবস্থার আর দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—পরিচিতি-নির্বিশেষে সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার (যে সংগঠনের অস্তিত্ব তার কর্তৃত্বধারী ব্যক্তিদের বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে না)[৯] ও সর্বোপরি সহিংসতার বৈধ ব্যবহারের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্ব (মোনোপলি ওভার লেজিটিমেট ইউজ অব ভায়োলেন্স)।[১০]

লক্ষ করে দেখুন, আমি লেখার গোড়াতেই 'রাজনৈতিক উন্নয়নের' যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছি, তার দুটোই (রাষ্ট্র বা সংগঠনের ব্যক্তি নিরপেক্ষতা ও বৈধ সহিংসতা প্রয়োগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব) উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থারও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, আমি দাবি করছি যে রাজনৈতিক উন্নয়ন বাংলাদেশে ঘটতে হলে আমাদের রাষ্ট্রকে বর্তমানের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার দিকে এগোতে হবে। বাংলাদেশ সেদিকে এগোচ্ছে কি না, না হলে কেন এগোচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্নে যাওয়ার আগে আরও কিছু রক্তমাংসহীন তাত্ত্বিক বিষয় খোলাসা করে নিতে চাই।

প্রথমেই NWW-এর তাত্ত্বিক কাঠামোর আরও তিনটি শ্রেণীবিন্যাসমূলক বিভাজনের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। দেখা যাচ্ছে, সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে। যেমন, NWW সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—ভঙ্গুর (ফ্রেজাইল), মৌলিক (বেসিক) ও পরিণত (ম্যাচিউর)। 'ভঙ্গুর ব্যবস্থায়' রাষ্ট্র (যতটুকুই বিদ্যমান) সংগঠনগুলোকে তেমন কোনো প্রতিরক্ষা দিতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র নিজেকেই ভেতরের কিংবা বাইরের সহিংস আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে খুব কমই সক্ষম হয়। এর তুলনায়, 'মৌলিক ব্যবস্থায়' রাষ্ট্র অনেকটা সংগঠিত এবং সাধারণভাবে সহিংস আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এ ছাড়া সংগঠনগুলোকে রাষ্ট্র কিছু মাত্রায় প্রতিরক্ষা দিতে পারে কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠানের বাইরে রেখে নয়। অর্থাৎ, এখানে সামাজিক এলিটদের অধিকার ও সুবিধাগুলো দারুণভাবে রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত।

'পরিণত' সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যথেষ্ট সংগঠিত এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্র সংগঠনের বাইরে, অর্থাৎ তার সরাসরি নিয়ন্ত্রণের বাইরেও অনেক উন্নত স্তরের

৯ '...where the identity of the organization is independent from the identity of its individual members' (NWW 2009, p- 46).

১০ উল্লেখ্য, NWW-র মূল লেখায় 'হিউম্যান অর্গানাইজেশনস'-এর ভাষান্তর হিসেবে আমি সর্বত্র 'সংগঠন' বা সংগঠনগুলো শব্দাদি ব্যবহার করেছি। এই 'সংগঠন' সামাজিক, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তি পর্যায়ের সংগঠন হতে পারে অথবা হতে পারে তা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

ও বিশেষায়িত সামাজিক বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত হতে সমর্থন দিয়ে থাকে। কিন্তু তার পরও এ ব্যবস্থায় এই সামাজিক বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনভাবে চলার বা স্বাধীন হয়ে ওঠার একটা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক দৃশ্যমান বা অপ্রত্যক্ষ সীমারেখা আছে। রাষ্ট্র তার বাইরের সংগঠনগুলোর ওপর এমনভাবে তদারকি ব্যবস্থা চালু রাখে বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যাতে করে রাষ্ট্র প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে রাষ্ট্র 'বাড়িত সুবিধা' বা 'রেন্ট' সৃষ্টি করতে পারে না। আর 'রেন্ট' সৃষ্টি ও তার বণ্টন করতে না পারলে রাষ্ট্রের পক্ষে প্রভুত্বকারী এলিট জোটের (ডমিন্যান্ট এলিট কোয়ালিশন) চাহিদা—যেমন: এলিটদের নিজেদের মধ্যে সহিংসতা কমানো, সামাজিক ব্যবস্থা অটুট রাখা, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এলিটদের আনুগত্য বজায় রাখা ইত্যাদি শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয় না।[১১]

প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা : রাষ্ট্রতত্ত্ব

আরও দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত, NWW-এর রাষ্ট্রচিন্তা বা আরও বিশেষ করে বললে তাঁদের রাষ্ট্রের স্বরূপ ও রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমতো অভিনব। প্রথাগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকে একক কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়। এতে করে রাষ্ট্রকে সমাজ থেকে বিযুক্ত করেও দেখা হয়। রাষ্ট্রসম্পর্কিত এ প্রথাগত চিন্তা NWW সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন। রাষ্ট্রসম্পর্কিত এ যাবৎকালের প্রাধান্যশীল ধারণা রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বহু দশক ধরে। অর্থনীতিবিদ বুকানন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক তত্ত্বে যেমন 'পাবলিক চয়েস ইকোনমিকস', 'রেন্ট সিকিং থিওরি' এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্বে যেমন মার্গারেট লেভির 'রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজিং স্টেট' এবং নব্বইয়ের দশকের বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব যেমন মানসুর ওলসনের (Mancur Olson) 'স্টেশনারি ব্যান্ডিট'-এর তত্ত্ব ইত্যাদি সুশাসন ও অর্থনীতি বিষয়ে অনেক গবেষণাকে গোটা দশক ধরেই প্রভাবিত করেছে। এগুলো রাষ্ট্রের একক কর্তৃত্বসম্পন্ন ধারণারই কয়েকটি প্রতিনিধিত্বকারী উদাহরণ।

১১ এই শ্রেণিবিন্যাসকে বাস্তব দুনিয়ায় উদাহরণ হিসেবে দেখাতে লেখকত্রয় কতিপয় দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। ভঙ্গুর শ্রেণীতে রয়েছে: হাইতি, ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের কতিপয় দেশসমূহ। মৌলিক শ্রেণিতে রয়েছে: বার্মা, কিউবা, উত্তর কোরিয়া এবং অনেক আরব ও সাব-সাহারা অঞ্চলের দেশ। পরিণত শ্রেণীতে দেখিয়েছেন ল্যাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতকে।

NWW জানাচ্ছেন এবং যেটা আমাদের আলোচনার জন্য বোঝা জরুরি, রাষ্ট্র সমাজ থেকে বিযুক্ত একক কর্তৃত্ব সম্পন্ন সংগঠন নয়। বরং রাষ্ট্র হচ্ছে, একই সঙ্গে এলিটদের মধ্যে জোট গঠনের এবং এলিট সংগঠনের সমাহার। অর্থাৎ, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সম্পর্কনির্ভর (রিলেশনাল) ধারণা, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যেকার আন্তসম্পর্কের প্রতিফলন। এই নিক্তিতে রাষ্ট্র কখনোই সমাজ থেকে বিযুক্ত হয়ে একক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো রাষ্ট্রীয় আয়-বর্ধনকারী (রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজিং) সংগঠন হয়ে উঠতে পারে না অথবা স্বাধীনভাবে 'দস্যুবৃত্তির' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সামাজিক এলিটদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারে না। রাষ্ট্র কখন এবং কীভাবে ওই ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বা হতে পারবে না, তা নির্ভর করবে রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও প্রভুত্বকারী এলিট গোষ্ঠীর (ও তার বিভিন্ন বর্গের) জটিল ও গতিশীল আন্তসম্পর্কের ওপর।

দ্বিতীয়ত, যে কথাটি আমি গোড়াতেই 'রাজনৈতিক উন্নয়নের' ব্যাখ্যায় বলেছি, কেবল রাষ্ট্রেরই রয়েছে একচ্ছত্র বিধিবদ্ধ সহিংস ক্ষমতা ধারণের ও তা প্রয়োগের বৈধতা। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রাষ্ট্রসম্পর্কিত এই মহামূল্যবান পর্যবেক্ষণটি করেছিলেন বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার। ওয়েবার-পরবর্তী রাষ্ট্রচিন্তা এটাকে স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় হিসেবে ধরে নিয়েছে। আধুনিকতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তায় এ নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। তবে এ যাবৎ রাষ্ট্রচিন্তায়, বিশেষ করে নীতিভিত্তিক (নর্মেটিভ) ঘরানায় ধরেই নেওয়া হয়েছে, যেকোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা 'বাস্তবে রয়েছে' (যেহেতু থাকা উচিত এবং এই ঔচিত্যবোধের ধারণাটি নীতিভিত্তিক সমাজচিন্তার একটা মূল বৈশিষ্ট্য)। সে জন্য অর্থনীতিবিদ মানসুর ওলসন সহজেই রাষ্ট্রকে 'ব্যান্ডিট' বা ক্ষমতাধর দস্যু হিসেবে ধরে নিতে পারেন, কেননা তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা তো রয়েছেই। NWW-এর রাষ্ট্রচিন্তার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হলো, রাষ্ট্রের কাছে বৈধ সহিংসতা প্রয়োগের ক্ষমতা 'রয়েছেই'—এ ধারণাটিকে তাঁরা বর্জন করেছেন। লক্ষ করুন NWW কিন্তু বলছেন না রাষ্ট্রের কাছে এই ক্ষমতা না থাকুক। প্রকৃতপক্ষে, একটু পরেই আমি দেখাব, তাঁরা মনে করেন যে কেবল উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সমাজব্যবস্থাতেই (যেটা তাঁদের পছন্দের সামাজিক ব্যবস্থা) রাষ্ট্রের কাছে বিধিবদ্ধ সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার আছে। সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের এই বিধিবদ্ধ সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার কাগজে-কলমে থাকলেও এর ন্যায্যতা সীমিত—রাষ্ট্রের বাইরের সংগঠনগুলো তা সহজে মেনে নিতে চান না। NWW দাবি করছেন, প্রচলিত রাষ্ট্রচিন্তার ভুলটা হচ্ছে, এটি রাষ্ট্র কীভাবে বৈধ সংহিসতা প্রয়োগের একাধিপত্য পেল তা ব্যাখ্যা না করে আগেভাগেই ধরে নেয় যে ওই ক্ষমতা আসলে রাষ্ট্রের

রয়েছে। অথচ বিশ্লেষকদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের ভেতর ওই ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সামাজিক প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করা। এখানেই চলে আসে NWW-এর রাষ্ট্র গঠন ও সামাজিক উত্তরণের মৌলিক ধারণাটি: সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় সহিংসতার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কাছে খুব অল্পই থাকে। এটা বরং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষমতাধারী এলিটদের কাছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে (যাতে করে সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির সংগঠনগুলো কার্যকর থাকতে পারে) সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রের ভেতর কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস চালায় না, বরং প্রচলিত সহিংস ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূত অবস্থাকে মেনে নিয়ে ক্ষমতাধারীদেরও দেনদরবারের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারত্ব দিয়ে অযথা সহিংসতায় লিপ্ত না হওয়ার প্রণোদনা সৃষ্টি করে। ক্ষমতাধারী এলিটদের এই সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট আন্তসম্পর্কিত ক্ষমতার বিন্যাস বা পুনর্বিন্যাসই (প্যাটার্ন অব ইন্টারলকিং পাওয়ার) হচ্ছে সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্বরূপ। এই ক্ষমতার বিন্যাস যতটা পরিমাণে সংশ্লিষ্ট এলিটদের প্রণোদনা দিতে পারবে, রাষ্ট্রও ততটা পরিমানেই স্থিতিশীল হবে। রাষ্ট্র এই অর্থে মূলত এলিট প্রণোদনার সামাজিক ভারসাম্যমূলক অবস্থা (সোশ্যাল ইকুইলিব্রিয়াম)। ম্যাক্স ওয়েবারের— বৈধ সহিংসতার ওপর রাষ্ট্রের একাধিপত্য-রাষ্ট্রচিন্তাটি বরং খাটে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের সমাজব্যবস্থার বেলায়।

তবে 'পরিণত' সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার লক্ষণ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এ বৈধ সহিংসতা সমাজ থেকে রাষ্ট্রের বিশেষায়িত (ভায়োলেন্স স্পেশালিস্ট) সংগঠনে—যথা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী ইত্যাদিতে—কেন্দ্রীভূত হওয়া। অর্থাৎ, সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা যতই পরিণত হবে, ততই বৈধ সহিংসতা প্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীভূত হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পরিণতি হচ্ছে, সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা ক্রমশ পরিণত স্তর পার হয়ে সমাজ উত্তরণের একপর্যায়ে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবে এবং এতে রাষ্ট্রের কাছে বৈধ সহিংসতার সবটাই কেন্দ্রীভূত হবে। অর্থাৎ, এখানে এসে ম্যাক্স ওয়েবার বর্ণিত রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন আমরা সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ঘটতে দেখব। তবে মনে রাখতে হবে, এই উত্তরণের কোনো গ্যারান্টি নেই। উত্তরণ উল্টোমুখীও হতে পারে অথবা একটি পর্যায়ে আটকেও থাকতে পারে অনেক দিন। আমার ধারণা, এই দুটোরই সংমিশ্রণ বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাবে।

তবে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় যে পরিণতমুখী উত্তরণ ঘটানোর প্রবণতা, তা বিশেষভাবে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধারী এলিটদের প্রণোদনার

ওপর। যেকোনো পরিবর্তন অতি আবশ্যিকভাবে হতে হবে প্রতিটি এলিট গোষ্ঠীর নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূলে, নয়তো এলিট প্রণোদনার ভারসাম্য হারিয়ে যাবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হলো, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাকামী এলিট গোষ্ঠীর বিধিবদ্ধ সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে তাদের অন্যবিধ অর্জনের (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে) ভারসাম্য বজায় রাখার প্রশ্নটি। এ বিষয়টি থেকে জন্ম নিয়েছে দ্বৈত ভারসাম্যের (ডাবল ব্যালেন্স)[১২] ধারণা। এই 'দ্বৈত ভারসাম্যের' ওপরেই নির্ভর করে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়—এলিট সমঝোতার (এলিট সেটেলমেন্ট) সম্ভাবনা বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে—এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনা। সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রতিটি পরিবর্তনকেই (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে) অতি আবশ্যিকভাবে 'এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার' ভিত্তিতে হতে হবে। শুধু পরিবর্তন নয়, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়টিও এই সমঝোতানির্ভর।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান হাল

আমি মনে করি, বাংলাদেশ সত্তরের দশকে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার ইতিপূর্বে সংজ্ঞায়িত 'মৌলিক' পর্যায়ে ছিল (স্মরণ করুন বাকশাল ও তার পরবর্তী মিলিটারি শাসনের সময়কাল)। আমার ধারণা, আশির দশকের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ 'মৌলিক স্তর' অতিক্রম করে অতিদ্রুতই 'পরিণত' সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় ঢুকতে পেরেছে। তবে এটা একদমই পরিণত পর্যায়ের প্রাথমিক স্তর, যেমন এক থেকে দশের মাপকাঠিতে (১ কম ১০ বেশি) হয়তো দুই বা তিনে এর অবস্থানে ছিল। ন্যূনতম প্রণালিগত গণতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও এত দ্রুততার সঙ্গে এই উত্তরণের কারণ হিসেবে বলব ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনীতির অতি দ্রুত বিকাশ (সত্তর দশকের গোড়ায় অর্থনৈতিক উদারীকরণ এর পেছনে কাজ করেছে) এবং এনজিও সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রাষ্ট্র দ্বারা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েও এবং রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল থেকেও এ দুই সেক্টর রাষ্ট্রের সঙ্গে আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় রেখেই সমাজ-অর্থনীতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা

১২ NWW 'double balance' ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : 'The incentives embedded in...organizations produce a double balance: a correspondence between the distribution and organization of violence of potential and political power on the one hand, and the distribution and organization of the economic power on the other hand. The idea of double balance suggests not only that all of the social system in a soceity must have an internal balance of interest but also that the political, economic, cultural, social and military systems must contain compatible systems of incentives across the system if the society is to remain stable' (NWW 2009, p- 20).

রাখতে পেরেছে। গণতন্ত্র না থাকায় এই সময়কালের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল তা হলো সবচেয়ে প্রভাবশালী এলিট শ্রেণীর (সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক দলসমূহ) ভেতরে রাজনৈতিক সমঝোতা। অর্থাৎ, এলিট প্রণোদনায় ভারসাম্য ছিল না, যার পরিণতিতে আশির দশকের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়, যেটির প্রতিফলন ঘটেছে ওই সময়ের ক্রম-বিক্ষুব্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের টালমাটাল অবস্থায়। নব্বইয়ের দশকে এসে কমপক্ষে দুটি কারণে ১. ন্যূনতম প্রণালিগত গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং ২. অতি ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি এলিট গ্রুপের (সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক দলসমূহ) মধ্যে সমঝোতা এই সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আমার ধারণা, এই সময়ের পরিণত পর্যায়কে এক থেকে দশের মাপকাঠিতে প্রায় পাঁচ দেওয়া যাবে। আমি এটাকে 'অর্ধপরিণত' (সেমি-ম্যাচিউর) প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা বলতে চাই। এই প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থাটি নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে বর্তমানে কমবেশি টিকে আছে। এটি টিকিয়ে রাখতে রাজনৈতিক এলিটরা নানাবিধ কৌশলের অবলম্বন করেছে, যেমন বল-প্রয়োগ, 'দলে ভেড়ানো' বা আত্তীকরণ এবং সাধারণ জনগণের কাছে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন ও উন্নয়নের বৈধতা নির্মাণ। এ ছাড়া এই ব্যবস্থাটি টিকিয়ে রাখার পেছনে আন্তর্জাতিক শক্তিরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই কৌশলগুলো ও তাদের ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ : বর্তমানের 'অর্ধপরিণত' সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে এলিটদের কৌশলসমূহ

প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে কৌশলসমূহ*	ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়া
বল-প্রয়োগ (কোয়ের্শন)	বর্তমান এলিট ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে ● 'প্রচলিত' অনুদার ব্যবস্থার সীমার মধ্যেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ; ● আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে উন্নয়ন এনজিওগুলোর 'রাজনৈতিক পরিসর' (পলিটিক্যাল স্পেস) সীমিত করা;

	● প্রচলিত ব্যবস্থাবিরোধী ইসলামি ও বাম দলগুলোকে সহিংসভাবে দমন। বর্তমান এলিট ভারসাম্যে সংকট তৈরি করছে ** ● বৃহৎ বৈধ ইসলামি দলকে সহিংসভাবে দমন—জামায়াতে ইসলামী; ● বৈধ ক্ষুদ্র ইসলামি দল এবং ইসলামি নাগরিক সমাজ, যারা নির্দিষ্ট সামাজিক (শিক্ষানীতি, মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি, নারী উন্নয়ন নীতি ইত্যাদি) নীতির সঙ্গে শরিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য দাবি করছে, তাদের সহিংসভাবে দমন।
আত্তীকরণ (কো-অপ্টেশন)	বর্তমান এলিট ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে ● বৃহৎ উন্নয়নমূলক এনজিওগুলোকে সাব-কন্ট্রাক্ট এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিয়ে রাষ্ট্রের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে নিয়োজিত করা (সহযোগিতা/ আত্তীকরণ/ 'দলে ভেড়ানো') ● নাগরিক সমাজের কিছু অংশকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তাদের মধ্যে একতা এবং সংহতি দুর্বল করার চেষ্টা; ● ক্ষুদ্রতর ইসলামি দল এবং গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিক জোটে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা; ● স্থানীয় রাজনৈতিক এলিটদের (উপজেলা পর্যায়ের যারা) মধ্যে দলগত বিভাজনের সুবিধা নিয়ে এবং কিছু অংশকে আত্তীকরণের মাধ্যমে তাদের দুর্বল করার প্রচেষ্টা; ● দলীয় মালিকানার মাধ্যমে বেসরকারি মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ/ আত্তীকরণের প্রচেষ্টা। কিন্তু বাস্তবে এমন কৌশল রাজনৈতিক এলিটদের পক্ষে যায়নি। দর্শক-শ্রোতাদের চাহিদার কারণে দলীয় মিডিয়াও বাধ্য হয়েছে অনুদার রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার এবং এলিট

	দুর্নীতির ব্যাপারে সমালোচনা করতে। মিডিয়া রাষ্ট্রের বা রাজনৈতিক এলিটদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবেই রয়ে গেছে। বর্তমান এলিট ভারসাম্যে সংকট তৈরি করছে ** ● উচ্চ আদালতের ক্রমাগত রাজনীতিকীকরণের প্রচেষ্টা। ● সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের ক্রমাগত রাজনীতিকীকরণের প্রচেষ্টা।
রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন (পলিটিক্যাল লেজিটিমেসি বিল্ডিং)	বর্তমান এলিট ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে ● প্রভুত্বকারী রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক (ইলেক্টরাল) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈধতা টিকিয়ে রাখা; ● পরিবারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের ক্যারিশম্যাটিক বৈধতা টিকিয়ে রাখা এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়ানো; ● বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বোচ্চ নেতাদের ক্যারিশমা টিকিয়ে রাখা এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়ানো; ● প্রতিষ্ঠাতাদের ও নেতৃত্বের এসব ক্যারিশমা দলীয় স্থিতিশীলতা রক্ষা করে যাচ্ছে। বর্তমান এলিট ভারসাম্যে সংকট তৈরি করছে ** ● মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা (রাজনৈতিক দল ও পরিবারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা কী ছিল/ এখন কোন দল বেশি মুক্তিযুদ্ধের 'চেতনা' ধারণ করে ইত্যাদি প্রসঙ্গ); ● ভারতের সঙ্গে দলগুলোর রাজনৈতিক এবং আদর্শগত সম্পর্কের প্রোপাগান্ডা (কোন দল বেশি মাত্রায় ভারতপন্থী? কোন দল ভারত

	থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা যথা, পানি, বাণিজ্য-সুবিধা বা ট্রানজিট নিশ্চিত করতে পারবে এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে?
উন্নয়ন বৈধতা নির্মাণ (ডেভেলপমেন্টাল লেজিটিমেসি বিল্ডিং)	বর্তমান এলিট ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে ● ম্যাক্রো-পরিসরে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ● দরিদ্রদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার প্রদানে সফলতা; ● মোটামুটিভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার রক্ষা করা। বর্তমান এলিট ভারসাম্যে সংকট তৈরি করছে** ● তাৎপর্যপূর্ণ কোনো সংকট নেই।
আন্তর্জাতিক শক্তির ভূমিকা	● নির্বাচনে বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু এলিট পালাবদল (এলিট সাকসেশন) সম্ভব করছে; ● সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ঠেকানো।

* বাম কলামে নির্দেশকগুলো পার্কস ও কোল (২০১০) থেকে নেওয়া।
** বিদ্যমান (real) এবং সম্ভাব্য (potential)।

এ লেখার শুরুতেই বলে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের বিকাশ ও গতিময়তার বিশদ তথ্যবিবরণীতে যাওয়ার অবকাশ এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে আমি দ্রুত কিছু তথ্য পর্যবেক্ষণ পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চাই। রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রথম বিষয়টি ছিল 'রাষ্ট্র নির্মাণ'। এর দুটো দিকের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা আরও বিস্তৃত করে বলা চলে প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার উদ্ভব ও রাষ্ট্রের (এবার মূলত সংগঠন অর্থে) ভেতরে বৈধ সহিংস ক্ষমতার প্রয়োগের সুসংহতকরণ। এ দুটো বিষয়েই বাংলাদেশের অবস্থান শুধু স্থবির হয়ে থাকেনি, বরং আমি দাবি করব, নব্বইয়ের দশকের তুলনায় এ ব্যাপারে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র আরও পিছিয়েছে। শুধু ভাবুন আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কথা। পরিবারতন্ত্র

সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে, অদূর ভবিষ্যতে যা থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারছে না। ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার উদ্ভব ও সংহতকরণ প্রক্রিয়া শুধু রাজনীতিতেই অনুপস্থিত তা-ই নয়, রাষ্ট্রীয় সংগঠনেও (প্রশাসন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে) এর কোনো হদিস মেলে না। এনজিওগুলোতেও একই চিত্র; এমনকি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেও করপোরেট শাসনের বদলে পারিবারিক শাসনই প্রধান। আমাদের আলোচনার জন্য অবশ্য রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ টানাটাই যথেষ্ট ছিল।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বৈধ সহিংসতার কেন্দ্রীভবন ও সুসংহতকরণ প্রক্রিয়ায় মিশ্র গতিময়তা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীভবন ও সুসংহতকরণের মূর্ত প্রকাশ হচ্ছে রাষ্ট্রের বৈধ সহিংসতা প্রয়োগের বিশেষায়িত সংগঠনগুলোর (যেমন : সেনাবাহিনী, বিভিন্ন নিরাপত্তাবাহিনী এবং সর্বোপরি পুলিশ) ভূমিকা। এগুলো কি সর্বতোভাবে রাষ্ট্র সংগঠনে কেন্দ্রীভূত, নাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমাজের পরাক্রমশীল এলিট গোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ? বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক অর্থে প্রথম পর্যবেক্ষণটি প্রধানত সত্য। সেনাবাহিনীর ব্যাপারে কথাটি প্রায় সর্বতোভাবে সত্য। গত দুই দশকে রাজনীতির অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেলেও কার্যত সেনাবাহিনী রাষ্ট্র সংগঠনে কেন্দ্রীভূত ও সংহত একটি প্রতিষ্ঠান। বিষয়টি সম্ভবত আরও জটিল, যার আলোচনায় আমি এই লেখার শেষের দিকটায় আবার ফিরে আসব। অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর বেলাতেও এই পর্যবেক্ষণটি সত্য। পুলিশের বেলায় পর্যবেক্ষণটি খানিকটা জটিল। আনুষ্ঠানিক অর্থে এটি রাষ্ট্র সংগঠনে কেন্দ্রীভূত হলেও বাস্তবে এর দলীয়করণ যে পর্যায়ে গেছে, এটিকে আর প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র সংগঠনে কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান বলা দুষ্কর হয়ে পড়ছে। এটি বাস্তব অর্থে রাষ্ট্রসংগঠনের বাইরে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার অধীনে সমাজে বিরাজিত ন্যূনপক্ষে দুটি রাজনৈতিক এলিট গোষ্ঠীর (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) আজ্ঞাবহ সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগের বিশেষায়িত সংগঠনে পরিণত হয়েছে। পুলিশের দলীয়করণের সঙ্গে যোগ করা যাবে কার্যত বিশেষায়িত সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগের আরও কিছু 'প্রতিষ্ঠানের' নাম, যারা বর্তমান কালের অনুদার শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপক। আমি এখানে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন ফ্রন্ট সংগঠনের কথা বলছি : ছাত্র, যুব ও শ্রমিক সংগঠন। একবার ভাবুন, হরতালের সময় কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে চাঁদা আদায়ের বেলায় এদের বাস্তব ভূমিকার কথা। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এলিটরা পুলিশের চেয়েও এদের ওপর বেশি নির্ভর করে হরতাল ব্যবস্থাপনায় অথবা বিরোধী শক্তি দমনে। এতে করে রাজনৈতিক এলিটরা সহিংসতার ব্যক্তিকরণ (প্রাইভেটাইজেশন অব ভায়োলেন্স) ঘটিয়েছে।

ওপরের এ আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এ পর্যবেক্ষণে পৌঁছাতে পারি যে পুলিশের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং 'সহিংসতার ব্যক্তিকরণ' রাষ্ট্র সংগঠনে বৈধ

সহিংসতার কেন্দ্রীভবন ও সুসংহতকরণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের এ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকটি গত দুই দশকের গণতন্ত্রে শুধু স্থবির থাকেনি, সম্ভবত অনেক পিছিয়েও গেছে। আইনের শাসন বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে সংহত হয়নি, সেটা নিয়ে মতভেদ অল্প। তবে যেটা কৌতূহলোদ্দীপক সেটা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক উন্নয়নের দুই দশক পার হয়ে যাওয়ার পরও রাজনৈতিক এলিট শুধু নিজেদের জন্যও সীমিত আকারে আইনের শাসন কার্যত সংহত করতে পারেনি। পুলিশের দলীয়করণ, এলিট গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্তসম্পর্ক বছরের পর বছর ধরে অনুদার প্রক্রিয়ার ভেতর আটকে রাখা, নিম্ন আদালতের কার্যক্রম দলনিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ না পাওয়া এবং বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুযায়ী, উচ্চ আদালতেরও নির্দিষ্ট কার্যক্রম (যেগুলো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট) অনেক ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবমুক্ত না হতে পারাটা এসব রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে আইনের শাসনের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার জন্মানোর ইঙ্গিত বহন করে না। মোদ্দা কথা যা দাঁড়াল, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে, এমনকি রাজনৈতিক এলিটদের মাঝেও, আইনের শাসনের বদলে যেটা সৃষ্ট হয়েছে এবং কার্যত যা সংহত রূপ ধারণ করেছে তা হলো, আইনের শাসন নয়, বরং আইন দ্বারা শাসন (রুল বাই ল)।

এবারে আমি রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্য নির্দেশকটি, অর্থাৎ রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে ন্যূনতম প্রণালিগত গণতন্ত্রের সুসংহতকরণের প্রশ্নে কিছু মন্তব্য রাখব। লক্ষ করুন, লেখার শুরুতেই যা আমি বলেছি, গণতন্ত্রের সুসংহতকরণ বলতে বর্তমানের অনুদার গণতন্ত্র থেকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে কেবল রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের কথা বলা হচ্ছে। গণতন্ত্র মানে সংশ্লিষ্ট এলিটদের মধ্যে বাধাহীন প্রতিযোগিতা— এর মধ্যে সীমিত থেকেই বিচারের প্রয়াস পাচ্ছি। গণতন্ত্রের ন্যূনতম সংজ্ঞা বলতে এখানে অনুসৃত হচ্ছে প্রতিযোগিতা বা গণতন্ত্রের বিখ্যাত তাত্ত্বিক রবার্ট ডল (Dahl) যেটাকে বলেছিলেন 'কনটেসটেসন ওপেন টু পার্টিসিপেসন' বা যাকে বলা যায়, অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতা।[১৩] ন্যূনতম গণতন্ত্রের এ ধারণায় রাজনৈতিক উন্নয়নের ওপর আলোচিত নির্দেশকগুলো টেনে আনার প্রয়োজন নেই, যেহেতু অনুদার থেকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে চলছে কি না, আদালত রাজনৈতিক দলের চাপমুক্ত থেকে কাজ করতে পারছে কি না বা দলীয় ছাত্রফ্রন্ট বাস্তব অর্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পরিণত হলো কি না, তা আমাদের এই গণতন্ত্রের ধারণায় বিবেচ্য বিষয় নয়। নির্বাচনটা সংশ্লিষ্ট এলিটদের বাধাহীন বা গ্রহণযোগ্য মনে হলো কি না, সেটাই এখানে প্রাসঙ্গিক। এটি

১৩ Dahl, 1989.

একটি গণতন্ত্রের অত্যন্ত সীমিত নির্ধারক। এই সীমিত সংজ্ঞার মধ্যে থেকেই কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটিকে যত 'সহজ' ও সংকীর্ণভাবে আমরা উপস্থাপনা করি না কেন বাস্তবে এর অনুসরণ যে কত কঠিন, তা আমাদের রাজনৈতিক এলিটরা গত দুই দশকে চার চারটি নির্বাচনে তা প্রমাণ করেছে। এর সাম্প্রতিক ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সবাই জানেন, তাই বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। তৃতীয় পক্ষের তত্ত্বাবধান ছাড়া (অর্থাৎ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া) নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় না। তার পরও নির্বাচনের ফলাফল কোনো পরাজিত দলই স্বেচ্ছায় মেনে নেয় না (সেনাবাহিনী, বিদেশি চাপ ইত্যাদি ফলাফল মেনে নিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, যদিও সেই সম্মতিও সাময়িক)। এবং মোটামুটিভাবে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ বা স্বচ্ছ হবে, তা বিরোধী দল কল্পনাও করতে পারে না। এগুলোর অর্থ হলো, গেম থিওরির ভাষায় বললে দুই দশক ধরে গণতন্ত্রের 'খেলা' পুনরাবৃত্ত (রিপিটেড গেম) হলেও এটি এখনো পর্যন্ত কোনো স্বয়ং-প্রযুক্ত (সেলফ-এনফোর্সিং) ভারসাম্যে উপনীত হতে পারেনি। বিষয়টি বিরোধী দলের দিক থেকে দেখলে যৌক্তিকই মনে হয়। বিরোধী দলের যুক্তি হচ্ছে, 'আমি ভালো করেই জানি (কেননা, আমি দেখছি এখন কী ঘটছে) নির্বাচনসংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান, আনুষ্ঠানিক অর্থে যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, বাস্তবে তার অপপ্রয়োগ ঘটবে। তাই দলীয় তত্ত্বাবধানে নির্বাচন আমি মানব কেন?' তবে ক্ষমতাসীন এলিটদের দিক থেকে দেখলে প্রচলিত এলিট প্রণোদনার রূপটি কিছুটা রহস্যজনকই মনে হয়। ক্ষমতাসীন এলিটরা তো এটাও ভাবতে পারতেন যে 'আমি যদি মনে করি ন্যূনতম প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখাটা আমাদের (সব রাজনৈতিক এলিটদের) জন্য জরুরি, তাহলে আমি আইন বা প্রতিষ্ঠানের অপপ্রয়োগ (সুযোগ আছে বলেই) কেন করব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের বর্তমান ভারসাম্যটাকে যুগ যুগ ধরে কেন টিকিয়ে রাখব? আমি তো জানি, এই ভারসাম্যের পরিণতি কী হতে পারে (সব রাজনৈতিক এলিটের জন্যই তা আত্মবিধ্বংসী, যেটি ২০০৭-০৮ সালে আমরা দেখেছি)।' এ সত্ত্বেও এলিটদের ন্যূনতম প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র যে এ দেশে স্বয়ং-প্রযুক্ত হলো না, তার একটা মৌলিক কারণ সম্ভবত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক এলিটদের দিক থেকে এ ধরনের গণতন্ত্রের একটা বিশেষ শর্ত মেনে না নেওয়া। প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের মধ্যে—সংজ্ঞাগতভাবেই—একটি অন্তর্নিহিত 'অনিশ্চয়তা' রয়ে গেছে।[১৪] এর অর্থ হলো, 'নির্বাচনে আমি হেরে যেতে পারি এবং

১৪ অ্যাডাম সেভরস্কি যেমনটা বলেছেন: '...Outcomes of the democratic process are uncertain, inderminate, ex ante.' (সেভরস্কি ১৯৯১, পৃ. ১০)।

সংশ্লিষ্ট আইনকানুন বা প্রতিষ্ঠান সবার জন্য একই আছে, এ বিশ্বাস রেখে গণতন্ত্রের অনিশ্চয়তায় নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়া চাই। ভোটার বা জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে তারা কী চায়।[১৫] এবং আমি আরও জানি, ভবিষ্যতেও ক্ষমতাসীন দল একই অনিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিয়ে নির্বাচন দেবে এবং আমার দল ক্ষমতাসীন যদি না-ও থাকে, তবু আমার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আমি এখন এবং ভবিষ্যতেও গণতন্ত্রের এ খেলায় নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করব।' এ রকম যেখানে ভাবা হয় সেখানেই গণতন্ত্রের স্বয়ং-প্রযুক্ত ভারসাম্যে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে কোনো 'বাইরের' তৃতীয় পক্ষের (তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেনাবাহিনী অথবা বিদেশি শক্তি) প্রয়োজন হয় না গণতন্ত্রকে চালু রাখার জন্য বা পারস্পরিক বিশ্বাসের একটি শুভ চক্রের মধ্যে গণতন্ত্রকে সুসংহত করে ফেলার জন্য।

কিন্তু শুভ চক্রের গণতন্ত্রের যে চিত্রটির বর্ণনা আমি এখানে করলাম, সেটা শুধু যৌক্তিক সম্ভাবনার, বাস্তবের নয়। খুব সংক্ষেপে বললে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির বাস্তবতা অনেকটা এই রূপ: ন্যূনতম প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তা সুসংহতকরণের দুটি মৌলিক শর্তই আজকের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই দুটো শর্ত হচ্ছে—(ক) এলিটদের ভেতরে নিজে বাঁচো ও অন্যকে বাঁচতে দাও নীতি (লিভ অ্যান্ড লেট লিভ পলিসি) এবং (খ) রাজনৈতিক এলিটদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা বদলের সর্বগ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি। এর ফলাফল: সবার সঙ্গে সবার 'হবসিও যুদ্ধ' (Hobbesian war of all against all) অর্থাৎ, একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি, এবং রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের শুভ চক্রের সৃষ্টির বদলে ক্রমাগত পারস্পরিক অবিশ্বাসের দুষ্টচক্রের জন্ম ও তার সংহতকরণ।

বাংলাদেশে কেন রাজনৈতিক উন্নয়ন হয় না?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকগুলোর বর্তমান অবস্থার চিত্রটি আমি বর্তমান লেখায় একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছি। বিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, 'কী হচ্ছে' তার বর্ণনা দেওয়ার চেয়ে 'কেন হচ্ছে' তার সদুত্তর খোঁজা। এখানে লেখার শুরুতেই যেমনটা বলা হয়েছে, উত্তরের চেয়ে প্রশ্নই বেশি করব এবং ভবিষ্যৎ আলোচনার একটা তত্ত্বগত রেখাচিত্র

১৫ স্পেনে গণতন্ত্রের প্রারম্ভে পার্লামেন্টে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী এডলফো সুয়ারেজ গণতন্ত্রে জনগণের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন: [এখন থেকে] ...The future is not written because only the people can write it." (Prezworski 1991: থেকে উদ্ধৃত)। আমাদের প্রধানমন্ত্রীগণ মুখে এ ধরনের কথা বললেও প্রাণে তা বিশ্বাস করেন কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ জনমনে থেকেই যায়।

দেওয়ার চেষ্টা করব। আলোচনায়, তাত্ত্বিক ফ্রেম বা কাঠামো হিসেবে প্রধানত NWW বর্ণিত সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার ধারণাটি ব্যবহৃত হবে।

শুরুতেই রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দুটো নির্দেশকের ওপর আলোকপাত করব। এগুলো হলো: রাষ্ট্র নির্মাণ ও আইনের শাসনের সুসংহতকরণ। এই আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্র নির্মাণ বলতে বোঝানো হচ্ছে দুটো নির্দেশককে: রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার উদ্ভব এবং বিধিবদ্ধ বা বৈধ সহিংস ক্ষমতা প্রয়োগের সুসংহতকরণ। আর আইনের শাসনের বিষয়টি এখানে সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে আইনের শাসনের প্রয়োগ ও তার বৈধতাকে বিচার করা হচ্ছে।

আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক এলিটদের (সব পক্ষের কথাই বলছি) মধ্যে একটি নীরব রাজনৈতিক সমঝোতা (পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট) বিরাজ করছে, আর সেটি হলো রাজনৈতিক সমাজে (পলিটিক্যাল সোসাইটি) ও রাষ্ট্রসংগঠনে ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার উদ্ভবের প্রক্রিয়াকে যত দিন সম্ভব ঠেকিয়ে রাখা। ঠিক একই সমঝোতা আছে রাষ্ট্রসংগঠনের অভ্যন্তরে বৈধ সহিংস ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, ও সুসংহতকরণ প্রক্রিয়াটাকেও বাধা দেওয়া এবং এলিটদের মধ্যে আইনের শাসনের বদলে 'আইন দ্বারা শাসন' প্রক্রিয়াটিকে চালু রাখা। গণতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে রাজনৈতিক এলিটরা খুব সফলতার সঙ্গে এসব কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনসমূহকে আটকে রাখতে পেরেছে। এলিট সমঝোতার মানেই হচ্ছে এলিট প্রণোদনার ভারসাম্য। সংশ্লিষ্ট পক্ষের কারও এ ভারসাম্যের কারণে বিশেষ কোনো ক্ষতিসাধন না হলে বিদ্যমান ভারসাম্যও বদলাবে না। কেননা, ভারসাম্য সংজ্ঞার্থেই স্থিতি পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ কারণাভাব। ভারসাম্য না পরিবর্তনের অর্থ হলো প্রচলিত সমাজ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটা। প্রচলিত এ ভারসাম্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এলিটদের জন্য শুভকর হলেও (কেন, তার ব্যাখ্যায় একটু পরেই যাচ্ছি) বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার গতিময়তার পরিপ্রেক্ষিতে ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটি বেশ অশুভ। সে জন্য বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিত থেকে দেখলে এটি একটি দুষ্ট ভারসাম্য (পারভার্স ইকুইলিব্রিয়াম)।

প্রচলিত ভারসাম্যটি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এলিটদের জন্য শুভকর কেন? এর প্রধান কারণ ভারসাম্যটি অনুদার শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এলিটদের জন্য এ ব্যবস্থা টিকে থাকার লাভ অনেক। এটা টিকে থাকলেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাস্তবে শুধু ন্যূনতম প্রনালিগত গণতন্ত্রে বা আরও সীমিত অর্থে, নির্বাচনী প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের বৃত্তেই ঘুরপাক খাওয়াতে পারে এলিটরা। অনুদার ব্যবস্থা থেকে উদারনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রে উত্তরণের

বিষয়টিকে প্রান্তিকীকরণ করা যায় নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ডিসকোর্সে। এতে করে কার্যকরভাবে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার বিভিন্ন নাগরিক সমাজের গ্রুপগুলোকেও সফলতার সঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা সম্ভব। গত দুই দশকে এই এলিট সমঝোতাভিত্তিক অনুদার প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের রাজনৈতিক ভাবাধিপত্য (হেজিমনি), নাগরিক সমাজের প্রায় সব গ্রুপকে অতি সফলতার সঙ্গে প্রান্তিকীকরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ দেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের অসফলতার এটি একটি বড় কারণ।

দুই দশকের বেশি গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্বে আমরা লক্ষ করছি, সার্বিক অনুদার শাসনব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক এলিট বর্তমানের সাময়িক কষ্ট বা অত্যাচার মেনে নিয়েছে। আদালত বা পুলিশের অন্যায়, অবিচারমূলক ব্যবহার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ফ্রন্টগুলোর জুলুম বা সহিংসতা ইত্যাদি সহ্য করা বা প্রতিবাদ হলেও তাকে তাৎক্ষণিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা (আটক ব্যক্তির মুক্তি চাওয়া, বেইল চাওয়া, ইত্যাদি)—এই ছিল মোটামুটিভাবে বিরোধী এলিটের অনুদার শাসনের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিক্রিয়া। লক্ষ করুন, বিরোধী এলিট কখনোই পুলিশের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধের স্থায়ী পদক্ষেপের দাবি জানায়নি। সহিংস রাজনৈতিক ফ্রন্টগুলো যে আইনের ঊর্ধ্বে থেকে তৎপরতা চালায়, তা স্থায়ীভাবে বন্ধের দাবি তোলেনি অথবা আদালতের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধের জন্য বিচারব্যবস্থার সার্বিক স্বাধীনতা দাবি করেনি।[১৬] শুধু অপেক্ষা করেছে ক্ষমতায় এসে একই অনুদার-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নেওয়ার। অনুদার-ব্যবস্থার এই পৌনঃপুনিক (অ্যাড ইনফিনিটাম) ব্যবহারের ফল যে একটি এলিট দ্বৈত-ভারসাম্য তাকেই প্রমাণ করে; সক্রিয় ভারসাম্যের যুক্তিই বলে যে এটা ভেতর থেকে সহজে ভাঙার নয়। এটা ভাঙবে বাইরের কেউ, নীতিভিত্তিক অর্থে নাগরিক সমাজের গ্রুপগুলো। তবে বাস্তবে, গত দুই দশকে, এটা সীমিত সময়ের জন্য হলেও হয়তো একবারই শুধু ভেঙেছে ২০০৭-০৮ সালের মিলিটারি-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে—অন্তত কিছু সময়ের জন্য। ২০০৯-এর নির্বাচনোত্তর গণতান্ত্রিক পরিবেশে এ অনুদার এলিট ভারসাম্যটি তেমন কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কার্যত অর্থে অতিদ্রুতই ফিরে এসেছে।

আমি দাবি করছি, এই অনুদার এলিট ভারসাম্য রাজনৈতিক এলিটদের জন্য শুভকর হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সীমিত প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার

১৬ এলিট রাজনৈতিক সমঝোতার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের স্বাধীনতার অভাব। বিরোধী দল প্রায় নীরবে হজম করে এর মিথ্যাচার এবং ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে ক্ষমতায় গিয়ে এই প্রপাগান্ডা যন্ত্রের দখলের। এর স্বাধীনতা কেউ-ই চায় না।

গতিময়তার জন্য এর প্রভাব অতি ঋণাত্মক। এর নীতিভিত্তিক যুক্তির ব্যাখ্যায় যাওয়ার দরকার নেই। আমরা সবাই উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং উদার শাসনব্যবস্থায় থাকতে চাই বা যেতে চাই। নাগরিক বা মানুষ হিসেবে এতটুকু মৌলিক অধিকার সংবিধান আমাদের দিয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদেও আমাদের এই অধিকার সংরক্ষিত আছে। বিশেষ ক্ষতির দিক হলো, এই অনুদার এলিট ভারসাম্য প্রচলিত সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার প্রগতিশীল গতিময়তার সম্ভাবনাতেও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থা যে অনেক দিন ধরে 'অর্ধপরিণত' অবস্থায় আটকে আছে, পরিণত হওয়ার মাপকাঠিতে যে এটি পাঁচের মাত্রাকে অতিক্রম করতে পারছে না, তার জন্য প্রধানত দায়ী বর্তমানের এলিট অনুদার ভারসাম্যটি। সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় বৈশ্বিক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে NWW দেখিয়েছেন যে এ ব্যবস্থাকে যদি অধিকতর পরিণত হতে হয় তার জন্য তিনটি শর্ত (যাকে তাঁরা বলছেন-doorstep conditions) পূরণ হতে হবে, যা এলিটদের নিজেদের ভেতর ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার প্রসার ঘটাতে প্রণোদনা জোগাবে। এই শর্ত তিনটি হলো: এলিটদের মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রসংগঠন ও রাজনৈতিক সমাজে এমন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব, যা ব্যক্তির বা দলের পরিচিতি নিরপেক্ষ এবং সেনাবাহিনীর ওপর রাষ্ট্রসংগঠনের কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সুসংহতকরণ। আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের প্রচলিত এলিট অনুদার ভারসাম্য, তিনটি শর্তের প্রথম দুটির উদ্ভব ও সুসংহতকরণের পথে বিরাট বাধা। রাজনৈতিক দলে ব্যক্তি প্রাধান্য বা পরিবারতন্ত্র বর্তমানে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। রাষ্ট্রের সংগঠনগুলা (আদালত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসহ) ব্যাপক অর্থে ব্যক্তি বা দলনিরপেক্ষ নয় এবং এ দুটির প্রভাবও আগের চেয়ে অনেক বেশি। তৃতীয় শর্তের বিষয়টি কিছুটা জটিল। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, সেনাবাহিনী কার্যত রাষ্ট্রীয় সংগঠনে কেন্দ্রীভূত ও সংহত একটি প্রতিষ্ঠান। তবে কথাটা হয়তো সর্বতোভাবে সত্য নয়। এটি এই অর্থে সত্য যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান (মনে রাখবেন, আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই এবং ভৌগোলিকভাবে আমাদের কাছের দেশ আফগানিস্তান বা নেপালে সেনাবাহিনী এখনো সম্পূর্ণভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়)। অবশ্য খুব সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতা বদলের পদ্ধতির অনেক দিনের সমঝোতা বিনষ্ট হওয়ায় (যার পরিণতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বিলোপ করা হয়েছে) সেনাবাহিনীর ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুসংহতকরণের বিষয়টি আর স্পষ্ট নয়। এক-এগারোর ভূত আজ যেভাবে রাজনৈতিক আলোচনাকে (জনপ্রিয় এবং একাডেমিক বলয়ে) তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে NWW প্রদত্ত তৃতীয় শর্তটি বাংলাদেশে প্রযোজ্য—এ কথাটি আর হয়তো জোর দিয়ে বলা

যাবে না।[১৭] হয়তো বলা চলে শর্তটি বাংলাদেশে আংশিক অর্থেই প্রযোজ্য। এ যাবৎ আলোচনায় তাহলে এই দাঁড়াল যে বর্তমানের এলিট সমঝোতাভিত্তিক অনুদার ভারসাম্যটি সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থার অধিকতর পরিণত হওয়ার প্রগতিশীল সম্ভাবনার পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। যার ফলাফল বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে হয়েছে অতিমাত্রায় ঋণাত্মক।

রাজনৈতিক উন্নয়নের ৩ নম্বর নির্দেশকটিতে এবার আসা যাক: গণতন্ত্রে উত্তরণ। অর্থাৎ, ন্যূনতম প্রক্রিয়াগত গণতন্ত্রের সুসংহতকরণ। এখানে প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক এলিটদের পক্ষে নির্বাচনী গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তাকে মেনে নেওয়ার ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা বোঝার জন্য আমরা একাডেমিক আলোচনার একটি বিশেষ তাত্ত্বিক ঘরানার সাহায্য নিতে পারি। এটি হচ্ছে এলিটকেন্দ্রিক বা 'এজেন্সিকেন্দ্রিক' তত্ত্ব। এর মূল কথাটি হলো এই: গণতন্ত্রের সুসংহতকরণ অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক এলিটদের কৌশলগত সমঝোতার একটা রূপ। সেটাই যদি হয়, তাহলে গণতন্ত্র সংহতকরণ হবে কিছু সময়ের ব্যবধানে। যুক্তিটা হচ্ছে এরূপ: সময়ের পরিসরে রাজনৈতিক এলিটরা একে অন্যের সংস্পর্শে বারবার আসে রাজনীতিসংশ্লিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়ার বদৌলতে। এতে করে গণতন্ত্রের স্বয়ংপ্রযুক্ত গুণাবলির (যেমন: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক বিশ্বাস ইত্যাদি) উন্মেষ ঘটে যায় সংশ্লিষ্ট এলিটদের ভেতর। এর মানে দাঁড়ায়, সময়ের ব্যবধানে, বর্তমানের গণতান্ত্রিক 'উত্তরণের' পর্যায় (যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলিটদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব) থেকে এলিটরা সরে গিয়ে গণতন্ত্রের অভ্যাসগত পর্যায়ে উপনীত হয় (যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ)।[১৮]

বাংলাদেশে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক এলিটরা এ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'উত্তরণ' পর্যায় থেকে 'অভ্যাসগত' পর্যায়ে উঠে আসতে পারেনি। স্পষ্টতই এ তত্ত্বের মূল অনুমানটি— **সময়***— প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক উত্তরণের ক্ষেত্রে বোধ করি উপযোগী নির্ধারক নয়। তা ছাড়া এ তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান— গণতন্ত্র জন্মায় এলিটদের ইচ্ছায় ও সিদ্ধান্তে— যারা এ ব্যাপারে খুব অল্পই প্রভাবিত হয় 'কাঠামোগত' (একটু পরেই ব্যাখ্যা দেব) বিষয় দ্বারা— এটিও সম্ভবত গণতন্ত্র সুসংহতকরণের ব্যাখ্যার উপযোগী নয়।

১৭ এক এগারোর পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধমূলক স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ভাবা যেতে পারে যে রাজনীতিবিদেরা সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে আরও তৎপর হবেন । এতে রাষ্ট্রসংগঠনে সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীভবনের ও সংহতকরণের বদলে প্রচেষ্টা চলবে সমাজে বিরাজিত রাজনৈতিক এলিটদের বিভিন্ন গ্রুপের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীকে আত্মকরণের (অনানুষ্ঠানিক অর্থে)।

১৮ Rustow, 1970.

* কালো হরফ লেখক গুরুত্ব বোঝাতে ব্যবহার করেছেন।

বাংলাদেশের এলিটদের মধ্যে গণতন্ত্রের 'অভ্যাসগত' পর্যায়ে উপনীত না হওয়ার কারণ বোধ হয় এলিট বা এজেন্সিকেন্দ্রিক অতিমাত্রায় ব্যক্তি-ইচ্ছা-নির্ভর তত্ত্বে না খুঁজে গণতন্ত্রের 'কাঠামোগত' তত্ত্বে খোঁজা যেতে পারে।[১৯] খুব সহজ করে বললে এ ঘরানার তত্ত্ব দাবি করে যে সমাজে ও অর্থনীতিতে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে গেলে তা গণতন্ত্র নির্মাণে সহায়ক হয়। গণতন্ত্র দারিদ্র্যের মাঝে বা অনুন্নত সমাজব্যবস্থায় জন্মায় না, বরং তা বিকশিত হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের হাত ধরে। শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রসার, নগরায়ণ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ (বুর্জোয়া, শ্রমিকশ্রেণী, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী) সমাজে জটিলতা বাড়ায়, যা গণতন্ত্র জন্মানোর উর্বর জমি হিসেবে কাজ করে। গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অর্থনীতিতে দীর্ঘ সময় ধরে প্রবৃদ্ধি ঘটা খুব জরুরি, কেননা এতে করে একটি সামাজিক অবকাঠামো (সামাজিক শ্রেণীর কোয়ালিশন, যাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া দাবি করার ও প্রয়োজনে সেগুলো রক্ষা করার প্রণোদনা ও সক্ষমতা রয়েছে) তৈরি হয়, যা গণতন্ত্রের সুসংহতকরণের জন্য প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের কাঠামোগত তত্ত্বকে অনুসরণ করলে আমরা কিন্তু প্রত্যাশা করতে পারি বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে যে দ্রুত ও সুদৃঢ় (রোবাস্ট) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে, তাতে করে গণতন্ত্রের জন্য জরুরি ওই সামাজিক কাঠামোটি একটা মোটামুটি ভালো পর্যায়ে সম্ভবত সংগঠিত ও সংহত হয়েছে। আমার এ ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও তা সুসংহতকরণ বা সার্বিকভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নের ওপর ওই সামাজিক কাঠামোটির শুভ প্রভাব এখনো কেন আমরা লক্ষ করছি না? তাহলে কাঠামোগত তত্ত্বটিও কি এলিট বা এজেন্সিকেন্দ্রিক তত্ত্বটির মতো বাংলাদেশের বাস্তবতা ব্যাখ্যায় অকার্যকর? কাঠামোগত তত্ত্বের প্রতি আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে এবং এ ব্যাপারে আমি এতটা চূড়ান্তধর্মী মন্তব্য করব না। আমার কাছে মনে হয়, কাঠামোগত তত্ত্ব বাংলাদেশের বাস্তবতার আংশিক ব্যাখ্যার উপযোগী। বাকিটার জন্য অন্যান্য তত্ত্বেরও খোঁজ করতে হবে। অর্থনীতি ও সমাজ-প্রক্রিয়া রাজনীতির ওপর অভিঘাত ফেলে এবং রাজনীতির প্রকৃতি ও গতিময়তাকে প্রভাবিত করে সত্যি, কিন্তু তার ফলাফল কোনো সরলরৈখিক কার্যকারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং ফলাফলের পেছনে বহু রৈখিক কার্যকারণ সক্রিয় থাকে। লক্ষ করে দেখবেন, বাংলাদেশের এলিট অনুদার ভারসাম্যের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের একাংশই প্রধানত (অধিকার দাবিভিত্তিক নাগরিক সমাজে যারা সংঘবদ্ধ এবং বেসরকারি মিডিয়া) মোটামুটিভাবে উচ্চকিত—বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী নয়।

১৯ গণতন্ত্রে উত্তরণের দুই তাত্ত্বিক ঘরানার (অর্থাৎ, এলিট/এজেন্সিকেন্দ্রিক ও কাঠামোগত) ওপর খুব উপকারী ও উঁচুমানের পর্যালোচনার জন্য দেখুন Acemoglu, Robinson (2006) এবং Moore (1996).

এটা যদিও সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক উত্তরণের তৃতীয় স্রোত এবং সম্ভবত চতুর্থ স্রোতের (মধ্যপ্রাচ্যে যা এখন চলছে) তার বেলাতেও সত্য (Bellin 2000; Diamond et.al, 1996)। এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে লক্ষ করবেন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল (মূলত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) গোটা সমাজ এমনকি রাষ্ট্রসংগঠনের ওপরও প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য এবং ভাবাধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। সে অনুযায়ী এ দেশের সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থাটির গতিময়তার একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে দলতন্ত্র (partyarchy)।[২০] এ দেশের নাগরিকত্ব (সিটিজেনশিপ) ও তার সামষ্টিক উদ্যোগের (কালেকটিভ অ্যাকশন) গতিময়তার ভেতরেও দারুণভাবে দলতন্ত্রের গভীরতর প্রভাব লক্ষণীয়। পরিবারতন্ত্র এবং এটির ভাবাদর্শগত প্রভাব এবং তার সঙ্গে যদি মেলাই দলতন্ত্রের বিষয়টিকে তাতে করে যে রাজনৈতিক ভাবাধিপত্যের উন্মেষ ঘটেছে, তা এ দেশের নাগরিক সমাজের স্বাধীনতার পরিসরকে দারুণভাবে সংকুচিত করেছে। এটা শুধু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের প্রক্রিয়াকেই বাধাগ্রস্ত করছে না (যেটা অতি আবশ্যিকভাবেই বিকল্প ভাবাধিপত্যের জন্ম ও বিকাশের জন্য জরুরি), একই সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর ও মধ্যবিত্তের এবং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রফেশনাল শ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক পরিসরের উন্মেষ ও বিকাশকে নানাভাবে আটকে রাখছে। এর ফলাফল বাংলাদেশের বর্তমান কালের 'অর্ধপরিণত' সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকার-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তি খাত, অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও প্রফেশনাল জগৎ যে ক্রমপ্রসারমাণ স্বাধীন পরিসর অবজেকটিভ অর্থে (অর্থাৎ ব্যক্তি খাত-চালিত অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের বদৌলতে) উপভোগ করছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক সাবজেকটিভ শর্তটি একই মাত্রায় বিকশিত হতে পারছে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্লায়েন্টিলিস্টিক (clientelistic) নির্ভরশীলতার জালে আটকে পড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক সাবজেকটিভ শর্তের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না (এফবিসিসিআই-এর যৌথ কর্মকাণ্ডের গতিময়তার কথা ভাবুন এবং চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবীদের দলতন্ত্রে আটকে পড়া 'অ্যাসোসিয়েশন রাজনীতির' কথা মনে করুন)। গণতন্ত্রের দুই দশকেও লক্ষ করবেন, এ পরিস্থিতির উন্নতি তো হয়নিই, বরং অবনতির সব চিহ্নই স্পষ্ট। অর্থনীতিবিদ মুশতাক খান[২১] যখন বলেন, ক্লায়েন্টিলিস্টিক বলয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্র বিকশিত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতির প্রাক-ধনতান্ত্রিক ইনফরমাল পর্যায় থেকে ধনতান্ত্রিক বা ফরমাল পর্যায়ে উত্তরণ, তখন

২০ দলতন্ত্রে নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র দুটিই কার্যত রাজনৈতিক সমাজের অধীনস্থ হয়ে পড়ে।
২১ মুশতাক খান (২০০৫)।

তিনি কাঠামোগত গণতন্ত্রের তত্ত্বের মূল বিশ্লেষণাত্মক পরিপ্রেক্ষিতটিই তুলে ধরেন। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছে, যেটাকে আমি ধাঁধা বলছি, উল্লেখযোগ্য ধনতান্ত্রিক বিকাশ সত্ত্বেও কেন তাহলে গণতন্ত্রের এই সমাজকাঠামোটি (আধুনিক অর্থনীতির ও সমাজ বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের সক্রিয় উদ্যোগ) ন্যূনতম গতিশীলতা পাচ্ছে না? এর জন্য আমার ধারণা, কাঠামোগত তত্ত্বের কিছুটা বাইরে গিয়ে, বাংলাদেশে দলতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশ, ভাবাদর্শ, ভাবাধিপত্যের উত্থান ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণের ফ্রেমে নিয়ে আসা জরুরি। লক্ষ করবেন, আমার বিশ্লেষণে বারবার যে অনুদার এলিট ভারসাম্যের কথাটি চলে এসেছে, সেটি কিন্তু একই সঙ্গে কাঠামোগত ও ভাবাদর্শগত প্রত্যয়। এটি রাজনীতি ও সমাজের গতিময়তাকে শুধু কাঠামোগতভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে না, এলিটদের প্রয়োজনীয় ভাবাদর্শের বৈধতাও প্রদান করে।

রাজনৈতিক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট ধাঁধাটির সমাধানের খোঁজ করতে আমাদের প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ও রাজনৈতিক অর্থনীতির আরও তত্ত্বের প্রয়োগ, যেগুলো আলোকপাত করবে রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ায়, রাজনৈতিক দল ও সমাজের সম্পর্কে, রাজনৈতিক শ্রেণীর সমাজে ভাবাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, রাজনৈতিক সমঝোতার উদ্ভব ও বিকাশে ও পেট্রন-ক্লায়েন্টিলিজমের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর। এ বিষয়গুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে রাজনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কের বিন্যাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এবং আমাদের অনেক সহজ প্রত্যাশার ব্যত্যয় ঘটায়। রাজনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যায় নানা তত্ত্বের জটিল প্রয়োগের ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পটভূমিতে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্রমাগত ব্যর্থতার ধাঁধাটিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Acemoglu, Daron and Robinson, James. 2006. *Economic Origins of Dictatorship and Democracy.* Cambridge: Cambridge University press.

Bellin, E. (2000), 'Contingent Democrats: Industrialists, Labor, and Democratization in Late-Developing Countries', *World Politics*, Vol. 52, No.2, January, pp. 175-205.

Dahl, Robert. 1989. *Democracy and Its Critics.* New Haven: Yale University Press.

Diamond, Larry, M. Platter, Y. Chu and H. Tien. 1997. *Consolidating the Third Wave Democracies.* Baltimore and London: John Hopkins University Press.

Fukuyama, Francis. 2011. *The Origins of Political Order*. Profile Books, London.

Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale

University Press.
Khan, Mushtaq. 2005. 'Markets, States, and Democracy: Patron-Client Networks and the Case for Democracy in Developing Countries,' *Democratization*, 12 (5).
Mahmud, Waheeduddin, Ahmed, Sadik and Mahajan, S. 2008. 'Economic Reform, Growth and Governance: The Political Economy Aspects and Bangladesh's Development Surprise', *World Bank.*
McLoughlin, Claire and Bately, Richard. 2012. 'The Politics of What works in Service Delivery: An evidence-based Review', *ESID Working Paper* 06, University of Manchester: UK.
Moore, M. 1996. 'Is Democracy Rooted in Material Prosperity?' in Luckhan, Robin and White, Gordon, (eds) *Democratization in the South*. New York: Manchester University Press.
North, Douglas, Wallis, John, and Weingast, Barry. 2009 A. *Violence and Social Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
North, Douglas, Wallis, John, and Weingast, Barry. 2009 B. 'Violence and the Rise of Open Access Orders', *Journal of Democracy*, 20 (1), January.
Olson, Mancur. 1993. 'Dictatorship, Democracy and Development', *American Political Science Review*, 87 (3).
Prezworski, Adam. 1991. *Democracy and the Market.* Cambridge University Press.
Park, Thomas and Cole, William. July 2010. 'Political Settlements: Implications for International Development Policy and Practice', *The Asia Foundation*, Occasional Paper, No 2.
Rustow, Dunkwart. 'Transition to Democracy: A Dynamic Model', *Comparative politics* 2: 337-63.
World Bank. 2008. 'Bangladesh Strategy for Sustained Growth', *Bangladesh Development Series*, Paper no 18, World Bank, Dhaka.
World Bank. 2013. World Development Report: Jobs, World Bank, Washington D.C.

প্রতি
সমাজ
চিন্তা

খনার বিজ্ঞান-দর্শন

পাভেল পার্থ

পুবে ধনু নিত্য ঝরা
পচ্চিমে ধনু নিত্য খরা॥

(খনার এ বচনে বলা হয়েছে, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পুব আকাশে রংধনু দেখা দিলে বৃষ্টি হবে এবং পশ্চিমে দেখা গেলে খরা হবে।[১])

'খনা' কি 'খনার বচন' নিয়ে বিদ্যমান আলাপ কি নথিতে আমরা বরাবর ছকবদ্ধ কিছু একরৈখিক ধরন ও সূত্র দেখতে পাই। যদিও খনা কি খনার বচন নিয়ে গুরুত্ব তৈরি করার মতো লেখালেখি আমাদের নাগাল কি হদিসে তেমন একটা নেই। মহামতি খনা তাঁর অমর সৃষ্টি 'খনার বচনের' ভেতর দিয়েই আমাদের ইতিহাসে জোরদার দৃশ্যমানতা তৈরি করেছেন। হয়তো সেই কারণেই খনাবিষয়ক আলোচনায় প্রধান হয়ে ওঠে কেবল তাঁর বচনসমূহ। বচনভিন্ন খনা বারবার আমাদের অধিপতি আলাপের ঘেরাটোপ থেকে

---

১ টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার শোলাকুড়ি ইউনিয়নের পীরগাছা বর্মণ পাড়া থেকে বাইদ জমিন দিয়ে চুনিয়া মান্দি গ্রামে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পূব আকাশে রংধনু। সঙ্গী মান্দি দার্শনিক জনিক নকরেক (১০২) তখন উপরোক্ত খনার বচনটি বলেন। রঙধনুটি দেখা যায় ৪ জুলাই ২০১০ তারিখে বিকাল ৪.২০ মিনিটে। সেদিনই সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। এভাবে ৭ জুলাই ২০১০ তারিখ পর্যন্ত থেমে থেমে বৃষ্টি হয়। জনিক নকরেকের মতে, মধুপুর গড়ে সচরাচর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পশ্চিম আকাশে রঙধনু দেখা যায় না। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও তীব্র খরাও তেমন একটা দেখা যায় না। তবে সমসাময়িককালে ইকোপার্কের বছর মানে ২০০৪ সালে আষাঢ় মাসে পশ্চিম আকাশে দুই বার পরপর রঙধনু দেখা যায় এবং খরা দেখা দেয়। বৃষ্টি কম হয়। আনারস ও কলার ফলন কমে যায়। 'মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প' স্থানীয়ভাবে 'ইকোপার্ক' নামে পরিচিতি পেয়েছে। প্রাকৃতিক বন ও বনভূমির আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে সরকার এই বাণিজ্যিক বিনোদন প্রকল্প করতে চেয়েছিল। পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে এটি স্থগিত হয়ে যায়।

বিচ্ছিন্ন কি অদৃশ্য হয়ে যান বা তাঁকে আড়াল করে রাখা হয়। এমনকি খনার বচন নিয়ে আলাপের সূত্রগুলো তাঁর বচনের 'কৃষি ও আবহাওয়ার সম্বন্ধকে' এমন কায়দায় উপস্থাপন করে বারবার, যেখান থেকে আমরা খনার বচনের বিজ্ঞান-দর্শন নয় কেবল 'কৃষি কি আবহাওয়ার উপযোগিতামূলক পরামর্শই' ঠাহর করতে পারি। সচরাচর খনার 'বিদুষী', 'জ্যোতিষী', 'কৃষি বচন রচয়িতা', 'কিংবদন্তি' ইত্যাদি পরিচয় নির্মাণেরই চল প্রতিষ্ঠিত। 'খনার বচনও' সচরাচর 'লোকসংস্কৃতির' এক প্রবল বলপ্রয়োগে বন্দী, যেখান থেকে নিম্নবর্গের রূপান্তরধর্মী জীবন কি আখ্যানের কোনো আন্দাজ পাওয়া যায় না। খনা কি খনার বচন নিয়ে যত ধরনের লেখালেখি হাতের নাগালে পাওয়া যায়, সেসব লেখালেখির ধরন ও কাঠামো প্রায় একই। প্রচলিত নথিগুলো পয়লা খনার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে (যা জন্মরহস্য বলে একধরনের দক্ষিণ এশীয় ফ্যান্টাসি তৈরি করে), পরবর্তীতে তাঁর একধরনের 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' তুলে ধরে। এসব জীবনীর একটা প্রধান অংশজুড়েই খনাকে পরিবারকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে টেনে টেনে সামাজিকীকরণ করা হয়। খনার শ্বশুর, স্বামী, রাক্ষসপুরীতে বড় হওয়া ও জ্যোতিষজ্ঞান লাভ, রাজদরবার সব মিলিয়ে খনাকে 'প্রকাশ' করা হয়। রয়েছে খনার জন্মস্থান বিতর্ক এবং বচনের ভাষিক বাহাস। তারপর খনার বচনগুলোর একটা সংকলন তুলে দেওয়া হয়। ছন্দোবদ্ধ বচনটির পর একটি বর্ণনামূলক মানে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বচনগুলো শ্রেণীকরণ করে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, কৃষিবিষয়ক বচন, তিলতত্ত্ব, হলুদবিষয়ক, কচুবিষয়ক, বৃষ্টি গণনা, কলার চাষবিষয়ক ইত্যাদি। খনার এক বচন ছাড়া প্রচলিত অধিকাংশ রচনায় খনাকে 'ইতিহাসের এক নিষ্ক্রিয় ও প্রতিরোধহীন' ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে 'খনার জিহ্বা কেটে নেওয়ার ঘটনাকে' পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন ও নারীর জ্ঞানকে প্রান্তিক করে তোলার উদাহরণ হিসেবে ব্যাখা দেওয়া হয়। কেউ কেউ খনার বচনের 'জনমত' ও গ্রহণযোগ্যতাকেও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডের খনা-ভাবনাসমূহ খনা কি খনার বচনকে 'লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ কৃষিসমাজের বিষয়' হিসেবে এক প্রশ্নহীন অপরত্বের[২]

২ এ ধরণের অধিপতি চিন্তা রাষ্ট্রের প্রবল বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে জোড়ালো করে। এটি 'আত্ম' ও 'অপরের' রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। অধিপতি ও নিম্নবর্গের বোঝাপড়ার বিষয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিই 'শহরের মানুষ আধুনিক' আর 'গাইয়া বা গ্রাম্য' হচ্ছে অনাধুনিকতা এ ধরণের বৈষম্য জিইয়ে রাখে। এ দৃষ্টিভঙ্গিই নিম্নবর্গের জগতসংসার তছনছ কি গায়েব করে আবার 'হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম-বাংলার লোকসংস্কৃতি' বলে মায়াকান্না ছড়ায়। বৈষম্যের এই মনস্তত্ব 'যাদুঘর-মার্কা' ধারণাকে বৈধ করে, বিষয়টি হচ্ছে কৃষি কি জুম কেড়ে নিয়ে শহরের মঞ্চে আদিবাসী নারীদের দিয়ে জুমনৃত্য আয়োজন করা কি বাঙালি মেয়েদের ধান কাটার গান পরিবেশন। জীবন থেকে, যাপন থেকে, প্রশ্ন কি পাটাতন থেকে সূত্র ও সম্পর্ককে আলাদা করে বারবার এসবকে 'ড্রইং রুমে' সাজিয়ে রাখার 'জিনিস' করে তোলা হয়। এ বিষয়ে বাংলায় আরো দেখুন : অরবিন্দ প্রধান সম্পাদিত ২০০২ সনে প্রকাশিত 'অপর সংখ্যা', সমাজমনস্ক পোস্টমডার্ন সাহিত্যপত্র *হাওয়া ৪৯*, হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০

মোড়কে সমাজ রূপান্তরের ধারাপাত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, নিম্নবর্গের যাপিতজীবন ও রাষ্ট্রবিকাশের আখ্যান থেকে খনা কি খনাদের সৃষ্টি ও দর্শনকে 'অস্বীকৃত' ও 'অবাঞ্ছিত' করে রাখা হয়। যাপিতজীবনের দেনদরবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে খনাদের 'ধরাছোঁয়ার বাইরের অচিন রূপকথা কি নাগালহীন কিংবদন্তি' করে তোলা হয়। ক্ষমতাবানদের রচিত ইতিহাসে কেবল খনা নয়, উলগুলান বা মুণ্ডা বিদ্রোহের কারিগর বীরসা মুণ্ডা কি হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা ফুলমণি মুর্মুদেরও এভাবেই 'অপর' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নিরন্তর বিজ্ঞানমনস্কতা কি সামাজিক বোঝাপড়া দিয়ে তখন এসব চরিত্র কি তাদের চিন্তা ও দর্শন নিম্নবর্গের নাগালের বাইরে থেকে যায়। আর সেখান থেকেই আজকের আলাপখানি[৩] শুরু করতে চাইছি। খনা ও খনার বচনের বিজ্ঞান-দর্শনকে আজকের আলাপে বোঝার চেষ্টা করব। আলাপের সূত্র ধরে খনার বৃত্তান্ত, প্রচলিত আখ্যান ও কাহিনিগুলো আমাদের টানতে হবে ক্ষমতার রাজনীতি ও ইতিহাসের বৈষম্যের ব্যাকরণকে স্পষ্ট করার জন্য। আলাপের ক্ষেত্রে একটা রাজনৈতিক তাত্ত্বিক পাটাতন অনেকখানি জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নবর্গের প্রতিরোধী জ্ঞানকাণ্ডের বিজ্ঞানমনস্কতা আলাপের অলিগলি ঘুরতে আমাদের টানটান রাখবে। প্রতিবেশ-নারীবাদী[৪] তত্ত্ব-তালাশের ভেতর দিয়ে চলতি আলাপ তার আসর জমানোর মানত করেছে। বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত খনা ও খনার বচন নিয়ে লেখালেখিগুলোর প্রায় গরিষ্ঠভাগই (যা পাওয়া গেছে এ শর্তকে মেনে) চলতি আলাপে

৩ চলতি লেখাটি খনা ও খনার বচনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বিকাশের জোর দাবি জানায়। খনার বচন ও বিজ্ঞানসূত্রসমূহের মালিকানা দেশের নিম্নবর্গের। খনার বচনের কোনো একতরফা বাণিজ্যিক ব্যবহার বুদ্ধিজাত সম্পদ কি জ্ঞানের অধিকার লংঘন হিসেবে বিবেচনা করে দৃষ্টান্তমূলক ন্যায়বিচার দাবি করে চলতি আলাপ।

৪ পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সম্পর্কিত বিদ্যমান দর্শন এবং চিন্তাকে ঘেঁটে নারীবাদীরা দেখিয়েছেন পরিবেশ সম্পর্কিত কোনো মতবাদেই পরিবেশ বিষয়টির নিশ্চিত সুরাহা হয় না। কারণ এইসব মতবাদ গড়ে ওঠেছে একটি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এবং বলপ্রয়োগকারী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এসব ধারণা অটুট রাখে, যে পুরুষ নারীর চেয়ে প্রধান, মন শরীরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সংস্কৃতি প্রকৃতির চেয়ে উচ্চ। বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোতে কর্তৃত্ব এবং বলপ্রয়োগের জায়গায় নারীবাদীরা নারী, শিশু, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং প্রকৃতিকে নিকট সম্পর্কিত এবং পারস্পরিক আহাজারির ভেতর দিয়ে ঐক্যবদ্ধ মনে করেন। পরিবেশ ডিসকোর্সে নারীবাদীদের এই চিন্তা সম্প্রতি প্রতিবেশনারীবাদ (Ecofeminism) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিবেশনারীবাদীরা সকল ধরনের কর্তৃত্ব ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। বহুপাক্ষিক সম্পর্ক এবং শ্রেণীহীন দুনিয়াতে বিশ্বাসী এই মতবাদ কোনো ধরনের কর্তৃত্ব ছাড়া মানুষকে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হওয়ার আহবান জানায়। যেখানে অন্যান্য পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কর্তৃত্ব এবং বলপ্রয়োগসমূহকে জিইয়ে রাখে। কারেন ওয়ারেন, বন্দনা শিবা, ক্যারোলিন মারচেন্ট, রুজমেরী রুথার, য়্যনেস্ত্রা কিং প্রতিবেশনারীবাদী ধারণার ভিন্নতা দিয়ে পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং জীবনযাপনের জটিল সম্পর্কের চিন্তাকাঠামোর শরীরকে অন্যান্য মতবাদের চাইতে অনেক বেশী সংগঠিত, স্পষ্ট এবং মূর্ত করে তুলেছেন।

টেনে আনা হয়েছে। খনার বচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব সংগ্রহ, রাস্তা কি মেলাতে বিক্রীত বই থেকে শুরু করে গবেষণা পুস্তক-জার্নাল-পত্রিকা-সাময়িকী এবং ওয়েবদুনিয়াতে যা পাওয়া গেছে তা-ও গুরুত্ব দিয়ে আলাপের সঙ্গী হয়েছে। খনার বচন এবং খনার বিজ্ঞান-দর্শনকে জানতে-বুঝতে দেশের নানান প্রান্তে গ্রামীণ জনপদে নিম্নবর্গের বাহাস ও দেনদরবার কাজে লেগেছে। নিম্নবর্গের এই প্রজ্ঞা ও গতিই বিজ্ঞানের সত্যকে প্রকাশ করে, খনার বচন কি খনার দর্শন জীবনব্যাপী যে সত্যের সীমানা তৈরি করেছে। চলতি আলাপ থেকে আমরা অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডের ক্ষমতার বলপ্রয়োগ ও নিম্নবর্গের জ্ঞানদুনিয়ার প্রান্তিকীকরণ ও নিরন্তর টিকে থাকার লড়াইয়ের ধরনটিও বোঝার চেষ্টা করব। কারণ খনা ও খনার বচনকে দাবিয়ে রাখার মৌলিক সূত্র ও কারণ ক্ষমতার রাজনীতির ভেতরেই সীমাবদ্ধ।

আত্মপরিচয়ের রাজনীতি ও কাটা জিব

> আমি অটনাচার্যের বেটি
> গনা-বাছায় কারে বা আঁটি॥
> খনার বচন

খনার পরিচয় ঘিরে তৈরি হয়েছে এক দীর্ঘ বৈষম্যের গণিত ও উপস্থাপনের রাজনীতি। বলা হয়ে থাকে, খনার বচন বাংলার কৃষিজীবনের এক অবিস্মরণীয় ভিত। যদি তা-ই হয়, তবে এখনো কেন খনার কোনো উল্লেখযোগ্য জীবনী রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রকাশিত নয়? বিদ্যমান নথি ও দলিলে খনাকে আমরা কীভাবে দেখতে পাই এ আলাপের এ অংশে তার একটি ছোট্ট ফিরিস্তি হাজির করছি। খনার বচন বিষয়ক পুস্তকগুলোর[৫] মলাটে আমরা খনার ছবি দেখতে পাই। প্রতিটি বইয়ের মলাটে প্রচ্ছদের ধরন একই রকম। গ্রামবাংলার কৃষিজীবনের ছবি, বৃষ্টিমুখর দৃশ্য, ধানজমিন, কৃষক-কৃষাণী জমিনে কাজ করছে, কোনো গণক পুরুষ গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটছে। এসবের ভেতর একজন নারীর ছবি তুলনামূলকভাবে বড় আকার ও জায়গা জুড়ে থাকে। উপস্থাপনে বোঝা যায়, তিনি বাঙালি সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী বিবাহিত নারী। স্বাস্থ্যবতী ও হাস্যোজ্জ্বল এই নারীর চুল কালো ও দীর্ঘ। সব ছবিতেই এই নারী তাঁর ডান হাত আশীর্বাদদানের মুদ্রা নিয়ে উপস্থাপিত। রংতুলিতে

৫ শ্রী বিজয় চন্দ্র রায়ের (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) *খনার বচন*, শ্রীবাসব বিজয় দাস সম্পাদিত *বৃহৎ খনার বচন* (যদিও বইয়ের মলাটের ভেতরে বইটির নাম লেখা হয়েছে 'প্রাচীন ও বিশুদ্ধ খনার বচন') এবং পন্ডিত রামপদ ভট্টাচার্য (আচার্য) সংকলিত *খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন* এই তিনটি পুস্তকের কথা বলা হচ্ছে। মৌখিক জ্ঞানবিনিময়ের বাইরে, উল্লিখিত ধরণের পুস্তক এবং বাংলা পঞ্জিকা থেকেই এখনও গ্রামীণ সমাজে খনার বচনের চর্চা চলে। 'বাংলার প্রবাদ প্রবচন সমগ্র বা প্রবাদ প্রবচনে বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট মার্কা' কোনো শহুরে মধ্যবিত্তীয় প্রকাশনা থেকে এখনও খনার বচন চর্চার চল শুরু হয়নি।

আঁকা এই নারীই খনা। তবে সব ছবিতেই খনাকে একটি বৃত্তের ভেতর আঁকা হয়েছে। কোথাও এই বৃত্তকে পৃথিবী এবং কোথাও সৌরমণ্ডল হিসেবে দেখানো হয়েছে। খনার চারধারে শনি, মঙ্গল গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানি উপস্থাপন ও দৃশ্যমানতার রাজনীতি আছে। প্রতিটি দৃশ্যমানতাই রাজনৈতিক। খনা বিষয়ে নিম্নবর্গের চিন্তাজগতে যে রূপ তৈরি হয়েছে, তাই উপস্থাপিত হচ্ছে এসব চিত্রের ভেতর। কিংবা অন্যভাবে দেখলে খনার এই চিত্র আমাদের নিম্নবর্গের খনাবিষয়ক এক রূপকল্প। শ্রেণীবিভাজিত সমাজে নিম্নবর্গ তার প্রান্তিকতার জায়গা থেকে খনাকে গ্রহণ করেছে আপন লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে। তাই অধিপতি ধারার বিরুদ্ধে খনার এই রূপচিত্র হয়তো নিম্নবর্গের আরেক পাল্টা আওয়াজ।

জেন্ডার বিশ্বকোষ বইতে সেলিনা হোসেন (২০১২) খনা সম্পর্কে বলেন, বিদুষী নারী খনা তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়ে বাংলার কৃষিব্যবস্থায় সংযোজন করেছিলেন নতুন দিকনির্দেশনা। চাষপদ্ধতিতে তাঁর বচন প্রয়োগ করে অভিজ্ঞ হয়েছিল কৃষক এবং সাফল্য এনেছিল তাদের ফসল উৎপাদনে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, বাংলাদেশে কৃষির সূচনাপর্বে খনা তাঁর বচন রচনা করেছিলেন। খনা কৃষকদের কাছের মানুষ হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। খনার এই জ্ঞান ও জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেননি তাঁর শ্বশুর পণ্ডিত বরাহ। তাঁর ছেলে মিহির ছিলেন খনার স্বামী। খনার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা চারদিকে রটে গেলে পুরুষতন্ত্রের জিঘাংসা প্রবল হয়ে ওঠে। পণ্ডিত বরাহ তাঁর পুত্র মিহিরকে নির্দেশ দেন খনার জিব কেটে ফেলতে। মিহির বাবার আদেশ পালন করার জন্য তৈরি হন। তবে জিব কাটার আগে তিনি খনাকে কিছু বলার সুযোগ দেন। খনা চাষপদ্ধতি, মাটি, আবহাওয়া, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং গৃহস্থালির বিভিন্ন দিক ও মানবজীবনের নানা সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলেন। এরপর তাঁর স্বামী তাঁর জিব কর্তন করলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দীর্ঘ সময় ধরে খনার বচন মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এই বচনগুলো বাংলার গার্হস্থ্য-জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। এসবের ভেতর দিয়ে মানুষ অসাধারণ দিকনির্দেশনা পেয়েছে। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো গবেষক খনাকে পুরুষ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। পুরুষের উর্ধ্বে কোনো নারীর এত জ্ঞান তো মানা যায় না, এ-ই ছিল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। পুরুষতন্ত্রের হাতে নারীর প্রজ্ঞা মুছে ফেলার আরও প্রমাণ এই যে, ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে বিদুষী খনার উল্লেখ নেই।[৬] *উইকিপিডিয়া* খনাকে একজন ভারতীয় নারী কবি ও ঐতিহাসিক জ্যোতিষী হিসেবে বর্ণনা

৬ হোসেন, সেলিনা। ২০১২, 'খনা ও খনার বচন', সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত *জেন্ডার বিশ্বকোষ* থেকে এই অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ.৪২৭-৪২৮।

করেছে।[৭] কোথাও আবার খনাকে একজন 'বাঙালি নারী', বচন রচয়িতা ও জ্যোতিষী হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।[৮] যোগেশ চন্দ্র রায়ের *আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী* বইতে অত্যন্ত কৃপণতার সঙ্গে খনার উল্লেখ থাকলেও এতে বেশি কিছু নেই।[৯]

উপিন্দর সিং (২০০৮) তাঁর *আ হিস্ট্রি অব অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মেডিয়াভাল ইন্ডিয়া : ফ্রম দ্য স্টোন এজ টু দ্য ১২ সেঞ্চুরি* বইতে খনাকে বরাহমিহিরের পুত্রবধূ হিসেবে পরিচয় দিয়ে ডাক ও খনার বচনকে 'প্রাচীন বাংলার জনপ্রিয় কৃষি ভাষ্য' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১০] খনাকে নিয়ে তিতাশ চৌধুরী (২০০০) তাঁর একটি লেখায় জানান, খনাই তাঁর নামে প্রচলিত বচনের নির্মাতা। আর একসময় খনাকে কাল্পনিক চরিত্র মনে করা হতো। অবশ্য জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একবার বলেছিলেন, খনা কাল্পনিক চরিত্র না-ও হতে পারে, তাঁর একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে নিশ্চয়ই।[১১] ২০০৯ সালের ১৫ জুন ভারতীয় টিভি চ্যানেল জি-বাংলায় 'খনা' নামের একটি মেগাসিরিয়াল শুরু হয়, যেখানে খনাকে এক পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চৌধুরী (২০০০) তাঁর একটি লেখায় জানান, বরাহমিহির খনার স্বামী ছিলেন না। ছিলেন শ্বশুর। সেই শ্বশুরই তাঁর জিব কেটে দিয়েছিলেন ক্রোধে ও ঈর্ষায়। তবে খনা একটি বচনে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, 'আমি অটনাচার্যের বেটি/ গনা-বাছায় কারে বা আঁটি।' এ স্পর্ধার কারণেই সম্ভবত খনা শ্বশুর কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিলেন। এবং এর ফলেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন নির্মমভাবে।[১২] কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত *বাংলাপিডিয়ায়* খনার পিতার নাম বলা হয়েছে অনাচার্য। 'খনা : এক কিংবদন্তি নারীর দুঃখগাথা' শিরোনামে ব্লগার চয়ন 'চতুর্মাত্রিক' ব্লগে ২৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে পোস্টকৃত তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে জন্ম নেওয়া ইতিহাসের এক কিংবদন্তি খনা বা ক্ষণা। কোনো

৭ দেখুন : http://en.wikipedia.org/wiki/Khana_%28poet%29। ১৫ মার্চ ২০১৩ এখানে প্রবেশ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

৮ দেখুন : http://www.scribd.com/doc/89654073/khonar-bochon। ১৫ মার্চ ২০১৩ এখানে প্রবেশ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

৯ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধানমন্ডি, ঢাকা, পৃ. ১৫৩।

১০ Singh, Upinder. 2008, *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century*. Pearson Education India, p.581.

১১ চৌধুরী, তিতাশ। ২০০০, 'খনার বচনে বোশেখের চিত্রলতা', নিবন্ধটি লেখকের *বৈশাখ ও আমাদের ঐতিহ্যচেতনা* শীর্ষক পুস্তক সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৫-৯৯।

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

এক শুভক্ষণে তাঁর জন্ম বলে নাম দেওয়া হয় ক্ষণা। আর 'ক্ষণা' থেকেই 'খনা' নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়'।[১৩] বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্যগত কৃষির ওপর খনার বচনের প্রভাব নিয়ে লেখা এক গবেষণা নিবন্ধে সেন (২০০৮) খনাকে তৎকালীন বাংলাদেশের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারাসাতের দেওলী গ্রামের এক নারী জ্যোতিষী ও বচন রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর যাঁর জন্মকাল। খনার বচনকে তিনি বাংলার কৃষকের লোকায়ত কৃষির গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশিকা হিসেবেও উল্লেখ করেন। খনার বচনের সঙ্গে ভারতের রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে প্রচলিত ঘাঘ ও ভাদ্রির মিল রয়েছে। পাশাপাশি ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ডাকের বচনের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে।[১৪] আমরা এখন খনার 'জীবনী' হিসেবে প্রচলিত কিছু আখ্যান ও আখ্যানের ভিন্নতাগুলো দেখার চেষ্টা করব।

আখ্যান : ১

পণ্ডিত রামপদ ভট্টাচার্য তাঁর *খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন* বইতে 'খনার জীবনী'[১৫] বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> খনার জীবন-কাহিনি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ কাহিনি রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন খনার পিতা ময়দানব, আবার অনেকে বলেন খনা ছিলেন রাজকন্যা। রাক্ষসগণ সেই রাজবংশের প্রায় সকলকেই নিধন করিয়া, রাজকন্যা খনাকেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। রাক্ষসগণই মায়াবশে খনাকে লালন-পালন করে এবং তাঁহাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেয়। তদানীন্তনকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার বরাহ পণ্ডিতেরও একটি পুত্র হয়। বরাহ পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াও ভ্রমবশত পুত্রের আয়ু শতবর্ষস্থলে দশবর্ষ গণনা করেন। পুত্রের প্রতি বিশেষ মায়া সঞ্জাত হইবার পূর্বে বরাহ পণ্ডিত তৎপুত্র মিহিরকে একটি তাম্রনির্মিত পাত্রে করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। ঈশ্বরের অপার লীলা। সেই তাম্রপাত্রখানি ভাসিতে ভাসিতে সুদূর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। রাক্ষসগণ তাম্রপাত্রস্থিত সন্তানকে নিজেদের আবাসে লইয়া গিয়া খনার সহিত লালন-পালন

১৩ দেখুন htpp://choturmatrik.net/blogs। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

১৪ Sen, Dhiman. 2008, Impact of Khana's Vachan on Traditional Agriculture in Bengal, *Asian Agri-History*, Vol. 12, No. 3, P. 211.

১৫ ভট্টাচার্য, পন্ডিত রামপদ (আচার্য)। মোট ৪৭ পৃষ্ঠার বইটির কোথাও প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। *খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন*। রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩২ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০০১, সর্বস্বত্ব প্রকাশকের। মূল্য ১২ টাকা। বইটির মলাটের ছবিটি রঙিন এবং হাতে আঁকা, প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই কোথাও। বইটি ১৮ মে ২০০৪ তারিখে কলকাতার ফুটপাত থেকে সংগ্রহ করি। পৃ.২।

করিতে লাগিল এবং জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিল ও খনার সহিত বিবাহ দিল। রাক্ষসদের আশ্রয় হইতে মিহির ও খনা অনেক পথ ঘুরিয়া উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইলেন। বরাহ পণ্ডিত পুত্র ও পুত্রবধূকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ধীরে ধীরে খনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। খনা মুখে মুখে যাহা বলিত, তাহাই ধ্রুব সত্য হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত খনার খ্যাতিতে স্বামী ও শ্বশুরের যশ ম্লান হইল। খনা নিজের স্বামী ও শ্বশুরের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিবার মানসে নিজের জিহ্বা নিজেই কর্তন করিলেন। এই প্রতিভাসম্পন্না মহিলার আত্মত্যাগ তাঁহাকে আরও মহীয়সী করিল। স্বামী ও শ্বশুরের সম্মান বাঁচিল, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক তথ্য অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তবু খনা মুখে মুখে জ্যোতিষশাস্ত্রের সারমর্ম যতটুকু উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, তাহাই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আজিও খনার বচন নামে প্রসিদ্ধ।

আখ্যান : ২

দাস (১৪১৫) তাঁর *বৃহৎ খনার বচন* পুস্তকে 'বরাহমিহির ও খনার জীবনী'[১৬] শীর্ষক লেখায় বলেছেন :

মহারাজ বিক্রমাদিত্য যখন উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, তখন মালাবার প্রদেশের চুঙ্গীনামে খণ্ড গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য্য বরাহের ঔরসে শ্রীমতী ধরাদেবীর গর্ভে মিহির জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরাহ গণনা করে দেখেন, তাঁর পুত্রের আয়ু মাত্র এক বৎসর। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তি বরাহ ভুলবশত পুত্রের আয়ু মাত্র এক বৎসর জানতে পেরে প্রচণ্ডভাবে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হলেন। আবার গণনা করে দেখলেন অবিকল পূর্বের মতো অবস্থা। এবার বরাহ ভাবলেন, এরূপ অল্পায়ুযুক্ত পুত্রকে বৃথাই লালন-পালন করে মায়ামোহে বিজড়িত হয়ে কোনো লাভ নেই। তাই অনেক চিন্তার পর পুত্রের অকালমৃত্যু প্রতিহার করার জন্য সদ্যজাত শিশুকে একটি তাম্রপাত্রে করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিলেন। সেই পাত্রটি জলে ভাসতে ভাসতে এস হাজির হলো একেবারে সিংহলদ্বীপে। পূর্বে এই দেশের নাম ছিল লঙ্কা। যেখানে রাজা রাবণ অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্রবধূ সীতাকে হরণ করে রেখেছিল। আমাদের দেশের সাহসী ও শক্তিমান পুরুষ বিজয়সিংহ লঙ্কা জয়

১৬ দাস, শ্রীবাসব বিজয় (সম্পাদিত)। ১৪১৫, *বৃহৎ খনার বচন* (যদিও বইয়ের মলাটের ভেতরে বইটির নাম লেখা হয়েছে 'প্রাচীন ও বিশুদ্ধ খনার বচন'), মানসী হালদার বইটি সংশোধন করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছে সজল পুস্তকালয়, ৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬। সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। খনার বচনের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে এর আকার একটু লম্বাটে এবং ছাপা ঝকঝকে। মলাট রঙিন এবং লেমিনেট করা। তবে প্রচ্ছদশিল্পীর কোনো নাম নেই। বইটি আমি শিয়ালদহ রেলষ্টেশন থেকে ক্যানিং যাওয়ার পথে রেলষ্টেশনের ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি ২০১২ সনে। বিক্রয়কেন্দ্র-সজল পুস্তকালয়, ৯৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, মূল্য ২৫ টাকা, পৃ.২-৪।

করে তাঁর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন সিংহল। তখন সিংহলের অধিপতি ছিলেন ময়দানব। দুরন্ত রাক্ষসগণ তাঁকে নিধন করে তাঁর একমাত্র গুণবতী ও রূপবতী কন্যাকে জীবিত রেখেছিলেন। তাঁরা জানতেন, অজস্র মায়াজাল এবং জ্যোর্তিবিদ্যা। খনাকে কন্যা হিসেবে লালন-পালন করে তাঁকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। খনা ক্রমে রক্ষকুলের অনুকম্পায় জ্যোর্তিবিদ্যায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করে তাঁদের আশ্রয়ে পালিতা হয়ে বড় হতে থাকেন। তাম্রপাত্রটি যখন ভেসে ভেসে সিংহলের সমুদ্র তীরে গিয়ে হাজির হলো তখন খনা কয়েকজন রাক্ষসী রমণীর সঙ্গে সাগরজলে স্নান করতে গিয়েছিলেন। খনা ভাসমান পাত্রে একটি সুন্দর বালককে দেখে তার পরমায়ু গণনা করে দেখেন, এই বালকের আয়ু এক শ বছর। ভ্রমবশত তার পিতা বরাহ তাকে পরিত্যাগ করেছেন মাত্র। এবার ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা জ্যোতিষী খনাদেবী সেই বালককে নিজ আবাসে নিয়ে গিয়ে পালন করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে রাক্ষসদের ও খনার আশ্রয়ে থেকে তাঁদের লালন-পালনে মিহির বড় হলো। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিহিরও রাক্ষসীদের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। তারপর রাক্ষসীগণ মিহিরকে যোগ্য পাত্র স্থির করে তাঁদের সকলের একমাত্র আদরের কন্যা খনাকে বিয়ে দিলেন। এভাবে মিহির ও খনার বাল্যকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রাক্ষসদের আশ্রয়ে অতিবাহিত হলো। কয়েক দিন পরে জ্যোতিষতত্ত্ব মাধ্যমে মিহিরের নিজের পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে স্বদেশে জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য মনে উদ্বেগ দেখা দিতে থাকে। কিন্তু এই বিশাল জলধিবেষ্টিত রাক্ষসদ্বীপ থেকে কেমন করে ফিরবেন তাই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। স্বামীর বিষণ্নতাভাব দর্শন করে খনা বিচার করে বুঝতে পারলেন, তাঁর স্বামীর মন চেয়েছে স্বীয় মাতৃভূমিতে ফিরে যাবে। তাই সব বিষয় অবগত হয়ে খনা একদিন মিহিরকে ডেকে বললেন—এখন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত, আমাদের যাত্রা করার শুভ সময়। এ সময় যাত্রা করলে কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন দেখা দেবে না। অতএব আর বিলম্ব না করে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সত্বর গৃহ হতে বহির্গত হওয়া একান্ত কর্তব্য। তারপর সুযোগমতো উভয়ে কয়েকটি জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহণ করে দুজনে গৃহ হতে বহির্গত হলেন। দ্বারে এক রাক্ষস প্রহরী ছিল। সে গিয়ে সিংহলের রাক্ষসপ্রধানকে তাদের বহির্গত বিষয়ে অবগত করাল। রাক্ষসপ্রধান সব কথা শুনে বললেন, তারা মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করেছে। সুতরাং, তাদের আর কোনো বিঘ্ন ঘটতে পারে না। তিনিই ভৃত্যকে আদেশ করলেন, উভয়কে সমুদ্রের পরপারে রেখে এসো। তখন মায়াবী রাক্ষস মায়াবলে কাষ্ঠের জলযানে পরপারে অর্থাৎ ভারতের উপকূলে তাঁদের পৌঁছে দিল। এভাবে সুদূর সিংহল থেকে রাক্ষসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে ফিরে এসে তাঁরা সোজা চলে গেলেন তাঁদের পিতা বরাহের কাছে। প্রথমে বরাহ তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। কারণ, আবার তিনি গণনা করে দেখলেন, মিহিরের আয়ুষ্কাল

মাত্র এক বছর। বরাহের গণনার বিষয় লক্ষ্য করে খনা বললেন :

কিসের তিথি কিসের বার
জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন
পলকে আয়ু বারো দিন॥

বরাহ খনার জ্যোর্তিবিদ্যার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আর কালবিলম্ব না করে বরাহ পুত্র ও গুণবতী বধূমাতাকে সাদরে গৃহে স্থান দিলেন। সেই থেকে খনাদেবী শ্বশুরালয়ে স্বামীসহ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে মিহির ও স্বীয় পিতার ন্যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে জ্যোতির্বিদ্যায় ভালো যশস্বী হয়ে উঠলেন। সভায় তিনি নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্নরূপে পরিগণিত হলেন। একদা রাজা বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতরত্নদের মধ্যে এক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, আকাশে নক্ষত্র সংখ্যা কত? কোনো পণ্ডিত হিসাব করে কোনো কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তখন বরাহ ও মিহির পিতাপুত্র নানা প্রকার গণনা করে যথাযথ উত্তর না দিতে পেরে মহারাজের কাছে মাত্র এক দিনের সময় নিয়ে গৃহে প্রত্যাগত হলেন। তারপর মহাগুণবতী খনা শ্বশুর ও স্বামীর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হয়ে অনায়াসে তা গণনা করে বলে দিলেন। মিহির গিয়ে রাজার কাছে সঠিক উত্তর দিতেই রাজা খুশি ও আনন্দিত হলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সন্ধান নিয়ে গুণবতী খনার কাহিনি জানতে পেরে আরও কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে থাকেন বরাহ-মিহিরকে। খনা গৃহে থেকে সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর বলে দিতেন। ক্রমে অল্পকালের মধ্যে খনার যশ ও সৌরভ চারদিকে পরিব্যাপ্ত হলো। রাজা বিক্রমাদিত্য সমুদয় বিষয় অবগত হয়ে খনাকে তাঁর সভার জনৈক রত্ন করে রাখবেন বলেই বরাহকে আদেশ করলেন তাঁর পুত্রবধূকে রাজসভায় আনার জন্য। বরাহ ভাবলেন, বাড়ির বউমাকে রাজসভায় থাকতে দেখলে সমাজ মন্দ বলবে ও কলঙ্কে দেশ ভরে যাবে। সুতরাং, খনা সেখানে থাকলেও যাতে কথা না বলতে পারেন, সে জন্য তাঁর জিব কর্ত্তন করলে ভালো হবে। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে ছেলেকে খনার বাকশক্তি লোপ করার জন্য তাঁর জিব ছেদন করতে আদেশ দিলেন। পিতার নিদারুণ আদেশ শ্রবণ করে মিহির আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মিহির পিতার আদেশ পালন করতে ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন খনা স্বামী ও শ্বশুরের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে বললেন, আমার মৃত্যুকাল আসন্ন স্বামী। আপনি আপনার পিতার আদেশ পালন করুন। মিহির ভাবলেন, একদিকে পিতার আদেশ, অপরদিকে পত্নীর অন্তিম অনুরোধ। বেশ তা-ই হোক। ধারালো ছুরি হাতে ধরলেও মিহিরের হাত কাঁপতে থাকে কিন্তু শ্রীহরির নাম নিয়ে উভয়ের আদেশ ও আবেদন রাখতে অনায়াসে খনার জিব টেনে ছেদন করলেন। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতির নিয়মানুসারে খনার পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেল। এখানে খনার জীবন নাটকের যবনিকা পতন ঘটল। কিংবদন্তি আছে খনার জিব কেটে টুকরাটি যেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এক টিকটিকি সেই জিব খেয়ে ফেলে। বরাহ ও মিহির সেই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, তোদের সমস্ত টিকটিকির পাওনা হোক এই জিব। যখন তোরা কারও ভালো-মন্দ কথার উত্তরে টিকটিক করে শব্দ করবি, তখন তাদের সে কথা সত্যে পরিণত হবে। তাই অদ্যাবধি আমরা টিকটিকির ডাককে সত্য বলে মানি। জ্যোতিষ ভারতী খনার অশরীরী আত্মার কল্যাণ ও হরিভক্তি কামনা করে আমার লেখনী বন্ধ করলাম। জয় খনা।

আখ্যান : ৩

খনার বচনের বিশিষ্ট সংগ্রাহক ও খনার বচন পুস্তকের রচয়িতা শ্রী বিজয় চন্দ্র রায় তাঁর খনার বচন বইয়ের পূর্বাভাসে খনার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। রায় (১৯৯৮) লিখেছেন[১৭] :

খনার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। কেহ বলেন খনার পিতা ছিলেন দানব, আবার কেহ বলেন খনা রাজকন্যা ছিলেন। লঙ্কাবাসী কোনো এক রাক্ষস খনার পিতাকে সপরিবারে নিধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবলে একমাত্র খনাকে বাঁচায়ে তাহাকে প্রতিপালন করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধির তাৎপর্য দেখে রাক্ষসগণ তাহাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তৎকালে উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যও নবরত্নসভায় বরাহ পণ্ডিতের এক পুত্র সন্তান হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও ভুলবশত বরাহ পণ্ডিত পুত্রের আয়ু শতবর্ষের স্থলে মাত্র দশ বছর গণনা করেন। পুত্রকে লালন-পালন করে শোকগ্রস্ত হতে হবে, ভাবিয়া তিনি সদ্যজাত পুত্রকে একটি তাম্রপাত্রে ভরিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। সেই তাম্রপাত্র সন্তানসহ ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কার উপকূলে উপনীত হয় এবং রাক্ষসগণের হাতে পড়ে। রাক্ষসগণ খনার সহিত মিহিরকে লালন-পালন করেন এবং খনার সহিত বিবাহ দেন। রাক্ষসদের আশ্রয়ে থাকিতে ভালো না লাগায় সুযোগ বুঝে মিহির ও খনা পলায়ন করেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হন। বরাহ পণ্ডিত পুত্রবধূ ও পুত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত। তাহাদের সুখ্যাতি ক্রমাগত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। খনা মুখে যাহা বলিত উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইত। পুত্রবধূ খনার সুখ্যাতিতে শ্বশুর ও স্বামীর মন ম্লান হইয়া যায়। প্রবাদ আছে, স্বামী ও শ্বশুরের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য খনা স্বয়ং নিজের জিহ্বা নিজেই কর্তন করিয়াছিলেন।

১৭ রায়, শ্রী বিজয় চন্দ্র (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)। ১৯৯৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), *খনার বচন*, ২/২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০ থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন বিজয় রায়। গ্রন্থস্বত্ত্ব প্রকাশক। বর্ণবিন্যাস-ফাইন টাইপ কম্পিউটারস এন্ড প্রিন্টার্স, শাঁখারী বাজার, ঢাকা। মূদ্রণ-ডি.সি. রায়, অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২/২ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০। প্রাপ্তিস্থান-নিউ এজ পালিকেসন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা-১১০০, পৃ.৩।

আখ্যান : ৪

অভিষেক ও অমৃতা ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে *Khannar Vachan-1 : Varamihir's daughter-in-law* শিরোনামে ধারা বর্ণনাসহ প্রায় সত্তরটি খনার বচনের একটি বিবরণী তৈরি করেছেন। যেখানে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, পৌরাণিক জ্যোতিষী বরাহমিহির তাঁর পুত্র পৃথুয়াসকে বাঁচাতে পাত্রে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। সমুদের জল থেকে ছোট্ট পৃথুকে রক্ষা করেন লঙ্কার রাজা এবং তাকে বড় করেন। লঙ্কা রাজ্যেই সেই পুত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। একদিন একটি গাভির বাচ্চা হওয়ার আগে তিনি বলেন, বাচ্চার রং হবে সাদা। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর দেখা যায় বাচ্চাটির রং গোলাপি। পৃথুয়াস তখন ক্ষোভ ও অপমানে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের সব বই সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেন। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, বাছুরটির রং সাদা হয়েছে এবং পৃথুয়াস তাঁর পূর্বানুমানের সঠিকতা খুঁজে পেয়ে আবার সমুদ্রের কাছে যান। কিন্তু আর তিনি তাঁর বইগুলো ফেরত পাননি। এদিকে পৃথুয়াসের স্ত্রীও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। পৃথুয়াস উজ্জয়িনীতে তাঁদের রাজ্যে ফিরে আসেন। বরাহমিহির তাঁর পুত্রবধূর এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ও জ্ঞান মেনে নিতে পারেননি। সিদ্ধান্ত হয় পুত্রবধূর জিব কেটে ফেলার। জিব কাটার আগে পৃথুকে তাঁর স্ত্রী নিজের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা শিখিয়ে যান। এই পাঠ্যের নামই খনার বচন। জিব কেটে ফেলার পরই পৃথুয়াসের স্ত্রী খনা নামে পরিচিতি পান।[১৮]

আখ্যান : ৫

বাংলাদেশের ঢাকাভিত্তিক নাট্যদল 'বটতলা' খনা নামের একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। নাটকটি লিখেছেন সামিনা লুৎফা নিত্রা এবং নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ আলী হায়দার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২০১৩ সালের ২০ মার্চ নাটকটির ৩০ তম মঞ্চায়ন হয়। নাটকটিতে খনাকে জ্ঞান ও সত্যের এক অসাধারণ নারী সাধক ও সমকালীন বিদুষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যাঁর আরেক নাম লীলাবতী। খনা নাটকের কাহিনি অনুযায়ী, খনার স্বামী মিহির ও শ্বশুর বরাহমিহির। ভারতের চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতু গড়ের খনাকে নিয়েই কাহিনি এগিয়েছে। ইছামতী আর ভাগীরথী নদীবিধৌত প্রাচীনভূমি গঙ্গারিদ্ধি আর বালহন্ডার দেউলনগরের রাজা ধর্মকেতুর রাজজ্যোতিষী বরাহমিহির। একদিন নিজ সন্তান মিহিরের কোষ্ঠী গণনা করে তাকে তামার পাত্রে ভরে ভাসিয়ে দেন

১৮ দেখুন :http://issuu.com/saptarishisastrologyvol7/docs/48-khannarvachan-1/1?mode=a_p। ১৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে এটি নেয়া হয়েছে। এই সাইটে ইংরেজীতে বরাহমিহিরের পুত্রের নাম Prithuyasas লেখা হয়েছে।

বিদ্যাধরীর জলে। পঁচিশ বছর পর লঙ্কাদ্বীপের রাজকন্যা খনা মিহিরকে নিয়ে বরাহমিহিরের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর গণনার ভুল প্রমাণ করেন। এরপর ধর্মকেতুর সভায় খনা ও মিহির রাজসভাপদ লাভ করেন। একসময় খনা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে বরাহমিহিরের রোষানলে পড়েন। ক্রুদ্ধ বরাহমিহির ছেলেকে আদেশ দেন খনার জিব কেটে তাঁকে উৎসর্গ করতে। এভাবেই নাটকের কাহিনি এগিয়ে যায়।[১৯]

আখ্যান : ৬

পান্ডের (১৯৯০) বইতে 'খনার জীবনী' শিরোনামে যে কাহিনিটি আছে তা অন্য রকম। সেখানে বলা হয়েছে খনা সিংহলরাজ তনয়া। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের একটি রত্ন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহ। পুত্র মিহিরের জন্মপঞ্জিকা গণনা করে তিনি দেখেন, পুত্রের আয়ু মাত্র এক বছর। তারপর পুত্র মিহিরকে তিনি একটি পাত্রে ভরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেন। মিহিরকে উদ্ধার করে বড় করেন সিংহলরাজ। তাঁরা উভয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করেন। গণনায় স্বীয় পরিচয় জেনে মিহির খনাসমেত জন্মভূমি দর্শনের জন্য উজ্জয়িনীতে আসেন। আসন্নপ্রসবা একটি গাভিকে দেখে খনা মিহিরকে কি রঙের বাছুর প্রসব হবে জিজ্ঞেস করেন। মিহির বলেন সাদা। কিন্তু বাছুরটির রং হয় কালো। মিহির তাঁর সঙ্গে আনা জ্যোতিষগ্রন্থ দুটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। জন্মের পর বাছুরটির শরীর যখন গাভিটি চেটে দিল, দেখা গেল আসলেই বাছুরটির রং সাদা। মিহির আবার সমুদ্রে গিয়ে তাঁর জ্যোতিষগ্রন্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হন। মিহির পিতার কাছে তাঁর পরিচয় দিলে বরাহ প্রথমে বিশ্বাস করেননি, কারণ গণনায় পুত্রের আয়ু মাত্র এক বছর ছিল। তখন খনা বলে, কিসের তিথি কিসের বার/ জন্ম নক্ষত্র কর আর/ কি কর শ্বশুর মতিহীন/ পলকে জীবন বার দিন। পুত্রবধূর যুক্তিতে বরাহর ভুল ভাঙে। মিহিরের স্থান হয় বিক্রমাদিত্যের সভায়। একদিন তাঁকে আকাশের তারা গুনতে বলা হয়। মিহির একদিন সময় চান। খনা আকাশে তারার সংখ্যা গণনা করে বলে দেন। রাজসভায় খনার ডাক পড়ে। প্রতিষ্ঠা ও সম্মানহানির আশঙ্কায় পিতার আদেশে মিহির খনার জিব ছেদন করেন ও খনার মৃত্যু হয়। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন হলেন ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি। 'বরাহমিহির' শব্দটি একবচনান্ত। কাজেই বরাহমিহির বলতে বরাহ এবং মিহিরকে বোঝায় না। তা ছাড়া প্রচলিত খনার বচনের ভাষা লক্ষ্য করলে

১৯ এই অংশটুকু লিখতে হাসনাত শাহীনের 'কিংবদন্তির খনা' লেখাটির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় ২৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে এটি প্রকাশিত হয়। পৃ.২৭।

এমন একটা ধারণা জন্মায় যে ওই ভাষা আনুমানিক দুই শ বছর আগের গ্রামবাংলার ভাষা।[২০]

আখ্যান : ৭

নওয়াজ (১৯৮৯) তাঁর *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি* পুস্তকে খনাসম্পর্কিত উড়িয়া ভাষার নিম্নোক্ত[২১] প্রচলিত কিংবদন্তি উল্লেখ করেছেন :

> রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত বরাহ স্বীয় নবজাত সন্তানের অকালমৃত্যুর কথা ভুল গণনাবশত জেনে নবজাতককে একটি বাক্সে স্রোতে ভাসিয়ে দেন। এভাবে মৃত্যু থেকে নবজাতক পরিত্রাণ পেতে পারে—এমন একটি ধারণা পণ্ডিতের মনে ছিল। সে সময় অন্য একটি রাজ্যের অনিন্দ্যসুন্দর শিশু রাজকন্যা দ্বীপবাসী তথাকথিত বিদ্রোহী রাক্ষসদের আক্রমণে স্ববংশে পিতৃমাতৃহীনা হয়ে রাক্ষসদের কবলিত হন এবং তাদেরই আশ্রয়ে লালিত-পালিত হতে থাকেন। সেই অভাগী রাজকুমারীর নাম লীলাবতী। ওই দ্বীপবাসী বাক্সটিকে উদ্ধার করে নবজাতককে বড় করেন। লীলাবতী ও নবজাতক স্বর্গমর্ত্যপাতালবিদ্যায় পারদর্শী জ্যোতিষীর কাছে জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ত করতে থাকেন। লীলাবতী নামগোত্রহীন শিশুটির নাম রেখেছিলেন মিহির। অবশেষে বয়োপ্রাপ্ত সুন্দর শিশুদ্বয় জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে গোপনে পরস্পরের পাণিগ্রহণ করেন। লীলাবতী ও মিহির দ্বীপ থেকে পলায়ন করেন এবং গণনায় জানতে পারেন, মিহির উজ্জয়িনী রাজসভার অন্যতম পণ্ডিত বরাহমিহিরের পুত্র। তাঁরা বরাহমিহিরকে তাঁদের পরিচয় দেন এবং বরাহমিহির তাঁদের গ্রহণ করেন। ক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রে লীলাবতীর অগাধ জ্ঞানের কথা রটে যায়। রাজসভায় তিনি আমন্ত্রিত হন। লীলাবতীর জ্ঞান-গরিমা সভা পণ্ডিতদের ঈর্ষার বিষয় হয়ে পড়ে। বিশেষত বরাহমিহির তাঁর একাধিপত্য হারাতে থাকেন। বরাহমিহির একদিন পুত্র মিহিরকে পুত্রবধূর জিব কেটে খনা মানে বোবা বানিয়ে দিতে বলেন। নিরুপায় স্বামী লীলাবতীর জিব কর্তন করতে উদ্যত হন। জিব কর্তনের আগে মিহির লীলাবতীকে কিছু কথা বলার সুযোগ দিলেন। লীলাবতী তখন কৃষি, আবহ-তত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং মানবজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহুবিধ কথা বলে যান। পরবর্তীকালে সেসব কথা বোবার বচন বা খনার বচন নামে অভিহিত হয়।

আখ্যান : ৮

নওয়াজ (১৯৮৯) তাঁর *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি* পুস্তকে খনাসম্পর্কিত নিম্নোক্ত বাংলা কিংবদন্তিটি উল্লেখ করেছেন :

> খনা লঙ্কা দ্বীপের রাজকুমারী ছিলেন। শুভক্ষণে জন্ম বলে তাঁর নাম রাখা হয় খনা। লঙ্কা দ্বীপবাসী তথাকথিত রাক্ষসগণ তাঁর পিতা-মাতাকে হত্যা করে এবং শিশু খনাকে হস্তগত করে। একই সময়ে উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার প্রখ্যাত জ্যোতিষ পণ্ডিত বরাহমিহিরের পরিত্যক্ত পুত্র মিহিরকে একটি ভাসমান তাম্রপাত্র থেকে উদ্ধার করেন। রাক্ষসেরা উভয় শিশুকেই লালন-পালন করে। মতান্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ খনাই মিহিরকে লালন পালন করেন। খনা ও মিহির জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী হন এবং যৌবনে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। খনা খগোল শাস্ত্রেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। একদিন গণনামতে জেনে তাঁরা রাক্ষসপুরী থেকে এক শুভক্ষণে উজ্জয়িনীতে চলে আসেন। জানতে পারেন, বরাহমিহিরই মিহিরের পিতা। তাঁরা আত্মপরিচয় দান করেন। বরাহমিহির এটি মেনে নিতে পারেন না। তখন খনা বচন দেন, কিসের তিথি কিসের বার/ জন্ম নক্ষত্র কর সার/ কি করো শ্বশুর মতিহীন/ পলকে জীবন বারো দিন। খনা বরাহমিহিরের গণনা ভুল প্রমাণ করেন। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বহু দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য খনাকে রাজসভার দশম পণ্ডিত হিসেবে আসন দান করেন। এতে অপমানিত ও ঈর্ষান্বিত পণ্ডিত বরাহমিহির পুত্রকে খনার জিব কর্তন করার আদেশ দেন। মিহির খনাকে এই আদেশের কথা বললে খনা সানন্দে এই শাস্তি মেনে নেন। পিতৃ আদেশে মিহির এক তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা খনাদেবীর জিব কর্তন করেন। মাত্রাধিক রক্তক্ষরণে অসামান্য বিদুষী খনার জীবন সাঙ্গ হয়। মতান্বরে শ্বশুর বরাহের অভিযোগে স্বামী মিহির খনাকে ভর্ৎসনা করেন। যে জিব বচন প্রচার করে খনার এ দুর্গতি, সে জিবকে খনা রন্ধনশালার ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেন। ফলে মৃত্যু ঘটে। খনার কর্তিত জিব ভক্ষণ করে টিকটিকি গুপ্তজ্ঞান লাভ করেছিল।

খনার জীবনী নিয়ে ওপরের আটটি আখ্যান আমাদের জানান দেয়, উপস্থাপনের রাজনীতি ও ক্ষমতার গণিত কীভাবে নিম্নবর্গের আত্মপরিচয়কে আড়াল করে প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়। খনার 'কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি না' এ নিয়েও দুর্ভাবনার শেষ নেই। মুক্তমনা ব্লগে 'জনভাষ্যে মিশে থাকা আমাদের লোকভাষ্যকার' শিরোনামে রণদীপম বসুর খনাসম্পর্কিত একটি লেখা পাওয়া যায়। ওই ব্লগে লেখাটি ২৪ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে পোস্ট করা। লেখাটিতে রণদীপম উল্লেখ করেছেন, খনা নামে কেউ থাক বা না থাক, খনা নাম বা শব্দটি যে আজ কিংবদন্তি এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না।[২২] খনা যদি সিংহলের রাজকুমারী হয়ে থাকেন এবং উজ্জয়িনীতে এসে বসতিস্থাপন করেন,

২০ পান্ডে, তুষার কান্তি (সম্পাদনা)। ১৯৯০, *চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবীরের দোহা ও মীরার পদাবলী*, গ্রন্থনা, কলিকাতা-৯, পৃ. ১-৬৪।

২১ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধানমন্ডি, ঢাকা, পৃ. ৪৮-৫০।

২২ দেখুন http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=4725। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

তবে বাংলা এবং উড়িষ্যায় খনার বচনের এত প্রাদুর্ভাব কেন এ প্রশ্নটি খনা ও কৃষি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অধ্যাপক আলী নওয়াজও করেছেন। পাশাপাশি নওয়াজ (১৯৮৯) উল্লেখ করেছেন, মহাবংশ নামক সিংহলি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জনৈক বাঙালি রাজপুত্র সিংহলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন।[২৩] একটি প্রাচীন সিংহলি পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়, লীলাধিপতি অর্থাৎ রাঢ়াধিপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ পিতৃপরিত্যক্ত হয়ে তৎকালীন বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়ে ক্রমে দারুণ প্রতিপত্তিশালী হয়ে সিংহলের অধিপতি হয়ে বসেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সিংহলে বহু শতাব্দী রাজত্ব করে। অতঃপর গণ-অভ্যুত্থানে এ রাজবংশের অবসান ঘটে। হতে পারে খনা সে বংশেরই দুর্ভাগা রাজকুমারী ছিলেন। এবং সে কারণেই তৎকালীন বাংলাদেশের ভাষা ছিল তার মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার সঙ্গে সিংহলি ভাষার মিলও দেখা যায়। সিংহলে বাঙালি রাজবংশটি কতকাল রাজত্ব করেছিল, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[২৪]

'উত্তর-পশ্চিম ভারতের চেয়ে পূর্ব ভারতের সঙ্গেই মগধের ভাষাগত রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক বেশি। ফলে খনা তাঁর বচন পাটলিপুত্রে অথবা বাংলাদেশেই লিখুন ভাষা অভিন্নই হবে। মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই প্রাচীন বাংলা। মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপই ছিল রাঢ়-বরেন্দ্র-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা'।[২৫] এ প্রসঙ্গে নওয়াজ (১৯৮৯) জানান, উজ্জয়িনীতেও খনার পক্ষে তৎকালীন বাংলায় বচন রচনা সম্ভবপর। কালিদাসের তালিকানুসারে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সদস্য প্রায় অর্ধশত ছিল। গুপ্তরা ও কালিদাস বাঙালি হলে উজ্জয়িনীর জ্ঞান চর্চায় বাঙালি প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশ ও উজ্জয়িনীকে জড়িয়ে শুধু খনা-মিহিরের কিংবদন্তি নয়, চণ্ডীকাহিনিও সৃষ্টি। চণ্ডীকাহিনির আদিভূমি বাংলাদেশ অথচ গুরুগোবিন্দের চণ্ডীগীতি অনুসারে চণ্ডী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা।[২৬] খনার বচনে বরাহের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি বচন রয়েছে, আবার রাবণের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি বচনও আছে। এ কারণেই হয়তো লঙ্কাকেও খনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাবণের ভণিতাযুক্ত বচনগুলো বহু খনার বচনের মতোই বিলুপ্ত।[২৭]

২৩ এই অংশটুকু অধ্যাপক আলী নওয়াজ ১৩৪৭ বাংলায় পুনমূদ্রিত বঙ্গদর্শনের 'বংগে ব্রাহ্মণাধিকার' অংশ থেকে উল্লেখ করেছেন।

২৪ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। পৃ. ৫২।

২৫ এটি নীহার রঞ্জন রায়ের *বাংগালীর ইতিহাস আদি পর্ব* থেকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকাশকাল ১৩৫৬।

২৬ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। পৃ. ৬১।

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

১৯৫৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত *কৃষিকথা* নামের একটি পত্রিকায় ডা. আবদুল গফুর সিদ্দিকী 'খনার বচন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সে লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার বারাসাত মহকুমার দেগঙ্গা থানায় দেউলা নগর অবস্থিত ছিল। রাজা ধূমকেতুর প্রপৌত্র রাজা চন্দ্রকেতুর রাজত্বকালে রাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। অতঃপর স্থানীয় লোকেরা স্থানটিকে দেউলে বলে অভিহিত করে। বিধ্বস্ত রাজবাড়ীর অনতিদূরে একখণ্ড জমি বরাহমিহিরের বাস্তু নামে পরিচিতি লাভ করে লোকের মুখে মুখে চলতে থাকে।[২৮] ১৯৫৭ সালে *কৃষিকথা* পত্রিকায় 'বিদুষী খনা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন মেরাজ উদ্দিন আহমদ। সেখানে তিনি জানান, দেউলেনগরের আদি নাম ছিল কেতুগ্রাম। দেউলেনগরের রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ আজও পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় লোকদের মাঝে খনার বচন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আগে নাকি এ অঞ্চলে খনার বচনের পুঁথি পাওয়া যেত। আজ বিলুপ্ত। তবে লোকেরা উপজাতীয় জ্যোতিষীদের পুঁথিপত্র থেকে প্রচুর খনার বচন উদ্ধার করেছিল। আজকাল সেসব উপজাতীয় পুঁথিপত্রও নাই।[২৯]

গুপ্তযুগে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশে অধুনাবিলুপ্ত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তদ্রূপ খনার বচনও হতে পারে। এ সময় বাঙালির প্রতিভা ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। খনার বচন যে মূলত অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল, তা এর আগেই বলা হয়েছে। তা চর্যাপদেরও আগে হতে পারে। প্রতিটি ভাষাতেই সাহিত্য শুরু হয়েছে প্রবাদ ও ছড়া দিয়ে।[৩০] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত *অসমিয়া সাহিত্যের চানেকী* শীর্ষক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অংশে বলা হয়েছে,

ডাক ষষ্ঠ শতকে রচিত। অনেক পণ্ডিত ডাক ও খনার বচন সমসাময়িক বলে থাকেন।[৩১] ১৪ শতক ও ১৫ শতকের দুজন বাঙালি জ্যোতির্বিদের গ্রন্থে খনার বচনের কিছু উদ্ধৃতি আছে, যাতে মনে হয় খনা ১৪ শতকের আগের। খনার বচনে বৈষ্ণব মতবাদের কি ভক্তিবাদের কোনো ছাপ নেই। তাই বলা যায়, এগুলো বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনেরও আগের। সেন আমলের জ্যোতিষশাস্ত্র ধর্মনির্ভর ছিল। কিন্তু খনার বচনে কোনো দেবদেবী, পূজা অর্চনা, অধ্যাত্মবাদের কোনো উল্লেখ নেই, বরং ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। খনা সপ্তম শতকের আগের অনুমান করা যেতে পারে।

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

নিশ্চুপ বচন ও নিরুদ্দেশ পুঁথি

বলে গেছে বরাহের পো।
দশটি মাস বেগুন রো
চৈত্র-বৈশাখ দিবে বাদ
ইথে নাই কোনো বিবাদ
পোকা ধরলে দিবে ছাই।
এর চেয়ে ভালো উপায় নাই
মাটি শুকালে দিবে জল
সকল মাসেই পাবে ফল॥

পৌষে গরমি বৈশাখে ঝাড়া
পয়লা আষাঢ়ে ভরবে গাড়া
খনা বলে শোন হে স্বামী
শাওন ভাদ্রে নাইকো পানি॥[৩২]

ডাক দিয়ে বলে রাবণ
না রুবে কলা আষাঢ় শ্রাবণ॥

'খনার বচন' হিসেবে পরিচিত ওপরের তিনটি বচন খেয়াল করলে দেখা যায়, বচনের ভাষ্য অনুযায়ী একটি বচন খনার, একটি বরাহের পুত্র সম্ভবত মিহিরের এবং আরেকটি রাবণের। হয়তো খনার জন্মের আগে-পরের এ রকম অসংখ্য গ্রামীণ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও নিরীক্ষণ 'খনার বচন' হিসেবেই একটি সমষ্টিগত জ্ঞানপ্রবাহ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। হয়তো খনার অনেক বচন যেমন অনেকের নামে মিশে গেছে, আবার অনেকের অনেক সূত্র ও বচনও হয়তো খনার বচন নামে বিনির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের বইপুস্তকের দোকানে সচরাচর 'খনার বচন'বিষয়ক কোনো বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনকি গ্রন্থাগারগুলোতেও নয়। খনার বচন সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে এমনই নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যদিও খনার বচনের জীবন্ত দলিল গ্রামজীবনের প্রবীণেরা। খনার বচন সংগ্রহের বিঘ্ন ও প্রতিকূলতা আলোচনা করতে গিয়ে নওয়াজ (১৯৮৯) জানান :

> বর্তমান সামাজিক টানাপোড়েন, উত্থানপতন, ভাঙা-গড়া, অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও বিবর্তনের যুগে পুরোনো নীতিমালা ও মূল্যবোধকে মানুষ আর ছন্দোবদ্ধ কথায় স্মরণ রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। সে প্রয়াস ও মননশীলতা মানুষের আর নেই। এককালে ছড়া, শ্লোক ইত্যাদি যারা আওড়াতে পারত তাদের একটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ক্রমে শ্লোক-ছড়া ইত্যাদির প্রচলন লুপ্ত হতে হতে গৃহিণীদের মাঝেই সীমিত হয়ে পড়েছিল। সে বৈশিষ্ট্যও আজ আর নেই। গ্রামবাংলা আজ প্রায় বিরান। শহরের সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য দেউলিয়া গ্রামগুলোকে প্রভাবিত করছে।[৩৩]

বিস্তৃত বাংলা অঞ্চলে গ্রামীণ ছড়া, গাথা, ধাঁধা, শ্লোক, পই, ডাক, ডিঠান, হীলুক, পুঁথি, রে-রে, আজিয়া, গীত, রয়্যানি, উভোগীত, পালা, বান্ধা, কিসসা, কাহিনি, ঝাড়া, মন্ত্র বা প্রবাদের মতো নানান রূপ ও ধাপে অস্তিত্বশীল হয়েছে নিম্নবর্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন। চ্যাটার্জি (২০০৭) এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় অঞ্চলে মৌখিক এবং লিখিত সাহিত্যধারা একসঙ্গেই বহুকাল ধরেই অস্তিত্বশীল।[৩৪] মধ্যযুগের পাঁচালি নাট্যের কৃষির প্রসঙ্গ আমরা দেখতে পাই রিপনের (২০১০) বিদ্যায়তনিক গবেষণা অভিসন্দর্ভে।[৩৫] এসব নির্মাণের সাথে পুস্তকী ধর্মের তেমন কোনো সংঘর্ষ বা নির্মাণ নেই। এসব নির্মাণশৈলীর একটি বস্তুবাদী চরিত্র আছে। অনেক সময় কিছু পুস্তকী বক্তাকে বলতে শোনা যায়, গ্রামীণ জ্ঞানরীতির আখ্যান ও বিস্তারসমূহ 'ইসলাম ধর্মের পুস্তকি কায়দার সাথে যায় না'। কিন্তু মুসলমান সমাজের প্রচলিত অনেক প্রবাদ-প্রবচনেও কাককে নিয়ে শুভাশুভ নানা সংস্কার বিদ্যমান রয়েছে।[৩৬] সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে ফসল রক্ষার লোকাচারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হিরালি আচার, যা সমানভাবে মুসলিম কি হিন্দু, বাঙালি কি হাজং সব পরিবারেই পালনীয় কৃত্য। এ ক্ষেত্রে ফসল রক্ষাকল্পে কৃষক পেশাদার লোকতন্ত্রবিদকে দিয়ে লৌকিককার্য করে থাকে। চৈত্র মাস বা তার কিছু আগে কৃষকসমাজ মিলে লৌকিকবাদে বিশ্বাসী তন্ত্রগুরুকে নিমন্ত্রণ করে। হিরালি প্রথা প্রাচীনকাল থেকে ফসল রক্ষার হাতিয়ার। হিরালেরা ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে গৃহস্থের আঙিনায় তাঁর পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যানুসারে এমনিতেই চলে আসেন। হিরালি নিয়ে অনেক ছড়াও কৃষকসমাজে প্রচলিত রয়েছে। ভাটিবাংলার সুরমার পাড়ে/ হিরালির ঘর/ গাঁও গেরামে খুঁজে তারে কৃষকের অন্তর/ চৈত্র মাসে ঝড় তুফানে/ শিলাবৃষ্টির ডরে/ কৃষক সমাজ দৌড়ে যায়/ হিরাল বেটার ধারে।[৩৭] সংক্ষেপে এই আলাপটি করে নিচ্ছি এজন্য যে এতে করে খনার বচনের রূপ ও নির্মাণশৈলীর ঐতিহাসিকতাটি

৩২ চৌধুরী, তিতাশ। ২০০০, *খনার বচনে বোশেখের চিত্রলতা*, পৃ. ৯৫-৯৬।

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৩৪ Chatterji, Roma. 2007, 'Orality, Inscription and the Creation of a New Lore', *Cultural Analysis* 6 (2007): 71-90, The University of California.

৩৫ রিপন, জাহারাবী। ২০১০, *মধ্যযুগের পাঁচালি নাট্যে বাংলার কৃষি-প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩৬ জলিল, মুহম্মদ আবদুল। ১৯৯৫, 'বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি ও ফোকলোর', এই নিবন্ধটি লেখকের *লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*বই থেকে নেয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪১।

৩৭ সুবাস উদ্দিন, মুহম্মদ। ২০০৭, *সুনামগঞ্জের লোকসংস্কৃতি : কৃষি ও কৃষক সমাজ*, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ২১। (বিমল চন্দ্র পাল, কৃষক, লালারচর, সুনামগঞ্জ থেকে নেয়া তথ্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে)।

বুঝতে সুবিধা হবে। এটি হুট করে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো কোনো ঘটনা নয়। বা এমনও নয়, ১৪০০ বছর আগে এর শুরু হয়েছিল আর এখন এর কোনো চল নেই। খনার বচন নিরন্তর চারপাশের পরিবর্তনশীলতার তত্ত্ব-তালাশের ভেতর দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের কারিগরিকে আগলে প্রতিনিয়ত বৈজ্ঞানিক শরীর ও মন নিয়ে বিরাজিত। কিন্তু অধিপতি ব্যবস্থায় আমরা কখনোই খনার এ বিজ্ঞানধারাকে বিকাশের জন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা কি নাগরিক নজর অবারিত করিনি।

নওয়াজ (১৯৮৯) তাঁর লেখায় মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামের এমন একটি তালপাতায় লিখিত খনার বচনের খোঁজ দিয়েছেন। পারিলের আচার্য গোপী ঠাকুরের বাড়িতে তালপাতার এ খনার পুঁথি ছিল। ঝড়বৃষ্টি তাড়াতে গোপী ঠাকুর এ পুঁথি নিয়ে জোরে জোরে পড়তেন।[৩৮] তিনি আরও জানান, ময়মনসিংহের কোনো ঐতিহ্যশীল পরিবারের উচ্চশিক্ষিত কোনো ভদ্রলোক তাঁকে বলেছেন, তাঁদের বাড়িতে ৪০ বছর আগে পুঁথির আকারে ৪০০ থেকে ৫০০ পৃষ্ঠার খনার বচনের সংকলন ছিল। করিমগঞ্জ থানার জংগলবাড়ী গ্রামের ছন্দু মিয়া তবলা বাজিয়ে খনার গানের আসর করতেন।[৩৯] উড়িয়া খনার বচন সংকলের প্রচ্ছদপটে একটি কল্পিত ছবি দেখা যায়- শিক্ষক টোলের ছাত্রদের খনার বচন পাঠ দিচ্ছেন। এ থেকে নওয়াজ (১৯৮৯) ধারণা করেন, হয়তোবা প্রাচীনকালে এভাবে খনার বচন জ্ঞানের বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হতো। তালপাতায় লিখিত খনার বচনের কাঠবাধা পুঁথি সেদিও পর্যন্ত দেখা গেছে, এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, তৎকালীন গ্রাম্য জমিদারেরা তবলা সংগত করে গীত খনার বচন আসরে গায়কের কণ্ঠে শ্রবণ করতেন। জ্যোতিষ, আবহ, কৃষি ও হোরা শাস্ত্র হিসেবে শিক্ষাদান ও সুরেলা ছন্দের জন্যে খনার বচন সম্ভবত সমাজদেহের রক্তমাংসে মিশে গিয়েছিল।[৪০]

ডা. আবদুল গফুর সিদ্দিকী খনা সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং অনেক তথ্য ও বারো শ খনার বচন সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর কলকাতার (২০ মহেন্দ্র রায় লেন) বাসা ভস্মীভূত হলে তাঁর পাণ্ডুলিপিসমূহও বিনষ্ট হয়। ডা. সিদ্দিকীর মতে, খনা পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর বিবাহ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের দেউলা নগরে। ডা. সিদ্দিকীর মতে :

> প্রাচীন দেউলা নগরের স্বাধীন নৃপতি ধূমকেতু রায়ের সভাপণ্ডিত বরাহ ও মিহির যথাক্রমে খনার শ্বশুর ও স্বামী। কিন্তু খনার অগাধ জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পেয়ে রাজা খনাকেই প্রধান সভাপণ্ডিত হিসেবে নিয়োজিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অপমানিত ও ঈর্ষান্বিত পিতাপুত্র খনাকে জিব কেটে হত্যা করেন। তৎপূর্বেই খনা দেড় লাখ কৃষি ও জ্যোতিষসংক্রান্ত বচন লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাঁর কোনো পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্ত প্রাপ্তব্য নয়। শংকরাচার্যের আজ্ঞানুসারে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ ধ্বংস হয়েছিল বলে জানা যায়। একই কারণে খনার রচনাও ধ্বংস হতে পারে।[৪১]

নওয়াজ (১৯৮৯) তাঁর *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি* বইতে লিখেছেন, খনা তাঁর কালজয়ী বচনে কৃষিতত্ত্বজ্ঞান সমাজের সম্মুখে বেদবাণীর মতোই উপস্থাপিত করেছেন। এককালে তা অশোক অনুশাসনের মতো কিংবা চাণক্য-শ্লোকের মতো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল কি না কে জানে। নচেৎ ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্বার্ধে একটি মহিলার কথা জনসাধারণের নিকট এত ব্যাপক ও সুশৃঙ্খলভাবে জানা হলো কীভাবে? উল্লেখ্য, ডাক ও খনার বচন এককালে গীত হতো এবং জনসমাগমস্থলে খোদাই করে রাখা হতো।[৪২] খনার বচনের মতো অসমিয়া ভাষায় 'ডাক পুরুষের ভণিতাও' পাওয়া যায়, 'ডাকের বচন বেদর বাণী, পোলগা তিরী ঘরলৈ নানী'। অর্থাৎ ডাক পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানসংবলিত বচনগুলোকেই 'বেদবাণী' অর্থাৎ প্রজ্ঞাবাণী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিব্বতি ভাষায় ডাক শব্দটির অর্থই জ্ঞান, ডাকের কথা মানে প্রজ্ঞা-বচন। সুতরাং বেদ এবং ডাক সমার্থক। তিব্বতি গ্রন্থ *ডাকার্ণব* মানে জ্ঞানসাগর। কারও কারও মতে, খনার বচন মানেও জ্ঞানের কথা এবং ডাকের মতো খনা শব্দটিও তিব্বতি। একই অর্থে তিব্বতি ভাষায় মূল শব্দটি সখম উচ্চারণ খন। উল্লেখ্য, উড়িয়া ভাষায় খনা মানে বোবা।[৪৩]

জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে খনার বিশেষ বিবরণ না পাওয়া গেলেও অনুমিত চতুর্দশ শতকের বাঙালি জ্যোতিষী প্রজাপতি দাসের *পঞ্চস্বরা* ও ষষ্ঠীদাসের গ্রন্থে খনার বচনের উদ্ধৃতি রয়েছে। সংকলন খণ্ডের 'জ্যোতিষ ও হোরা শাস্ত্র' উপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।[৪৪] খনার অনুসারী জ্যোতিষী প্রজাপতি দাসের *পঞ্চস্বরা* বা 'গ্রন্থ সংগ্রহ' গ্রন্থটি আনুমানিক চৌদ্দ শতকে রচিত হয়েছিল। বইটি রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা থেকে ইংরেজ আমলে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে প্রচুর খনার বচন, বিশেষত হোরা শাস্ত্রীয় বচনাদি উদ্ধৃত হয়েছিল। নওয়াজের (১৯৮৯)

৩৮ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। পৃ. ১৪১।
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪-১১৫।
৪১ ওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। পৃ. ৭৬-৭৭।
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪। (কাজী দীন মোহাম্মদের *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* দ্বিতীয় খন্ড থেকে এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে। ১৯৬৮ সনে এটি প্রকাশিত হয়।
৪৩ কলকাতা থেকে প্রকাশিত শশীভূষণ দাশগুপ্তের *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* এবং হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* গ্রন্থ থেকে এ তথ্য দিয়েছেন অধ্যাপক আলি নওয়াজ। দেখুন : নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*, পৃ. ৪৫।
৪৪ প্রাগুক্তা, পৃ. ৪৭-৪৮।

তথ্যমতে[৪৫], খনার বচনের প্রকাশিত সংকলনের ভেতর পিএম ভট্টাচার্যের *বৃহৎ খনার বচন* সম্ভবত সর্বপ্রথম এবং ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত মধুসূদন ভট্টাচার্যের *খনার বচন* দ্বিতীয় সংকলন। এর পরেই শ্রী মহেন্দ্রনাথ করের সংগৃহীত *সানুবাদ খনার বচন* প্রকাশিত হয়। ১৮০৮ সালে বক্রেশ্বর ন্যায়রত্নের *ডাক পুরুষের বচন* ও ১৯০৪ সালে দুর্গাপতি মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত *ডাক পুরুষের কথা* বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে শরৎচন্দ্র শীল সংগৃহীত *সানুবাদ জ্যোতিষরত্ন খনার বচন*, ১৯২৬ সালে কালীমোহন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত *বরাহমিহির ও খনা* এবং ১৯২৯ সালে পণ্ডিত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যসংকলিত *জীবনী ও মমার্থসহ খনার বচন* প্রকাশিত হয়। *বরাহমিহির ও খনা* নামে শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৫২ বাংলায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়।

১৯৩১ সালে কলকাতা থেকে প্রাণতোষ কুমার রায় ও মানতা চক্রবর্ত্তীর *খনার বচন* নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত *খনার বচন* বইটি বাংলা ১৩৫১ সনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে খনার বচনের বেশ কিছু পুস্তিকা বাংলা ভাষা ও হরফে প্রকাশিত। খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন (যদিও মলাটে পুস্তকটির নাম লেখা হয়েছে শুধু খনার বচন) নামে ভারতের কলকাতা থেকে পণ্ডিত রামপদ ভট্টাচার্যের (আচার্য) সংকলিত একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটিতে ১৭২টি খনার বচনসহ খনার জীবনী, যাত্রাকালীন শুভাশুভ বিচার, শস্য রোপণ প্রণালি, ঝড়বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বর্ষগণনা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক, ধর্মার্থে উপবাসের দিন, অতিবৃষ্টি, অতিবন্যা, শনির অবস্থানভেদে চৈত্র মাসের ফল, স্বামী-স্ত্রীর অগ্র-পশ্চাৎ মৃত্যুগণনা, গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা, জন্মলগ্নের শুভাশুভ গণনা, পরমায়ু গণনা, প্রশ্ন গণনা, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বিবাহের শুভাশুভ কথন, আদ্যঋতুর বারফল, নক্ষত্রফল, গ্রহাদির গোচরফল, জন্মতিথি, ক্ষৌর কর্মাদি ও কর্ণবেধ, হাঁচি, টিকটিকির ফল, তিলতত্ত্ব, যতুকতত্ত্ব ও স্বপ্নতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে বইটির অধিকাংশ অংশ বাংলাদেশ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত *খনার বচন* বইয়ের হুবহু অনুলিপি। বাংলাদেশ ও ভারত থেকে প্রকাশিত উভয় পুস্তকই শুরু হয়েছে *শূন্য কলসী শুকনা না* বচনটি দিয়ে এবং শেষ হয়েছে *সাত পাঁচ তিন কুশল বাত* এই গণনা দিয়ে।[৪৬] খনার বচন নিয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক পৃষ্ঠার একটি পুস্তকের নাম *বৃহৎ খনার বচন* (যদিও বইয়ের মলাটের ভেতরে বইটির নাম লেখা হয়েছে *প্রাচীন ও বিশুদ্ধ খনার বচন*)।

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৪৬ ভট্টাচার্য, পন্ডিত রামপদ (আচার্য)। *খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন*।

মোট ৬৪ পৃষ্ঠার বইটি খুব সম্প্রতি ১৪১৫ বাংলায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবাসব বিজয় দাস বইটির সম্পাদনা করেছেন এবং মানসী হালদার বইটি সংশোধন করেছেন। বইটিতে খনার প্রায় ২০০ বচন ও গণনা আছে।[৪৭] তুষার কান্তি পাণ্ডের সম্পাদনায় *চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবীরের দোহা ও মীরার পদাবলী* নামে কলকাতা থেকে ১৯৮৯-১৯৯০ সালে একটি বই প্রকাশিত হয়। তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ কান্তি চক্রবর্ত্তী, অর্ঘ্য দাশ ও স্বামী ভূমানন্দ পরমহংস বইটি সংকলন করেন। বইটিতে ১৭৬টি খনার বচন ও শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৮]

বাংলাদেশ থেকে বিজয় রায় *খনার বচন* নামে ১৯৯০ সালে একটি পুস্তিকা[৪৯] প্রকাশ করেন। এটি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন শ্রী বিজয় চন্দ্র রায়। একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত মোট ৪৮ পৃষ্ঠার এ পুস্তকে ব্যাখ্যাসহ ১৩৭টি খনার বচন আছে। খনার বচনগুলোর পর বিবাহের শুভ কথন, জন্মতিথি প্রকরণ, হাঁচি ও টিকটিকির

৪৭ দাস, শ্রীবাসব বিজয় (সম্পাদিত)। ১৪১৫। *বৃহৎ খনার বচন* (যদিও বইয়ের মলাটের ভেতরে বইটির নাম লেখা হয়েছে 'প্রাচীন ও বিশুদ্ধ খনার বচন'), মানসী হালদার বইটি সংশোধন করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছে সজল পুস্তকালয়, ৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬। সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। খনার বচনের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে এর আকার একটু লম্বাটে এবং ছাপা ঝকঝকে। মলাট রঙিন এবং লেমিনেট করা। তবে প্রচ্ছদশিল্পীর কোনো নাম নেই। বইটি আমি শিয়ালদহ রেলষ্টেশন থেকে ক্যানিং যাওয়ার পথে রেলষ্টেশনের ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি ২০১২ সনে। বিক্রয়কেন্দ্র-সজল পুস্তকালয়, ৯৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, মূল্য ২৫ টাকা।

৪৮ দেখুন : পান্ডে, তুষার কান্তি (সম্পাদনা)। ১৯৯০, *চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবীরের দোহা ও মীরার পদাবলী*, গ্রন্থনা, কলিকাতা-৯, পৃ. ১-৬৪।

৪৯ উল্লিখিত পুস্তিকাটি আমি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুরের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের রাসলীলানুসরণ উপলক্ষে আয়োজিত 'পূর্ণিমারাস মেলা' থেকে কিনি ১৪০৮ বাংলায়। পুস্তকের গায়ে ৯ টাকা দাম লেখা থাকলেও আমার কাছে যাদব চন্দ্র সূত্রধর (৬৫) বইটি ৬ টাকায় বিক্রি করেন। তিনি প্রায় ৪০ বছর যাবত এ কাজের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের নানান অঞ্চলে বছরব্যাপি মেলা ও উৎসবে এরকম দোকান দেওয়াই তাঁর কাজ। যাদব চন্দ্র সূত্রধরের মূল বাড়ি নরসিংদীর শিবপুরে। পেশাগত জীবনে তিনি উল্লিখিত *খনার বচন* পুস্তকটি ছাড়াও আরো দুই রকমের খনার বচন বই বিক্রি করেছেন। প্রায় বিশ বছর আগে একটি বই ছিল, বইটির মলাটে শাড়ি পড়া খনার ছবি ছিল। বইটির কোনো কপি নেই। পরবর্তীতে আমি শিবপুরে খোঁজ করি, তাঁর দিদিমার কাছেও বইটি ছিল না। তবে তাঁর দিদিমা বিন্দুবালা সূত্রধর (৯৯) সেই খনার বচন পুস্তকটি পড়েছেন। অনেক বচন তখনও তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল, সেখান থেকে প্রায় বাহাত্তরটি বচন আমি তিন দিনে লিখে আনি। আলাপে উল্লিখিত এসব পুস্তিকা সাধারণত অভিজাত বিপণিবিতান হিসেবে পরিচিত কোনো বইপুস্তকের দোকানে বিক্রি হতে দেখা যায় না। এসব বই সাধারনত সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কোনো উৎসব উপলক্ষে মেলা, বারুণী স্নান, পৌষমেলা, চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, কোনো আঞ্চলিক মেলাতে মাটিতে দোকান পেতে দোকানদারেরা বিক্রি করেন। এসব পুস্তক বিক্রেতারা 'পুস্তক পরিবেশক বা বিক্রয়কারী হিসেবে' কখনোই স্বীকৃত নন। উল্লিখিত খনার বচনের মতো

ফল, গ্রহগণের গোচরফল, স্পন্দন চরিত্র ও তিলতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০] ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অধ্যাপক আলি নওয়াজের *খনার বচন ও কৃষি* বইটি প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণা প্রকল্পের অধীনে রচিত উক্ত গবেষণা পুস্তকে বাংলা, উড়িয়া, বিহারি, অসমিয়া, তেলেগু, কানাড়া ভাষা থেকে কৃষিপ্রবাদের উদ্ধৃতিসহ মোট ৪৩২টি বচন সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি* বইটি প্রকাশ করে। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সাহেবাবাদ, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা, রুদ্রগ্রাম ও পীরধানীখোলা ও দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জের মাধবপুর ও বোগদাইরহাট এ ছয়টি গ্রামে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ নমুনা জরিপ

পুস্তিকাকে অনেক সময়ই 'চটি বই' বলতে শোনা যায়। খেয়াল রাখা জরুরী 'চটি বই' বলতে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের ভেতর পর্ণো পত্রিকাকেও বোঝানো হয়। কেউ কেউ এসব প্রকাশনাকে 'বটতলার প্রকাশনাও' বলেন। ব্যাক্তিগতভাবে গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মেলায় সহযাত্রী বাঙালি পুরুষ বন্ধুদের 'এসব প্রকাশনাকে' 'হিন্দুদের বই' বলতে শুনেছি। লক্ষীব্রতের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, শ্রী শ্রী অষ্টোত্তর শতনাম, গোরক্ষনাথের পাঁচালী, বাংলার ব্রতকথা, মেয়েদের ব্রতকথা, ত্রিনাথের পাঁচালীর সাথে খনার বচনের মতো পুস্তিকাগুলো এসব মেলায় পাওয়া যায়। এসব দোকানে চলতি সময়ে বাংলা সিনেমার গান, মাতাল রাজ্জাকের গান, জনপ্রিয় সিনেমার গান, যৌনরোগের মহৌষধ, স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য মিলন, সুখের বাসর, জানার আছে অনেক কিছু, কি করিলে কি হইবে, মোবাইলের গান, মোবাইল সম্পর্কে জানুন এসব পুস্তিকাও বিক্রি হতে দেখা যায়। পাশাপাশি সিঁদূর, আবীর, নীল, চন্দন কাঠ, তিলকমাটি, তুলসীর মালা, সনাতন হিন্দুদের নানান দেবী-দেবতার পোস্টার, ফুল-শিশু-রাজনৈতিক নেতৃত্ব-সিনেমার নায়িকা-নায়কদের পোস্টারও বিক্রি হয়। এসব দোকানের ব্রতকথা ও খনার বচনের মতো পুস্তকের মূল ক্রেতা গ্রামের কৃষক পরিবারের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালি মধ্যবয়স্ক ও কখনো কখনো প্রবীণ নারী। উল্লিখিত অন্যান্য পুস্তক কমবয়স্ক বাঙালি মুসলিম কি হিন্দু ছেলে-মেয়েদেরও কিনতে দেখা যায়। এসব পুস্তক ছাপা হয় নিউজপ্রিন্ট কাগজে এবং উপরের প্রচ্ছদ থাকে হাতে আঁকা, যদিও কোথাও প্রচ্ছদশিল্পী কি লেখক বা সংগ্রাহকের কোনো পরিচয় থাকে না। এসব পুস্তকের মূল্য নিতান্তই কম, এখনও একটি জাতীয় দৈনিকের দামে এরকম একটি পুস্তক কিনতে পাওয়া যায়। বাঙালি সনাতন হিন্দু পরিবারের গ্রামীণ নারীরা এই পুস্তকগুলো খুব যত্ন করে, ঘরের ভেতর দেবতার জন্য সংরক্ষিত আসনের কাছে রাখে। ব্রতকথা ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক 'পবিত্র' হিসেবে যে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায় পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত 'খনার বচন' পুস্তকও সেইসব পরিবারে 'পবিত্র পুস্তকের' মর্যাদা পায়। খনার বচন কি খনা সম্পর্কিত কোনো লেখা কি আলাপে আজ পর্যন্ত এসব পুস্তকের কোনো হদিস দিতে কখনো কাউকে দেখা যায় না। এসব প্রকাশনা সম্পর্কে অধ্যাপক আলি নওয়াজ (১৯৮৯) বলেছেন, কলকাতায় বটতলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ জাতীয় সংকলন অহরহই পাওয়া যেত এবং এখনও যায়। বাংলাদেশ হতেও এরূপ কিছু চটি সংকলন মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন, খনার বচনের পুরাতন সংকলনের মধ্যে মধুসূদন ভট্টাচার্যের ক্ষুদ্রাকৃতি সংকলনটিই শুধু বাংলা একাডেমীর মুক্তাগাছা গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

৫০ রায়, শ্রী বিজয় চন্দ্র (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)। ১৯৯৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), *খনার বচন*।

চালিয়ে নওয়াজ (১৯৮৯) জানান, তিনটি জেলার মাত্র ৯% পল্লীবাসী পড়ে খনার বচন জেনেছে, অথচ খনার বচন সম্পর্কে জানে ৯৭% জন। তিনটি জেলার ৮৯% লোক জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে খনার বচন দ্বারা পরিচালিত। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ঢাকা থেকে ১০০টি খনার বচন দিয়ে 'পকেট-বুক' আকারের *খনার বচন* বইটি প্রকাশ করে।[৫১] অরূপ রাহীর সম্পাদনায় *খনার বিজ্ঞান* নামে ২০০৬ সালে একটি বই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

জানা যায়, পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে ঢাকা কৃষি দপ্তর থেকে প্রকাশিত *কৃষিকথা* পত্রিকায় চাষাবাদে খনার বচনবিষয়ক কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নওয়াজ (১৯৮৯) ঢাকা থেকে *কৃষিকথা* পত্রিকায় ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত খনার বচনসম্পর্কিত প্রবন্ধের একটি তালিকা দিয়েছেন।[৫২] সে তালিকা অনুযায়ী এম এ মান্নানের 'কলা চাষের ইতিবৃত্ত', কলিম উদ্দিন আহমদের 'প্রাচীন কৃষি সাহিত্য থেকে', ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত শাহ ইসকান্দারের 'খনার বচন ও চাষাবাদ', ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত শাহ ইসকান্দারের 'বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি খনার বচন', মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের 'বচনে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ' *(১৯৫৯)*, জে এল সেনের 'কৃষি ও পশুপালনের ছড়া-প্রবন্ধ (১৯৫৯)', জে এল সেনের 'কৃষিকার্যে খনার বচন (১৯৫৯)', চৌধুরী গোলাম আকবরের 'খনার বচন সংগ্রহ (১৯৬৩)', চৌধুরী গোলাম আকবরের 'ডাক ও খনা (১৯৬৩)', হরিপদ পালের 'খনার বচন', আবুল কাছিম কেশরীর 'খনার বচন', আবুল ওয়াহেদের 'খনার বচন', কাশতকারের 'গ্রাম্য প্রবাদ প্রবচন', কাশতকারের 'পান সম্পর্কে খনার বচন (নভেম্বর ১৯৫০)', কুমুদ বিহারী মোহান্তের 'কয়েকটি খনার বচন', 'কৃষিকথা' (খনার বচন), এ কে আহমদ খানের 'খনার বচন', দেওয়ান গোলাম মর্তুজার 'কৃষি বাংলার কয়েকটি ছড়া (১৯৬৩)', দেওয়ান আবদুল হামিদের 'ফসল ফলাও (১৯৬৭)', 'তিলের চাষে খনা' ইত্যাদি লেখায় খনার বচনের প্রসঙ্গ ও আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় কিছু পদস্থ কৃষি কর্মকর্তা খনার বচনের অনুরূপ কৃষি ছড়া রচনা করেন এবং এসব *কৃষিকথায়* প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেসবের কোথাও খনার বচনের কোনো উল্লেখ বা সুপারিশ নেই। কোথাও কোথাও এমনও দেখা গেছে, খনার বচনকে মূল সূত্র ও অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে একটি প্রবাদ-কথায় পরিণত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নওয়াজ (১৯৮৯) জানাচ্ছেন, 'আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহে কিছু খনার বচনও স্থান পেয়েছে। কিন্তু এসব বচনের কৃষিমূলক অর্থ বদলে সেখানে একটি প্রবাদমূলক অর্থ দাঁড় করানো

৫১ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা। ২০০৭, *খনার বচন*, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা।

৫২ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালী সংস্কৃতি*। পৃ. ১৫২-১৫৩।

হয়েছে। যেমন কুয়ো হয় আমের ভয়, তাল-তেঁতুলের কিবা হয়। এই খনার বচনের মানে কুয়াশায় আমের বোল ঝরে পড়ে ও আমের ক্ষতি হয় কিন্তু তাল ও তেঁতুলের ক্ষতি হয় না। এ বচনটির অর্থ করা হয়েছে মহতের বিপদের ভয় বেশি'।[৫৩] বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত *সুদর্শন ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা ১৪১৮*, *লোকনাথ ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা ১৪১৮*, *বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৪১৮*, *মোহাম্মদী পঞ্জিকার* প্রথম ও শেষ অংশে বেশ কিছু খনার বচন ও অর্থ দেওয়া আছে।

খনার বচন এখন কেবল বাংলা পঞ্জিকা, পুস্তিকা কি মুদ্রণেই নেই, ভার্চুয়াল দুনিয়াতেও তা দৃশ্যমান হচ্ছে। উইকিসংকলন নামের একটি বাংলা ওয়েবসাইটে (bn.wikisource.org) খনার ১৬৮টি বচন সংকলিত আছে।[৫৪] বাংলা *উইকিপিডিয়ায়* (bn.wikipedia.org) 'মার্চ ২০১০ তারিখ হতে উৎসবিহীন নিবন্ধ' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে খনার বচন নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। অনেকের মতে, খনা নাম্নী জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচনা এ ছড়াগুলো'। ওই সাইটেও খনার বচনকে *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য* হিসেবে বিষয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে নমুনা হিসেবে ১২টি বচন উল্লিখিত হয়েছে।[৫৫] রণদীপম বসু ২০০৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর '...শব্দছেঁড়া কবিতারা' শিরোনামে তাঁর একটি ব্লগস্পটে ১০০টি খনার বচন সংকলিত করেছেন, সূত্র হিসেবে তিনি নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা থেকে প্রকাশিত খনার বচন পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন। রণদীপম বসু খনার বচনকে 'খনার কৃষি ও ফলসংক্রান্ত বচন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৫৬] 'খনা' নামের একটি ব্লগে ৮২টি খনার বচন দেওয়া হয়েছে, ওই ব্লগে মারভিক ও সালাহ উদ্দীন শুভ্র খনা ও খনার বচন নিয়ে কয়েকটি পোস্ট লিখেছেন।[৫৭] রথীন্দ্র ভারতী 'বাঙালি জ্যোতিষী' নামের

৫৩ প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৮।

৫৪ দেখুন http://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A6%A8। ১৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি দেওয়া হয়েছে।

৫৫ দেখুন http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A6%A8। ১৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি দেওয়া হয়েছে।

৫৬ দেখুন http://chorakobita.blogspot.com/2009/12/blog-post_30.html। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি দেওয়া হয়েছে।

৫৭ দেখুন http://khona.blog.com/khonas-speech/। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি দেওয়া হয়েছে।

একটি ব্লগে খনার বেশ কিছু বচন উল্লেখ করেছেন।[৫৮] ডিডব্লিউ-বাংলা (www.dw.de/bengali) নামের একটি ওয়েবসাইটে খনার বচন ও কৃষিসংক্রান্ত 'বর্তমানকালে খনার বচনের গুরুত্ব' শিরোনামে জাহিদুল হকের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালের ১১ জানুয়ারি। ওই লেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, খনার বচন লোকসাহিত্যের অংশ এবং দর্শন ও বিজ্ঞান আবিষ্কারের আগে থেকেই মানুষ লোকদর্শন আর লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার করত। লেখাটিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে প্রায় দুই শ খনার বচনের প্রচলন রয়েছে।[৫৯] *প্রথম আলো* ব্লগে ২৫ আগস্ট ২০০৯ তারিখে পোস্ট করা সালাহ উদ্দীন শুভ্রর 'খনার বচনের ইতিহাস ও সমকালীন আলোচনা-প্রথম পর্ব' শিরোনামে একটি লেখা পাওয়া যায়। শুভ্র তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, খনা মানে বোবা।[৬০] ওই ব্লগেই ৪ আগস্ট ২০০৯ তারিখে পোস্ট করা শেখ নজরুলের 'বোবাবিজ্ঞানী' পোস্টটিও খনাকে নিয়েই লেখা। তিনিও তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেছেন, খনা মানে বোবা।[৬১] 'ঝিঁঝিপোকা (zizipoka.com)' নামের একটি ব্লগে ১০টি খনার বচন দিয়ে সেসবের মানেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৬২] রূপক রাসেল *সামহোয়্যার ইন ব্লগে* পাঁচটি খনার বচন নিয়ে ২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে একটি পোস্ট লিখেন।[৬৩]

সামহোয়্যার ইন ব্লগে মরুভূমির জলদস্যুর দশটি খনার বচন নিয়ে আরও একটি পোস্ট দেখা যায়, যেটি ১৬ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে পোস্ট করা।[৬৪] 'খনা : এক

৫৮ দেখুন http://rathindrabharati.wordpress.com/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A6%A8/। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৫৯ দেখুন http://www.dw.de। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬০ দেখুন http://prothom-aloblog.com/posts/16/58775। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬১ দেখুন http://zizipoka.com/known-unknown/263। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬২ দেখুন http://zizipoka.com/known-unknown/263। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬৩ দেখুন http://www.somewhereinblog.net/blog/rupokrasel31/29721043। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬৪ দেখুন http://www.somewhereinblog.net/blog/qshohenq/29308834। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

কিংবদন্তি নারীর দুঃখগাথা' শিরোনামে ব্লগার চয়ন 'চতুমার্ত্রিক' ব্লগে ২৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে পোস্টকৃত তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন, আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে জন্ম নেওয়া ইতিহাসের এক কিংবদন্তি খনা বা ক্ষণা। কোনো এক শুভক্ষণে তাঁর জন্ম বলে নাম দেওয়া হয় ক্ষণা। আর 'ক্ষণা থেকেই 'খনা' নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।[৬৫] 'মুক্তমনা' ব্লগে 'জনভাষ্যে মিশে থাকা আমাদের লোকভাষ্যকার' শিরোনামে রণদীপম বসুর খনা-সম্পর্কিত একটি লেখা পাওয়া যায়। উক্ত ব্লগে লেখাটি ২৪ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে পোস্ট করা।[৬৬]

খনার বচনের সংখ্যাতাত্ত্বিক তর্কে আমরা যাচ্ছি না। কারণ, এটি খনার বিজ্ঞান-দর্শনকে জানা-বোঝার জন্য জরুরি নয়। বিজ্ঞান কোনো গরিষ্ঠতা, সংখ্যার মান কি জনমত দিয়ে নির্মিত হয় না। এটি বস্তুবাদী এক নিরীক্ষিত জীবনধারার বহমানতা। তবে খনার বচনের ক্ষেত্রে সচরাচর 'হারানো বচন' কি 'বিলুপ্ত বচন' বলে অনেক সময় যে জনক্ষোভগুলো উঠেছে সে জায়গাটিকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আমলে নিচ্ছি। কারণ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের বিজ্ঞান ও নিরীক্ষার সূত্র ও আওয়াজের ন্যায়বিচার সুরক্ষা করা। সেটি মুদ্রিত দলিলের ভেতর দিয়ে হবে না শ্রুতি আখ্যান হিসেবে বহমান থাকবে তা নির্ধারণ করবে চলমান সামাজিক সম্পর্ক ও জনগণের নথিভুক্তকরণের ব্যাকরণ।

খনার বচনের 'অবধারিত' পাঠ

ভাদরে আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল
যে চাষা ঘুমিয়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্তিক অঘ্রান মাসে
যদি বুড়ো গাছ খেতে পুঁতে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিবে ওলা
পাবে না মাল চাষার পোলা॥[৬৭]

(ওপরের খনার বচনের অর্থটি এমন যে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে লঙ্কার চাষ করলে ফল ভালো হয়। তা না করে যদি আলস্যে সময় কাটিয়ে কার্তিক-অঘ্রান মাসে চাষ করা হয়, তাহলে ধসা রোগে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। লঙ্কা পাওয়ার কোনো আশাই থাকে না।)

সচরাচর আমরা দেখি, খনার বচন প্রসঙ্গে আলাপের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়

৬৫ দেখুন http://choturmatrik.net/blogs। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬৬ দেখুন http://choturmatrik.net/blogs। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬৭ এই খনার বচনটি নেওয়া হয়েছে : পান্ডে, তুষার কান্তি (সম্পাদনা)। ১৯৯০, *চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবীরের দোহা ও মীরার পদাবলী*, পৃ. ৭-৮।

'কৃষিবৃত্তি', 'আবহাওয়া' ও 'লোকসংস্কৃতি'। 'সবার জন্য লোকায়ত জ্ঞান' শিরোনামে ডি-নেট নামের একটি সংগঠনের ওয়েবসাইটে লোকায়ত জ্ঞানের ছয়টি ক্ষেত্রের ভেতর একটিকে বলা হয়েছে সাহিত্য উপকরণ। আর সাহিত্য উপকরণের অংশ হচ্ছে প্রবাদ, রূপকথা ও প্রথা।[৬৮] খনার বচন নিয়ে চৌধুরী (২০০০) যেমন জানান, খনার বচন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এগুলো মূলত লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিরই এক ভগ্নাংশ। হাজার বছর ধরে এগুলো মানুষ লোকপরম্পরায় ধরে রেখেছে। এটি সম্ভব হয়েছে এগুলোর ছন্দে চমৎকারিত্বের জন্য। প্রকৃতপক্ষে এ বচনগুলো হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের মতোই পুরোনো। অনেকে অনুমান করেন, খনা অন্তত দেড় লাখের মতো বচন রচনা করেছিলেন।[৬৯] তার মানে খনার বচনকে অনেকেই 'সাহিত্য' বিশেষত লোকসাহিত্যের বিষয় হিসেবেই দেখতে পছন্দ করেন। এসব চিন্তার ভেতর দিয়ে সচরাচর একটি 'অন্যথা' তৈরি হয়। কারণ, অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে গ্রামীণ সমাজের চিন্তাজগৎ কোনো বিজ্ঞান কি দর্শনের কারিগর নয়।

পাশাপাশি সেন (২০০৮) জানান, খনার বচন গ্রামীণ কৃষকদের দ্বারা স্বীকৃত এবং এখনো বর্তমানের 'আধুনিক কৃষিচর্চার ক্ষেত্রে' কিছু কিছু বচন অনেক কৃষক মেনে চলেন। হাজার বছর আগের বাংলার জলবায়ু, বাস্তুসংস্থান, পরিবেশ, মাটি, আবহাওয়া ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা খনার বচন লোকায়ত কৃষির এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ।[৭০] সিং (২০০৮) তাঁর *আ হিস্ট্রি অব অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড আর্লি মেডিয়াভাল ইন্ডিয়া : ফ্রম দ্য স্টোন এজ টু দ্য ১২ সেঞ্চুরি* বইতে ডাক ও খনার বচনকে 'প্রাচীন বাংলার জনপ্রিয় কৃষি ভাষ্য' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। খনাকে বরাহমিহিরের পুত্রবধূ হিসেবে পরিচয় দিয়ে লিখেছেন, খনা ও ডাকের বচন বাংলার মাটি ও জলবায়ুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এমনকি তা এখনো বাংলার কৃষকের কৃষির নির্দেশনা দিতে সহযোগিতা করছে।[৭১] আমাদের প্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্বে খনাকে আমরা আমাদের বিন্যাস ও রীতি-প্রক্রিয়া দিয়ে পাঠ করতে চাই। খনার বিজ্ঞান বচনের দর্শনভিত্তি ও তাঁর কাজের লড়াকু ইশতেহার পাঠ কি চর্চা আমাদের খনাপাঠের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না অধিকাংশ সময়। তাই চৌধুরী (২০০০) খনার বচন-সম্পর্কিত একটি লেখায় আশ্চর্যজনকভাবে উল্লেখ করেন, বাংলা বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে খনার খুব বেশি বচন নেই। কেননা এগুলো

৬৮ দেখুন http://www.ik.org.bd/?page_id=22। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে এই লিংকে প্রবেশ করে এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে।

৬৯ চৌধুরী, তিতাশ। ২০০০, 'খনার বচনে বোশেখের চিত্রলতা', নিবন্ধটি লেখকের *বৈশাখ ও আমাদের ঐতিহ্যচেতনা* শীর্ষক সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৯।

৭০ Sen, Dhiman. 2008, *Impact of Khana's Vachan on traditional agriculture in Bengal*, P. 212.

৭১ Singh, Upinder. 2008, *A History of Ancient and Early Medieval India,* p.581.

প্রধানত জলবায়ু, আবহাওয়া, কৃষি, কৃষক, কৃষিকার্যের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ইত্যাদিনির্ভর। আর যেহেতু বৈশাখ ফল-ফসলের তেমন মাস নয়, রবিশস্যেরও নয়, সে কারণেই বৈশাখকে নিয়ে বচন তৈরি করার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না খনার।[৭২] খনা একটি অধিপতিশীল সমাজকাঠামোয় নিম্নবর্গের বিজ্ঞানচৈতন্য ও নিরীক্ষাকে যে কায়দায় জনভাষ্যে পরিণত করার সাহস দেখিয়েছেন, তা কোনোভাবেই স্বীকৃত হয়ে ওঠে না। শেষমেশ খনাকে কেবল 'গ্রামের লোকদের চাষ-বাস করার কিছু নির্ঘণ্ট ও নির্দেশিকার' লোক-রচয়িতা হিসেবেই আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী বাংলার কৃষি বিস্তারে খনার বচনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কৃষিবিজ্ঞান দীর্ঘ সময়ের আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। খনার বচনও দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা প্রাচীনকালের এক কৃষিবিজ্ঞান।[৭৩]

ধান, কলা ও গরুকে খনার বচনে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অধিকসংখ্যক বচন রচিত হয়েছে। এ ছাড়া খনা নানা জাতের ধান, সরিষা, বেগুন, মরিচ, লাউ, শসা, পটোল, শিম, আলু, কচু, বাঁশ, তিল, তাল, উচ্ছে, পুঁই, মরিচ, কার্পাস, কুল, বেল, নিম, নিশিন্দা, বাসক, জাম, শাল, মান্দার, চাঁপা, বক, বকুল, মটর, কালাই, মুলা, ধান, মিষ্টিকুমড়া, হলুদ, আম, কলা, তামাক, নারিকেল, খেজুর, আখ, মানকচু, আদা, ওলকচু, পাট, চালকুমড়া, তুলা এ রকম নানা শস্য ফসল চাষের সময়কাল, বীজ কি চারা বপন-উত্তোলন-কাটার সময়কাল, পরিচর্যা, ব্যবস্থাপনা, চাষপদ্ধতি, নিত্য পর্যবেক্ষণ ও দুর্যোগ আন্দাজ করে ফসল রক্ষা প্রস্তুতি বিষয়ে অনেক ধরনের বচন দিয়েছেন। পাশাপাশি মাটি, আবহাওয়া, ঋতুর অদলবদল, মেঘ-বৃষ্টির শ্রেণীকরণ ও সময় নির্ঘণ্ট, আবহাওয়ার আন্দাজ, দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের আগাম প্রস্তুতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুঃসময়ের আগাম হিসাবনিকাশ, প্রাকৃতিক নির্দেশনা, তারাগণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, স্বাস্থ্য ও জীবনপ্রণালি, প্রাণবৈচিত্র্য ও প্রকৃতির সম্পর্ক এ রকম নানা বিষয় গ্রামীণ গার্হস্থ্যজীবনের নিত্যদিনের কলা ও রীতিকে এক সর্বস্তরের বিজ্ঞানভাবনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

৭২ চৌধুরী, তিতাশ, ২০০০। পৃ. ৯৫-৯৯।

৭৩ Bandyopadhyay, Monanjali and Chakraborti, Kalyan. *Folk Poetry as a Media of Agriculture Extension in Bengal.* Available in http://www.academia.edu/1604047/Full_length_paper_Folk_poetry_as_a_media_of_agricultural_extension_in_Bengal.

খনার বিজ্ঞান-দর্শন

কিসের তিথি কিসের বার
জন্মনক্ষত্র কর সার
কি কর শ্বশুর মতিহীন
পলকে জীবন বারো দিন।

(পরমায়ু গণনাবিষয়ক খনার এ বচনটিতে বলা হয়েছে, যে নক্ষত্রে কোনো মানুষের জন্ম, তদবধি বাকি তার যত পরিমাণ, প্রতি পলে বারো দিন ধরে পরমায়ু গণনা করতে হয়।[৭৪]

ধরা যাক চিত্রা নক্ষত্রে কারও জন্ম হলো। মনে করা যাক ২০ দণ্ড আর বাকি আছে। ৬০ পলে এক দণ্ড। ২০ কে ৬০ দিয়ে গুণ করতে হবে।

গুণফল ১২০০ পল হয়। ১২০০ পলকে বারো দিয়ে গুণ করতে হবে। ১৪৪০০ দিন হয়। একে ৩৬৫ দিন দিয়ে ভাগ করলে পরমায়ু বছর বের হয়।)

৬০ পলে ১ দণ্ড, ২০ দণ্ড = ২০ X ৬০ = ১২০০ পল
১ পল = ১২ দিন, ১২০০ পল X ১২ দিন = ১৪৪০০ দিন
৩৬৫ দিন = ১ বছর, ১৪৪০০ % ৩৬৫ দিন = ৪০ বছর
অতএব জাতকের আয়ু = ৪০ বছর

খনার বচন কি বিজ্ঞান? এ প্রশ্ন দিয়ে আলাপটি শুরু হচ্ছে না। বরং খনার বিজ্ঞান-দর্শনের ভেদটি বোঝার জন্য চারধারের ক্ষমতার রাজনীতির ঐতিহাসিকতাও এখানে টেনে আনা হচ্ছে। খনার বচন ও খনার কাজের বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে আলোচনা একেবারেই আমরা দেখতে পাব না। সেন (২০০৮) খনার বচন ও লোকায়ত কৃষির প্রভাব শীর্ষক এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, খনার সব বচনই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। বিশেষত জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতিবিজ্ঞানের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নিয়ে তাঁর অনেক বচনকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা কঠিন।[৭৫] আবার খনার বচনের বিজ্ঞানভাবনা ও দর্শন নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন চিন্তাও কখনো কখনো প্রকাশ করেছেন অনেকে। এ প্রসঙ্গে চৌধুরী (২০০০) লিখেছেন, খনাই এ দেশে সর্বপ্রথম কৃষি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তাঁর বচনের জাদুকরি স্পর্শে। বলাবাহুল্য, আজও পল্লী বাংলায় খনার বচনই 'কৃষি দর্শন' হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। বাংলার কৃষকেরা এ দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই ফসল বোনেন, লাগান ও কাটেন। কৃষি ঐতিহ্য খনারই অবদান।[৭৬] ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও দিনাজপুরের কয়েকটি গ্রামে নমুনা

৭৪ ভট্টাচার্য, পন্ডিত রামপদ (আচার্য) । *খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন*, পৃ.২৯।

৭৫ Sen, Dhiman. 2008. P. 213.

৭৬ চৌধুরী, তিতাশ, ২০০০। পৃ. ৯৫-৯৯।

জরিপ চালিয়ে নওয়াজ (১৯৮৯) মন্তব্য করেছেন, গ্রাম-বাংলার জীবন-দর্শন আজও খনার বচনের আদর্শেই বাঁধা।[৭৭]

চৌধুরী (২০০০) খনার বচন নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেন, খনার বচনে কোনো সংস্কার বা কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায় না। এগুলো মোটামুটি বৈজ্ঞানিক। এবং অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণসম্মত।[৭৮] ২০০৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে 'খনার বচন কেন বিজ্ঞান' প্রশ্নটি নিয়ে 'কবিসভা' নামের একটি ইয়াহু গ্রুপ সাইটে রহমান নাসির উদ্দীনের একটি লেখাকে ঘিরে কিছুটা আলোচনা উঠেছিল। সেখানে তপন কুমার বাগচী, কন্থীজাম সুরঞ্জিত, অরূপ রাহী, রহমান নাসির উদ্দীন অংশ নেন।[৭৯] রাহী (২০০৬) তাঁর সম্পাদিত পুস্তক *খনার বিজ্ঞান*- এ লিখেছেন :

> অনেকের মতে খনা কেবল 'লোকবচন' বা 'লোকশাস্ত্র'। খনার কাজকে বিজ্ঞানের চর্চা বলতে অনেকে নারাজ। আমরা খনার কাজকে বিজ্ঞান বলতে চাই। খনা কেন বিজ্ঞান? বিজ্ঞান বিষয়ে লম্বা তর্কে এখানে ঢোকার সুযোগ নেই। আমরা এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই, খনা বিজ্ঞান এই জন্য যে, তার চর্চার একটা বিকাশশীল পদ্ধতি আছে। খনা বিজ্ঞান এই জন্য যে তা সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান উৎপাদন করে। খনা বিজ্ঞান এই জন্য যে তা সামান্য ও বিশেষ সত্য উৎপাদন করে।[৮০]

কিন্তু আমরা খোদ খনার বচন ও তার নিম্নবর্গীয় চর্চা বাদে 'বিদ্যায়তনিক জ্ঞানকাণ্ডের' কোথাও খনার বচনের বিজ্ঞান সূত্র ও বিজ্ঞান-দর্শনের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখতে পাই না। খনার বচনের 'আদর্শ', 'কৃষিদর্শন', 'কৃষিঐতিহ্য' এসব প্রত্যয় আমরা খনার বচনের আলাপ ঘিরে উঠতে দেখি। যদিও এসবের ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গের খনাচর্চা বহমান থাকছে। কিন্তু খনার বিজ্ঞান-দর্শনের সূত্রটিকে আমরা অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে এখনো মজবুত কায়দায় পাল্টা বিজ্ঞান আওয়াজ হিসেবে তুলতে পারিনি।

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ইসলাম (২০১৩) তাঁর *বিজ্ঞানের দর্শন* বইতে লিখেছেন :

> বিজ্ঞান নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক। বস্তুহীন বিজ্ঞান কল্পনার অতীত। বিজ্ঞানে ভাববাদী ও বস্তুবাদী এমন কোনো বিভাজন নেই। বিজ্ঞান এক শ ভাগ বস্তুবাদী। আমরা দেখেছি, গ্রিক সভ্যতার শুরুটা ভালোই ছিল। থেলিস, লিউসিপ্পাস, ডেমোক্রিটাস, অ্যানাক্সিগোরাস, অ্যানাক্সিমিনিস, জেনোফেন প্রমুখ প্রাকৃতিক দার্শনিকের হাতে বিজ্ঞানের আদিরূপের উন্মেষ ঘটতে থাকে। তাঁদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু আধিভৌতিক কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়, তাঁদের আগ্রহের প্রধান জায়গা প্রকৃতি, অর্থাৎ বস্তু। যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির অদৃশ্য রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁরা যত্নবান হন এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। রোদ-বৃষ্টি-জল-ঝড়-ভূমিকম্প-অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ তাঁরা প্রকৃতির মাঝেই খোঁজেন। হিপোক্রিটাস (৪৬০-৩৭৭ খ্রি.পূ.) গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। তাই তাঁরা সবাই প্রকৃতি দার্শনিক। তাঁদের সে অনুসন্ধানের প্রধান অস্ত্র ছিল যুক্তি এবং সে যুক্তির প্রয়োগ দেখে আইনস্টাইন বিস্মিত হয়েছিলেন।[৮১]

খনার বচন সম্পূর্ণতই যাপিতজীবনের বস্তুবাদিতা ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। খনার এমন কোনো বচন নেই, যেখানে তা ধর্মের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়েছে। বা স্থানীয় কোনো বিমূর্ত রূপ প্রকাশ করেছে। খনার বচন কোনোভাবেই হিন্দু কি মুসলমান, বাঙালি কি আদিবাসীর আখ্যান হয়ে দাঁড়ায়নি। নওয়াজ (১৯৭৯) তাই বাংলাদেশের তিনটি জেলায় খনার বচন ও কৃষির ওপর এর প্রভাব নিয়ে রচিত বইতে উল্লেখ করেছেন, ডাক ও খনার বচনের সৃষ্ট ঐতিহ্য এ দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ওপর থেকে ইসলাম বিলুপ্ত করে দিতে সমর্থ হয়নি।[৮২] কারণ, খনার বচনের এমন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি কি দর্শনভিত্তি ছিল না। এটি এ দেশের নিম্নবর্গের বহমান বিজ্ঞানসূত্র, যা বচনের ভেতর দিয়ে এক বস্তুবাদী দার্শনিকতার পাটাতন প্রস্তুত করেছে। অবস্তুবাদী কোনো সূত্র কি প্রত্যয় খনার বিজ্ঞান-দর্শনের বিষয় হতে পারেনি।

ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) সম্পর্কে জে ডি বার্নাল বলেন, 'মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান থেকে আধুনিক বিজ্ঞানে উত্তরণের পথের বাঁক ফেরার সন্ধিলগ্নে বেকন ও দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) আবির্ভাব হয়। এঁরা দুজনেই ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং বার্তাবহ'।[৮৩] বেকন জানিয়েছেন, 'আমাদের চেতনা এবং উপলব্ধির চেয়ে প্রকৃতি অনেক বেশি সূক্ষ্ম। তাই চটকদার অনুধ্যান, দূরকল্পনা এবং মানুষ সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব প্রচলিত আছে, সেগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম ছাড়া কিছু নয়। শুধু প্রকৃতির পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর এবং তাকে পর্যবেক্ষণ করার কেউ নেই'।[৮৪] বেকন কি খনা, খনা

---

৭৭ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি, ১৯৮৯। পৃ. ১৫৭।

৭৮ চৌধুরী, তিতাশ, ২০০০। পৃ. ৯৫-৯৯।

৭৯ দেখুন : http://groups.yahoo.com/group/kabishabha/message/3788.

৮০ রাহী, অরূপ। ২০০৬। *খনার বিজ্ঞান* (সম্পাদিত), শ্রাবণ প্রকাশণী, ঢাকা।

৮১ পড়ুন : ইসলাম, শহীদুল। ২০১৩, *বিজ্ঞানের দর্শন*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৮-১৯।

৮২ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি, ১৯৭৯। পৃ.২৬০।

৮৩ এটি নেয়া হয়েছে শহিদুল ইসলামের *বিজ্ঞানের দর্শন* পুস্তক থেকে। শহিদুল ইসলাম তথ্যটি নিয়েছেন, J.D. Bernal, Science in history, অনুবাদ-আশিষ লাহিড়ী, প্রথম খন্ড, বিজ্ঞান চেতনা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ-২৮৭ থেকে।

৮৪ মানুষের রাজত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শহীদুল ইসলাম তাঁর *বিজ্ঞানের দর্শন* (দ্বিতীয় খন্ড) পুস্তকে 'ফ্রান্সিস বেকনের নোভাম অর্গানাম আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারোদঘাটন' নিয়ে একটি লেখা লিখেছেন। সেখান থেকেই উক্ত অংশটি নেয়া হয়েছে। পড়ুন : ইসলাম, শহীদুল, ২০১৩। *বিজ্ঞানের দর্শন*, পৃ. ৩১৯।

কি বেকন এরূপ কোনো মাপকাঠি দিয়েই আমরা বিজ্ঞান-দর্শনের আলাপে বসিনি। আমরা কেবল কিছু ঐতিহাসিক সূত্র ও নথিকে আলাপের সাথি করছি আমাদের জানাবোঝার গণ্ডির বিস্তার ঘটাতে। কারণ, নওয়াজের (১৯৮৯) লেখা থেকে পাই, 'খনার বচন আজ আর কোনো ব্যক্তিসত্তার সাক্ষ্য নয়, বরং বাঙালি জাতি তথা পল্লিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য'।[৮৫] খনা কি খনার বচন তাই আর কোনো ব্যক্তির বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, এটি একটি তত্ত্ব ও দর্শন-প্রক্রিয়াকে সামনে নিয়ে এসেছে। উপস্থিত করেছে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিরীক্ষা ও চর্চার বিজ্ঞানকে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, কেবল খনা নন, এখনো খনাবাদী[৮৬] গ্রামীণ নিম্নবর্গ চারপাশের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছে এক বৈজ্ঞানিক কারিগরির ভেতর দিয়েই।

খনার বচনের বিজ্ঞান-দর্শনকে আলাপের কেন্দ্রবিন্দু করে পার্থ (২০১২) 'জলবায়ু পঞ্জিকার পরিবর্তন' শীর্ষক তাঁর একটি লেখায় বলেছেন :

> চাকমা সমাজের রাধামন-ধনপুদী, মান্দি সমাজের দিগ্নি-বান্দি বা শেরানজিং, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজে রাসপালা, হাজং সমাজের জাখামারা গীত বা সুন্দরবনের গাজীর পট, বিল এলাকার মনসামঙ্গল, হাওর জনপদের ধামাইল বা বান্ধা কি *মৈমনসিংহ গীতিকা* বা কিসসা-কাহিনি-পই-প্রবাদ-ডাক-ডিঠান-শ্লোক বা খনার বচন চারপাশের পরিবর্তনশীলতাকে ঠাহর করে রচনা করে নিম্নবর্গের যাপিতজীবনের ইতিহাস। সেই যাপিতজীবনের ঝাঁঝ থেকেই জনগণের ভাবনার ভাষা এবং সূত্রগুলোকে জানাবোঝা করা জরুরি। কারণ, বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে স্বীকার করে বা মেনে নিয়ে কখনোই প্রান্তিকজনের ভাবনাকে জানাবোঝার জায়গা তৈরি হয় না। এ জনপদের প্রান্তিক জীবনের নিজস্ব ভাবনার সূত্রসমূহ সব অধিপতি ঝাঁঝকে প্রশ্ন করতে জানে নিজস্ব ভঙ্গিমায়, জানে প্রকৃতির নিরন্তর চলমান অস্তিত্বময়তার সঙ্গে কোনো ধরনের অধিপতি আচরণ না করে এই সম্পর্ক বিরাজমান এবং বিকাশমান করে তুলতে হয়।[৮৭]

৮৫ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি, ১৯৮৯। পৃ. ১১৪।

৮৬ 'খনাবাদী' মানে খনার বচন ও বিজ্ঞান-দর্শনের অনুসারী। বা যারা মিলে নিরন্তর এক অখন্ড খনার বচন নির্মাণ বিনির্মাণ করে চলেছেন। এই প্রত্যয়টি চলতি আলাপের লেখক প্রথম ব্যবহার করেন ১৯৯৬ সনে 'বাংলাদেশে হাইব্রিড বীজের আগ্রাসন ও বীজের রাজনীতি' বিষয়ক একটি লেখায়। লেখাটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুক্তবাতায়ন পাঠচক্রে' পঠিত হয়েছিল।

৮৭ বিস্তারিত জানতে পড়ুন : Partha, Pavel. 2012, 'Climate Calendar: Changes and Challenges' (an eco-feminist analysis on climate change and the local knowledge of rural Bangladesh), this paper was presented in the ``SAARC Festival of Literature 2012", 16-19 March 2012, Lucknow, India. This festival was organized by SAARC, ICCR and Arpana Caur, p.1-15.

এ পর্যায়ে আমরা ফ্রান্সিস বেকনের আরও একটি আলাপ জুড়ে দিচ্ছি। বেকন জানিয়েছেন, আমাদের কেবল বেশিসংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোঁজ করলেই চলবে না। আমাদের সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং তাকে শক্তিশালী করতে হবে। যেমন আমরা আগেই দেখেছি, অস্পষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তেমন কোনো সুফল অর্জন করা যায় না। কেবল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোই সার হয়। তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকলেও শিক্ষণীয় কিছু থাকে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা যখন যৌক্তিক পথ অনুসরণ করে এবং সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন বিজ্ঞান সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি।[৮৮] আমরাও দেখতে পাই খনার বচনের এক দীর্ঘ ঐতিহাসিকতা। চড়াই-উতরাই। খনা বারবার প্রতিষ্ঠিত অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডকে প্রশ্ন করেছেন। খনা বারবার প্রশ্ন করেছেন, কি কর শ্বশুর মতিহীন, কি কর শ্বশুর লেখাজোখা? খনা তাঁর বিজ্ঞান-দর্শনকে এক নিম্নবর্গীয় ময়দান থেকে একটি সংঘবদ্ধ ডিসকোর্সে রূপ দিয়েছেন। আলাপের এ অংশটিতে আমরা একটি খনার বচন হাজির করছি।

খনার একই বচন দেশের নানান অঞ্চলে নানানভাবে বর্ণিত, ভাষা কি বলার ভঙ্গি ও কায়দায় স্থানীয় আমেজ থাকলেও বচনের অর্থ বদলে যায় না। দেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত নিচের বচনটি[৮৯] খেয়াল করুন :

কিতা করঅইন হউর লেখালেখি
মেঘই বুঝঅইন পানির আঁকি।
কোদাল কোপা মেঘের গাও
আড়ি সারি বয় বাও।
কিষান কামলা বান্ধো আইল
আইজ কিংবা অইবো কাইল॥[৯০]
(মৌলভীবাজার অঞ্চল)
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা
মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
এধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
কৃষককে বলোগে বাঁধতে আল

৮৮ উদ্ধৃত হয়েছে ইসলাম, শহীদুল, ২০১৩। *বিজ্ঞানের দর্শন*, পৃ. ৩৬৬।

৮৯ মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে বচনটি সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীমঙ্গলের প্রণতি রায়। এছাড়া অন্যান্য বচনগুলি নওয়াজ, অধ্যাপক আলি, ১৯৮৯, পৃ. ১০-১১ এবং রায়, শ্রী, ১৯৯৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ) থেকে নেয়া।

৯০ সংগ্রহের অঞ্চল : হাকালুকি হাওর অঞ্চল, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

আজ না হয় হবে কাল॥[৯১]
(মৌলভীবাজার অঞ্চল)

কি কর শ্বশুর লেখা জোখা
মেঘেই বুঝব জলের রেখা
মেঘ হয়েছে কোদাল কাটা
বাতাস দিচ্ছে লাটাপাটা।
কি করিস চাষা বাঁধগে আল
আজ না হয় ত হবে কাল।
(রংপুর অঞ্চল)

কোদালে কুড়লে মেঘের গা
এলোমেলো বহে বা।
চাষীকে বলো বাঁধতে আল
আজ না হয় হবে কাল॥
(চট্টগ্রাম অঞ্চল)

কোদলা কোদলা মেঘের গা
এ্যাঝে মাঝে দিচ্ছে ঘা।
কৃষক ভাই বান্ধো আইল
আইজ না হইলে হইব কাইল॥
(নেত্রকোনা অঞ্চল)

কোদালে কুড়ালে মেঘের গা
উল্টাপাল্টা বহে বা।
খনা বলে বাঁধ আল
আজ না হয় বৃষ্টি হবেই কাল॥
(বগুড়া অঞ্চল)

কি কর শ্বশুর লেখাজোখা
মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।

৯১ মহামতি খনা বলেছেন, মেঘের মধ্যেই বৃষ্টির প্রকৃতি বোঝা যায়। যদি মেঘের মধ্যে কোদাল-কোদাল ছোপ ছোপ হয় এবং বাতাস বয়ে যায় তবে বোঝা যায় আজকালের ভেতর বৃষ্টি হবে। এই খনার বচনটি সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রী শান্তি রায় (৮০), সবুজবাগ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, এর কাছ থেকে।

কোদালে কুড়লে মেঘের গা
এধ্যি মধ্যি দিচ্ছে ঘা।
বলগে চাষায় বাঁধতি আল
আজ না হয় হবি কাল।
(যশোর অঞ্চল)

গাইবান্ধার যমুনার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলের মেঘবিজ্ঞান ভাষ্যমতে, যমুনা চরের আসমানে ছয় ধরনের মেঘ দেখা যেত আগে। বোয়ালি মেঘ, কানা মেঘ, হাঁড়িয়া মেঘ, পাইন্যা মেঘ, ঝাঁপাই মেঘ ও কালবৈশাখী মেঘ। গত চল্লিশ বছরে মেঘের এই বৈচিত্র্য ও বিন্যাস বদলে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের তিন দিন থেকে আষাঢ়ের চার দিন টানা সপ্তাহজুড়ে ঝাঁপাই মেঘ জমত আসমানে, আকাশ ধুমা থাকত, ঝিরঝির বৃষ্টি হতো। এখন আর ঝাঁপাই মেঘ দেখাই যায় না। বোয়ালি মেঘ অনেকটাই কোদালি মেঘের মতো। ছোপ ছোপ মেঘ জমে এবং বেশ বৃষ্টি হয়।[৯২] উপরোক্ত খনার বচনটি দেশের নানান অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও এর অর্থ কিন্তু বদলে যায়নি। বিজ্ঞান তাই এমনি এক ভূগোল নিরপেক্ষ সত্য, এটি বস্তুকে কেন্দ্র করে বস্তুকে ঘিরে বস্তুর আদ্যপ্রান্ত ব্যাখ্যা করে। এক অঞ্চলের মানুষ এটি বিশ্বাস করছে, আরেক অঞ্চলের মানুষ এটি বিশ্বাস করছে না তাতে বিজ্ঞানের সত্য ও দর্শনের কোনো কিছু যায় আসে না। বিজ্ঞান জনমত কি গণভোটের ওপর নির্ভর করে না। এটি নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু প্রশ্ন আসে, তাহলে কেন প্রান্তর থেকে প্রান্তরে, এক ভূগোল ছাপিয়ে অন্য ভূগোলের মানুষেরা খনার বিজ্ঞানকে যাপিতজীবনের অংশ করেছে? কেন খনার বিজ্ঞানও কাল থেকে কালে গ্রামবাংলার জনভাষ্যে পরিণত হয়েছে? আর এখানটাতেই খনার বিজ্ঞানের দার্শনিকতার প্রশ্ন। খনার বিজ্ঞান চারপাশের সূত্র ও প্রশ্নকে দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু করেছে। সেখান থেকেই উত্তরণ কি সমাধানের আপন উপায় কি নির্দেশনা খুঁজে পেতে চেয়েছে। প্রক্রিয়া হিসেবে এটি অধিপতি জ্ঞানকাণ্ড ও সব ঔপনিবেশিক ধারাবিরোধী। এখানে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক প্রতিরোধী নিশানা আছে। সেন (২০০৮) তাই 'বাংলার ঐতিহ্যগত

৯২ যমুনার চরাঞ্চলের মেঘবিজ্ঞান সম্পর্কে শিখিয়েছেন প্রবীণ আজিজুল হক। আজিজুল হক (৯৫), কৃষক, মা- ওছিয়ন ও বাবা- হাজী নওশের উদ্দীন। বুলবুলিচরে জন্ম, নদীভাঙ্গনের ফলে রহমতপুর, সেখান থেকে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের কাওয়াবাধা চরে বসবাস করছেন। আজিজুল হকের দাদা বানু শেখ অনেক খনার বচন জানতেন। যমুনা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলের অনেকেরই জীবনে আসামের নিম্নাঞ্চলে বসবাস কি উচ্ছেদ বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। আসামের গোয়ালপাড়া থেকে হয়তো আগের মানুষেরা অনেকেই খনার বচন জেনেছেন, কিন্তু এখন দিনে দিনে চর্চার অভাবের ফলে নতুন শিশুরা এসব ভুলে যাচ্ছে বলে আজিজুলের পর্যবেক্ষণ। ১৭-২৩ জুলাই ২০১২।

কৃষিতে খনার বচনের গুরুত্ব' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে বলেন, 'বাংলা অঞ্চলের কৃষিকে খনার বচন অনেক বেশি প্রভাবিত ও প্রসারিত করেছে। খনার বচন এ অঞ্চলের কৃষি জলবায়ু, ভূমি, মাটি, আবহাওয়া ও কৃষকের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার অনেক কাছাকাছি'।[৯৩]

অনেকেই বলে থাকেন 'খনার বচন' হচ্ছে স্থানীয় বা লোকায়ত জ্ঞান। জ্ঞানপাটাতনের এই রাজনীতি মাথায় রেখেই আমরা আলাপের এ অংশে ঢুকছি। পার্থ (২০১০) বান্দরবানের ম্রো জাতির 'ইঁদুর বন্যা ও জুমবিজ্ঞান'বিষয়ক এক গবেষণায় অধিপতি ও প্রান্তিক জ্ঞানকাঠামোর এ বিবাদকে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনিক জ্ঞানকাণ্ডসমূহ স্থানীয় জ্ঞানকে প্রান্তিক করে তোলে আর 'বিজ্ঞানের সত্য' হিসেবে তাকে মেনে নিতে ভিন্ন ভিন্নমাত্রার বলপ্রয়োগ তৈরি করে।[৯৪] গির্টজ (১৯৯২) যদিও 'স্থানীয় জ্ঞান' নিয়ে তাঁর এক বিখ্যাত আলাপে জানান, 'স্থানীয়' ধারণাটি আপাদমস্তক একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়। সময় এবং স্থানভেদে এটি বদলে যায়।[৯৫] জ্ঞানের সমসাময়িক কালের সংজ্ঞায় বলা হয়, 'বিজ্ঞান' ও 'স্থানীয় জ্ঞান' পরস্পর নির্ভরশীল, কারণ উভয়েই বিজ্ঞানের সত্যকে প্রকাশ করে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে। বলা হয়, ঐতিহ্যগত জ্ঞান অনেকখানি স্থানীয় জ্ঞান কি জনবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা কোনো ঐতিহাসিক বা সামাজিক জায়গাকে নির্দেশ করে।[৯৬]

৯৩ Sen, D. (2008): *Impact of Khana's Vachan on Traditional Agriculture in Bengal*, p 211-224.

৯৪ দেখুন : পার্থ, পাভেল। ২০১০। 'ইঁদুর-বন্যা' এবং বান্দরবানের ম্রোদের জুমবিজ্ঞান : অধিপতি ও প্রান্তিক জ্ঞান কাঠামোর ঐতিহাসিক বিরোধ' বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক আলাপ, সুকান্ত সেন সম্পাদিত লোকায়ত জ্ঞান ও উন্নয়ন বিষয়ক ষান্মাসিক জার্নাল *তৃণমূল উদ্যোগ* থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, ৭মবর্ষ : ১মসংখ্যা : জুন ২০১০, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ৯-৬২ (লেখাটির শেষে লেখক জানিয়েছেন, 'এই মূল লেখাটির রচনাকাল মার্চ ২০০৮। অবশ্য এর আগে মানে ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালের ভেতর ইঁদুর-বন্যা বিষয়ে 'দৈনিক সমকাল' এবং 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় আমি কলাম লিখেছিলাম। লেখাটি শেষ করার পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়সহ অনেককেই আমি ই-মেইলে লেখাটি পাঠাই। পরবর্তীতে লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় রাঙামাটির জুম ঈসথেটিক কাউন্সিলের (জাক) বাৎসরিক সংকলন *তৈথাঁয়*। *তৈথাঁয়* লেখাটি প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালের এপ্রিলে, বৈসুক-বিজু-সাংগ্রাই উপলক্ষ্যে বিশেষ এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে দীপায়ন খীসা সম্পাদিত এবং হিল লিটারেচার প্রটেকশন ফোরাম- ঢাকা থেকে প্রকাশিত *মাওরুম* পত্রিকার ২০০৮ সালের সংখ্যায় লেখাটি পুর্নমূদ্রিত হয়।')

৯৫ Geertz, Clifford. 1992, 'Local Knowledge and its Limits', *The Yale Journal of Criticism*, Volume-5, Number-2, Yale University, p.129.

৯৬ Philip, K.S. 2001, 'Indigenous Knowledge: Science and Technology Studies', In : *Indigenous Knowledge and Technology, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ISBN: 0-08-043076-7, p.7292-7297.

সাম্প্রতিক প্রাণপ্রযুক্তিবিদেরা মনে করেন, প্রকৃতি-সম্পর্কিত স্থানীয় জ্ঞানই ভবিষ্যতের চিকিৎসা কি ঔষধশাস্ত্রের গবেষণার দ্বার উন্মোচনের পথ। কিন্তু এই চিন্তার সঙ্গে বিশ্বায়িত দুনিয়ার বাণিজ্য রাজনীতি-সম্পর্কিত, যে জায়গা থেকে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গগুলো বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত। প্রাকৃতিক সম্পদ-সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৯৭] বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ জনগণের প্রতিদিনের টিকে থাকার জন্য স্থানীয় জ্ঞান দৃশ্যত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কি কৃষি, কি খাদ্যনিরাপত্তা কি প্রতিদেনের জীবনসংগ্রামে স্থানীয় জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ জীবন কৌশল।[৯৮] স্থানীয় জ্ঞানকে 'অবৈজ্ঞানিক' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও ম্যাকিনসন ও নোস্তাদ মৎস্যসম্পদ-সম্পর্কিত একটি গবেষণার ভেতর দিয়ে দেখিয়েছেন, মাছ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের' চেয়েও। তারা তাই উভয়জ্ঞানের সম্মিলনকে মৎস্যসম্পদ সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।[৯৯] স্থানীয় জ্ঞান রাষ্ট্রীয় রাজনীতির আইন, শাসন ও ক্ষমতার ঘেরাটোপে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতার সীমানায় ঝুলে থাকে। স্থানীয় জ্ঞান কি ব্যক্তিগত না সামষ্টিক এ তর্কও রাষ্ট্রীয় চোখ রাঙানির বাইরে নয়।[১০০] স্থানীয় জ্ঞানের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নে রাষ্ট্র কখনোই নিম্নবর্গের পক্ষে দাঁড়ায় না, হাজির করে 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের' দাপট। ইতিহাস থেকে ইতিহাসে আমরা যেমন দেখতে পাই খনার পক্ষে পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানকাণ্ড দাঁড়াচ্ছে না, কিন্তু বারবার সত্য হয়ে উঠছে খনার বিজ্ঞান।

সংস্কৃতির বিবর্তন ও অন্যান্য রচনা পুস্তকে পিট-রিভার্স (১৯০৬) মানুষের ইতিহাসে সংস্কৃতির বিবর্তনকে আলোচনা করতে গিয়ে বস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানের আশ্রয় নিয়েছেন। সে সময়কার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষার ধরন, শ্রেণীবিন্যাস ও তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাই পিট-রিভার্সের সাংস্কৃতিক

৯৭ Warburton, H. and Martin, A. 1999, 'Local People's Knowledge in Natural Resources Research', *Socio-economic Methodologies for Natural Resources Research,* Chatham, UK: Natural Resources Institute.

৯৮ Beckford, Clinton and Barker, David. 2007, 'The Role and Value of Local Knowledge in Jamaican Agriculture: Adaptation and Change in Small-scale Farming', *The Geographical Journal*, Vol.173, No. 2, June 2007, p. 118–128.

৯৯ Mackinson, Steven and Nøttestad, Leif. 'Combining Local and Scientific Knowledge', *Reviews in Fish Biology and Fisheries, 8(4):481-490.*

১০০ স্থানীয় জ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় রাজনীতির দ্বন্দ্বকে বুঝতে একটি ঐতিহাসিক আইনী লড়াই সম্পর্কে জানতে দেখুন : Stern, Simon. 2001-2002, 'Note on Between Local Knowledge and National Politics: Debating Rationales for Jury Nullification after Bushell's Case', *Yale Law Journal*, Volume-111, p. 1815-1854.

বিবর্তনের আলোচনায় জায়গা পায়।[১০১] পিট-রিভার্স (১৯০৬) তাঁর বইতে 'সংঘবদ্ধ সাধারণ ধারণাকে' বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিজ্ঞান হিসেবে পরিচয়জ্ঞাপক 'সাধারণ জ্ঞান' উন্নয়নের মূলনীতি হলো নিরীক্ষামূলক, শ্রেণীবদ্ধ বা তুলনামূলক ও তাত্ত্বিক- এ তিনটি ধাপ অতিক্রম করা। বর্হিপ্রকৃতির সঙ্গে কর্মসম্বন্ধযুক্ত যে কেউ তাঁর বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে একত্র করে নিরীক্ষামূলক ধাপটি অতিক্রম করতে পারেন।[১০২] কোনো জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত কি না তা এ তিনটি ধাপের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জ্ঞানের বাস্তবিক রূপ ও প্রয়োগ এবং নির্দিষ্ট চিন্তাধারা ও জনসম্মতি। বিজ্ঞানের এই পুরো ধারাটিই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাহিত হয় এবং প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান হয়ে ওঠে। খনার ইতিহাস আমাদের সামনে বিজ্ঞানের ধাপগুলো বেশি স্পষ্ট করে তোলে। নিরীক্ষাপ্রবণতা থেকে শুরু করে তাঁর তুলনামূলক কর্মপ্রক্রিয়া এবং একটি তাত্ত্বিক অবস্থান এবং জনসম্মতি আরও এসব ধাপের ভেতর দিয়েই খনার বচনগুলো আবর্তিত হয়েছে এবং উৎপাদন করেছে বিজ্ঞানের সত্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের এক নিয়ত দর্শন। আর এখান থেকেই খনার বিজ্ঞান দর্শনের ধারাবাহিকতা রক্তাক্ত হয়ে সত্য প্রকাশে নির্ভীক রয়েছে এখনো গ্রামীণ নিম্নবর্গের যাপিতজীবনে, মনস্তত্ত্বে কি স্মৃতিকাতরতায়।

উদ্ধত উপনিবেশ ও সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার

চৈতে গিমা তিতা
বৈশাখে নালিতা
জ্যৈষ্ঠে অমৃতফল
আষাঢ়ে খৈ
শাওনে দৈ
কার্তিকে খৈলসার ঝোল
অঘ্রানে ওল
পৌষে কাঞ্জি
মাঘে তেল
ফাল্গুনে পাকা বেল।

১০১ আরো জানতে দেখতে পারেন : Pitt-Rivers, Lt. Gen A. Lane. 1906, *The Evolution of Culture and Other Essays*, edited by J. L. Myres, M.A., Oxford at the Clarendon Press.

১০২ This lecture delivered at the Royal Institution of Great Britain on Friday, May 28, 1875, and published in Proc. Boy. Inst., vol. vii. pp. 496-520, PI. i-iv. (Pitt-Rivers, Lt. Gen A. Lane. 1906, *The Evolution of Culture and Other Essays*, edited by J. L. Myres, M.A., Oxford at the Clarendon Press এই বই থেকে এটি উল্লেখ করা হয়েছে)।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের বাঙালি সমাজে 'টিকটিকি' গোয়েন্দা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। খনার কাহিনিমতে, খনার জিব কেটে ফেলার পর তা টিকটিকি খেয়ে ফেলে এবং টিকটিকি সেই বচনজ্ঞান লাভ করে। এরপর থেকে এ রকম বিশ্বাসও প্রচলিত যে কেউ কোনো কিছু সম্পর্কে কথা জানার সময় টিকটিকি 'টিকটিক' শব্দ করলে তা সত্যে পরিণত হয়। অধিপতি মনোজগতে 'টিকটিকির প্রবেশাধিকার' যেমন সংরক্ষিত ও দূরে ঠেলে রাখার বিষয়, ঠিক তেমনি খনার জ্ঞানপ্রক্রিয়া যা টিকটিকিতে স্থানান্তরিত হয়েছে তা-ও তথাকথিত 'মূলধারায়' দূরে সরিয়ে রাখার বিষয়। খনার এ আখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, জ্ঞান-প্রক্রিয়া কখনো ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন হয় না। এক রূপ থেকে অন্য রূপে, এক শরীর থেকে অন্য শরীরে বাহিত হয়। বস্তুর এই রূপান্তরধর্মিতা জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রবাহধারার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তখন সেখান থেকেও আমাদের খনার বিজ্ঞান-দর্শনের বস্তুবাদী ময়দান আন্দাজ করা জরুরি। জ্ঞান সত্য, অবিনশ্বর। এটি মানুষ থেকে টিকটিকিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। আবার টিকটিকি থেকেও মানুষে স্থানান্তরিত হতে পারে। মূল বিষয় হচ্ছে একে কীভাবে কী প্রক্রিয়ায় কেন এবং কাদের জন্য ধারণ ও বহন করা হচ্ছে। কিন্তু কেন খনার বচন এখনো অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে 'অচ্ছুত' এবং প্রান্তিক? কেন খনার বিজ্ঞান-দর্শন রাষ্ট্রের বিজ্ঞান-দর্শন হয়ে ওঠে না? আলাপের এ পর্যায়ে ক্ষমতার রাজনীতি ও অপরত্বের প্রশ্নহীন প্রক্রিয়াগুলো আমাদের যুক্ত করা জরুরি।

সামন্ত (২০০২) তাঁর 'ইতিহাসের অপরত্ব কিংবা অপরত্বের ইতিহাস' লেখায় উল্লেখ করেছেন, এ দেশের ইতিহাসে অপরত্বের নানা দিক, নানা দিগন্ত। এত রকমের অপরত্ব মানুষের ইতিহাসে, মানুষের অন্তর্গত গভীরে খেলা করে যে তার হদিস পেতে হয়রান হতে হয়। পাশাপাশি সামন্ত আরও উল্লেখ করেন, উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মঞ্চে নিম্নবর্গ অন্যতম কুশীলব ছিল এ কথা সত্যি কিন্তু আরও বড় সত্যি হলো বহু আন্দোলনে নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের দাসত্ব করেনি। নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনা আছে, নিজস্ব স্বার্থ আছে, আছে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন। তার মানে নিম্নবর্গের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে।[১০৩] নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনাগুলোই খনার ভেতর দিয়ে একটি যৌক্তিক আদল ও রূপ পেয়েছে। খনার যে শ্রেণী ইতিহাস আমরা পাই, সেখানে তাঁর কাছে নিম্নবর্গের এই দীক্ষা ও আওয়াজ আয়ত্ত করা দুরূহ। কারণ, কেউ-ই খনাকে তাঁর বচনভিন্ন তাঁর

১০৩ সামন্ত, অরবিন্দ। ২০০২, 'ইতিহাসের অপরত্ব কিংবা অপরত্বের ইতিহাস, নিবন্ধটি নেয়া হয়েছে সমাজমনস্ক পোস্টমডার্ন সাহিত্যপত্র *হাওয়া ৪৯*- এর 'অপর' সংখ্যা থেকে, এটি সম্পাদনা করেছেন অরবিন্দ প্রধান, হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০, পৃ. ৮৬-৯০।

'রাজনৈতিক লড়াইকে' আমাদের সামনে উপস্থাপন করেননি। খনা শ্রেণীখারিজের লড়াই করেছেন। তিনি বারবার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপদ্ধতি ও বিদ্যায়তনিক বলপ্রয়োগকে প্রশ্ন করেছেন। তিনি প্রবল পুরুষতন্ত্র ও পরিবারকাঠামোর অন্যায় শাসনকে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সত্য দিয়ে প্রশ্ন করেছেন। খনার রণনীতি ও রণকৌশল দুর্দান্ত। অহিংস। প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ বরাহমিহির যখন নিজ পুত্রের আয়ু এক বছর গণনা করেন, প্রচলিত নিয়মানুসারে এটিই বিশ্বাস করার কথা। কিন্তু খনা তা বিশ্বাস করেননি। কারণ, মিহিরের বেঁচে থাকার জীবনকালের সত্য তাকে বাধ্য করেছিল প্রতিষ্ঠিত গণনা-প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন করতে। খনা তাই বারবার গণনার সত্য ব্যাকরণকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন এবং গণনার সত্য উপায়টি খুঁজে বের করেছেন। পুস্তকি গরিমা আর গ্রন্থগিরিকে খনা তুমুলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁর বিজ্ঞান-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। তাই খনা বলেছেন, মেঘেই দেখো জলের রেখা। খনা মেঘবিজ্ঞানের সূত্র মেঘের ভেতরেই নিহিত এ উপলব্ধিটি ভেতরে ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মূলত খনা প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ও সূত্রকে তাঁর বিজ্ঞান-দর্শন হিসেবে হাজির করেছেন। আর এসব কারণেই খনাকে ইতিহাস থেকে ইতিহাসে অধিপতি চোখ রাঙানি 'অপর' ও প্রান্তিক করে রেখেছে। তাই এখন পর্যন্ত খনার বচনের কোনো পূর্ণাঙ্গ দলিল আমাদের নাগালে নেই। কেবল গ্রামীণ নিম্নবর্গের মৌখিক সংরক্ষণ-প্রক্রিয়ার ওপর যাবতীয় দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমরা 'খনার বচন' আমাদের ইতিহাস কি আমাদের ঐতিহ্য বলে পাশ কাটিয়ে যাই। খনার বচনকে ঘিরে এই ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বটি থেকেই আমরা অধিপতি জ্ঞানকাণ্ড ও নিম্নবর্গের বিজ্ঞানের সত্যকে প্রান্তিকীকরণের ইতিহাসকে বুঝতে পারি।

জানা যায়, ১৮৭২ সালে তিন হাজার বাংলা প্রবাদ প্রবচনের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে তৎকালীন ইংরেজ শাসক ও পণ্ডিতেরা বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহে এত আগ্রহী হলেও খনার বচন ও ডাকের কথা সংগ্রহের প্রতি তাঁদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় নি।[১০৪] ১৮৭০-এর দিকে জমিদারি শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের রেশ ধরে প্রশাসনিক প্রয়োজনে সরকার এ দেশের লোকদের গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য দেশের কিংবদন্তি ও প্রবাদ-প্রবচনাদি সংগ্রহ করায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৮৭২ সালে গণজীবনে প্রচলিত কাহিনি নিয়ে সরকারিভাবে প্রকাশিত হয় *ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল*। হাজার খানেক বাংলা প্রবাদ সংকলন প্রকাশ করেন উইলিয়াম মর্টন ১৮৩২ সালে। ১৮৯৩ সালে দ্বারকানাথ বসুর *প্রবাদ পুস্তক* এবং ১৮৯৮ সালে মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবাদ পদ্মিনী*

১০৪ নওয়াজ, অধ্যাপক আলি, ১৯৮৯। ঢাকা, পৃ. ১৪৮।

প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ থেকে *বামাবোধিনী, বঙ্গবাসী, সৌরভ* পত্রপত্রিকায় বহু প্রবাদ প্রবচন প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৯৩ সালে নিম্নবর্গের কৃষি প্রবচনের একটি বই প্রকাশ করেন। নওয়াজ (১৯৮৯)-এর লেখা থেকে জানা যায়, ইংরেজ প্রশাসক ও পণ্ডিতেরা যেভাবে এ দেশের লোকসাহিত্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছিলেন, তেমনি যদি তাঁরা লোকসাহিত্যের খনার বচনের শাখাটির প্রতিও নজর দিতেন তবে হয়তো আরও অধিক খনার বচন, ডাকের কথা, তথা কৃষি প্রবাদ-প্রবচনাদি রক্ষিত কিংবা অবিকৃতভাবে রক্ষিত হতে পারত। এ দেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের ঐতিহ্যশীল কৃষির গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে এবং সমাজকাঠামোও দ্রুত বদলাতে থাকে। কৃষিই ছিল এ দেশের মেরুদণ্ড, আজও। একে চূর্ণ করাই শাসকদের নীতি ছিল। ফলে মানুষ খনার বচন ইত্যাদি থেকে দ্রুত বিস্মৃত হতে থাকে। একটি জাতিকে আত্মবিস্মৃত করাই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১০৫]

সচরাচর আমরা গ্রামীণ নিম্নবর্গের সৃষ্টি দুনিয়াকে বিজ্ঞান ও দর্শনের ময়দান থেকে তাড়িয়ে দিই। তাকে ইতিহাসের এক পরাজিত ও নিষ্ক্রিয় অনিবার্য দর্শকে পরিণত করি। এ প্রসঙ্গে ভদ্র (১৯৯৪) তাঁর *ইমান ও নিশান* গ্রন্থে বলেন, "কৃষকদের পিছিয়ে থাকা মানসিকতা" বেশ চালু তত্ত্ব। বাইরে থেকে আসা যোজকেরাই কৃষক আন্দোলনের প্রকৃত রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে কার্যকর করে। তবু খটকা থেকেই যায়। প্রথমত, এই এলাকাভিত্তিক ছোট ছোট বিদ্রোহগুলো সমাজের নানা ক্ষেত্রে আধিপত্য ও পরাবশ্যতার সংঘাতকে চিহ্নিত করে। ওইসব বিন্দুকে না চিনলে আমরা ক্ষমতার পুরো ইতিহাস ধরতেই পারব না।[১০৬] কিন্তু খনা আমাদের ইতিহাসের এক সক্রিয় নির্মাতা। খনার সময়কার এবং পরবর্তী সময়ে খনার বচনের প্রান্তিকরণের ঐতিহাসিকতা বুঝতে আমাদের সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্ক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক দেনদরবারগুলোও আলাপে টেনে আনা জরুরি।

খনার বচনপাঠে এটি স্পষ্ট হয়, খনা এক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভেতরেই নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। প্রতিবেশীয় সম্পর্ককে যাপিতজীবনের নানান সমস্যা ও উত্তরণের নিরিখে বারবার বিজ্ঞান সত্যে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে আমরা দেখতে পাই বারবার কারিগরি কি বাণিজ্যিক প্রযুক্তিকে আমাদের সামনে বিজ্ঞান হিসেবে হাজির করা হয়। সেই বৈষম্যের গণিতই শিশুবেলায় আমাদের রচনা পাঠ করায় 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ?' বিজ্ঞান কোনোভাবেই

১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
১০৬ দেখুন : ভদ্র, গৌতম। ১৯৯৪, *ইমান ও নিশান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ১৪।

অভিশাপ কি আশীর্বাদ সেই প্রশ্নের কাছাকাছি নয়। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, বিজ্ঞান সত্য, বিজ্ঞান প্রমাণিত। নিম্নবর্গের এই জ্ঞানধারা ও দর্শনের সঙ্গে অধিপতি পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের প্রবল তফাৎ। কারণ, অধিপতি জ্ঞানকাণ্ডে মূলত টিকে আছে বিভাজন, চোখ রাঙানি আর নিয়ন্ত্রণের শর্তকে জিইয়ে রেখে। ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিষয়ক একটি লেখায় মাজ্জোচ্চি (২০০৬) জানান, মানুষ ও প্রকৃতির মিথোজীবী সম্পর্ককে বিবৃত করেই ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উন্নয়নধারা বহমান। কিন্তু পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অধিকাংশ সময়ই স্থানীয় ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে মূল্যায়ন করে না এবং এর জায়গাকে প্রান্তিক করে তোলে।[১০৭] কালভেট-মির ও অন্যান্যরা (২০০৮) পশ্চিমা চিকিৎসাজ্ঞান ও ঐতিহ্যগত চিকিৎসাজ্ঞানের ভেতর দূরত্ব ও সম্পর্কবিষয়ক এক লেখায় জানান, 'ঐতিহ্যগত চিকিৎসাজ্ঞানকে 'সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী' কিন্তু পশ্চিমা চিকিৎসাজ্ঞানের সঙ্গে বিস্তর পার্থক্যপূর্ণ মনে করেন পশ্চিমা চিকিৎসকেরা। পশ্চিমা চিকিৎসাজ্ঞানের ক্ষমতার জায়গায় ঐতিহ্যগত চিকিৎসাজ্ঞানের প্রান্তিকতা স্পষ্ট, কিন্তু একটি সফল চিকিৎসাধারার জন্য উভয়জ্ঞানের ভেতর সমন্বয় প্রয়োজন'।[১০৮] পশ্চিমা এই মনস্তত্ত্বই খনার বচন সংগ্রহ ও বিকাশে উপনিবেশকাল থেকে নিয়ে আজকের এই নয়া করপোরেট ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় কোনো সাড়া কি তৎপরতা দেখায় না।

প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণের নানান মাত্রাকে আমরা হরহামেশা আড়াল করে ফেলি। সমাজে উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ কি যৌনবাদের মতো বিভাজন ও কর্তৃত্বগুলো অনেক সময়ই মানুষের শরীর ও মনকে ঘিরে আবর্তিত, যার বৈষম্যের গণ্ডি তৈরি হয় ক্ষমতার সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে।[১০৯] প্রকৃতির ওপর অধিপতি পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণ, দখল ও কর্তৃত্বকে ব্যাখা করে প্লামউড (১৯৯৩) তাঁর আলোচিত পুস্তক *ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য মাস্টারি অব নেচার* -এর ভেতর দিয়ে পশ্চিমা বলপ্রয়োগকে খারিজ করতে সকলকে সত্যিকারের নতুন গল্প, নয়া পাণ্ডুলিপি ও নয়া মঞ্চ নির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন।[১১০] পশ্চিমা দুনিয়ায় আধিপত্যের এই ধরন সুযোগের ফলাফল ও সুনির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক

১০৭ Mazzocchi, Fulvio. 2006, 'Western Science and Traditional Knowledge', *EMBO reports*, V-7, N-5, European Molecular Biology Organization, p. 463-466.

১০৮ Calvet-Mir, Laura; Reyes-García, Victoria , and Tanner, Susan. 2008, 'Is There a Divide between Local Medicinal Knowledge and Western Medicine? A Case Study Among Native Amazonians in Bolivia', *J Ethnobiol Ethnomed*. 2008; 4: 18. Published online 2008 August 18. doi: 10.1186/1746-4269-4-18.

১০৯ এ বিষয়টি আরো জানতে দেখতে পারেন : Plumwood, Val. 1993, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London and NY.

১১০ Plumwood, Val. 1993. p.195-196.

পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত, কিছুটা আবার প্রয়োজনের তাগিদে পরম্পরা হিসেবে চলমান এবং বহুপাক্ষিক। আবার কখনো তা 'আত্ম' ও 'অপর' এবং 'কারণ' ও 'প্রকৃতির' ভেতর নিয়ন্ত্রণের দর্শনের সঙ্গেও সম্পর্কিত। পশ্চিমা এই বৈষম্যের চিন্তাধারায় তাই দেখা যায়, প্রকৃতি চিহ্নিত হয় এক 'নিষ্ক্রিয়', 'অপ্রভাবক' ও 'বিষয়হীন' চিন্তা হিসেবে। অপরদিকে 'পরিবেশকে' দেখা হয় মূলত পশ্চিমা ধলা চামড়ার বিশেষজ্ঞ পুরুষ কি উদ্যোক্তাদের অর্জন, ফলাফল, কারণ ও সংস্কৃতি হিসেবে।[১১১] মিলস (১৯৯১) প্রকৃতির ওপর আধিপত্যবিষয়ক তাঁর এক তাত্ত্বিক আলাপে উল্লেখ করেছেন, 'মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি' এ চিন্তাধারা প্রকৃতি ও ইতিহাসের চলমান সম্পর্ককে বুঝতে একধরনের 'মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি'। এভাবে বুঝতে গেলে আমরা প্রকৃতি ও ইতিহাসের বস্তুবাদী সম্পর্ক এবং মানুষ প্রকৃতির অংশ এ বিবেচনাকে হরহামেশাই হারিয়ে ফেলতে থাকি'।[১১২] খনার বচন কি খনার আখ্যানে আমরা এই প্রকৃতি-বিবর্জিত মানুষকেন্দ্রিকতার কোনো প্রবল প্রতাপ কি দোর্দণ্ড দেখতে পাই না। কারণ, খনার বচন উৎসারিত হয়েছে বস্তুবাদী ঐতিহাসিকতা থেকে, কোনো বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ থেকে নয়। খনার বচন তাই প্রতিবেশঘনিষ্ঠ জ্ঞান-প্রক্রিয়া।

প্রশ্ন আসে, তাহলে খনার বচনের বিজ্ঞান-দর্শনকে কেন আমরা প্রবলভাবে গ্রহণ করলাম না? ইতিহাস থেকে ইতিহাসে আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য পুড়িয়ে মারা হয়েছে, খুন করা হয়েছে। তার পরও সত্য উল্টে যায়নি। আমরা হয়তো খনার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারিনি, কিন্তু খনার বিজ্ঞানের সত্যকেও আমরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ করে দিতে পারছি না। কারণ, বিজ্ঞানের সত্যকে রুখে দেওয়া অসম্ভব। খনার বচনকে দাবিয়ে রাখার ঔপনিবেশিক স্বার্থ ছিল বাংলার গ্রামীণ জগৎ থেকে কৃষির আপন রীতি ও দার্শনিক ভিত্তি গায়েব করে দেওয়া, যাতে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাগিরি আরও সক্রিয় ও বৈধ হতে পারে। পরবর্তী সময়গুলোতে খনার বচনের রাষ্ট্রীয় অস্বীকৃতি এবং সংরক্ষিত প্রবেশাধিকারও নিম্নবর্গের আপন কৃষি দুনিয়াকে গায়েব করার তাগিদেই। অধিপতি বিদ্যায়তনিক জ্ঞানকাণ্ডে যা তথাকথিত 'আধুনিক কৃষির উন্নয়ন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। খনা লাউ মাচায় ছাই ও মাছ ধোয়ার পানি এবং বাঁশঝাড়ে ধানের তুষ ছিটাতে বলেছেন। কিন্তু আমাদের চলমান তথাকথিত

১১১ এ বিষয়ে আরো জানতে দেখুন : Plumwood, Val. 1993. p.4.

১১২ Mills, Patricia Jagentowicz. 1991, 'Feminism and Ecology: On the Domination of Nature', In : *Hypatia* vol. 6, no. 1 (Spring 1991), p-162.

আধুনিক কৃষি[১১৩] আমাদের জমিন থেকে খাবারের থালা কি বিছানা পর্যন্ত মারাত্মক রাসায়নিক বিষে ভরিয়ে রেখেছে আর বাস্তুসংস্থান ফালি ফালি করে চালু রেখেছে 'খাদ্য উৎপাদনের এক অমীমাংসিত কারবার'। এসব বিবেচনায় খনার বচন আমাদের সামনে তাই প্রতিবেশ-রাজনীতির এক লড়াকু ডিসকোর্সকেও হাজির করে আপন কায়দায়।

গ্রিনবার্গ ও পার্কের (১৯৯৪) একটি যৌথ লেখায় 'প্রতিবেশ রাজনীতি' প্রত্যয়টি প্রথম চোখে পড়ে।[১১৪] মানুষ তাঁর সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে কীভাবে প্রতিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাই 'সাংস্কৃতিক প্রতিবেশবিজ্ঞানের' অধ্যয়নসূত্র।[১১৫] খনার জন্ম কি বেড়ে ওঠা সিংহল কি উজ্জয়িনী কি চন্দ্রকেতুর গড় যেখানেই হোক না কেন, খনা প্রতিবেশের সঙ্গে জীবনসংস্কৃতির সম্পর্ককে তাঁর অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। খনা কিন্তু স্ট্রবেরি কি ড্রাগনফ্রুট চাষ বা একাশিয়া কি ইউক্যালিপটাস গাছের উন্নয়ন কি তেলাপিয়া কি সিলভারকার্পের বৃদ্ধিবিষয়ক কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দেননি। কারণ, খনার বেড়ে ওঠা ও শিখন সীমানার চারধারজুড়ে এসবের কোনো উপস্থিতি ছিল না। মানে খনার বচন দাঁড়িয়েছে অস্তিত্বময় বস্তুকে কেন্দ্র করেই। কোনো অনস্তিত্বশীল অচিন যুক্তিহীনতার ভেতর দিয়ে নয়। বলা হয়ে থাকে, দুনিয়াব্যাপী নারীরা প্রতিবেশীয় সমস্যা মোকাবিলায় পুরুষের চাইতেও বেশি জড়িত ও ঘনিষ্ঠ।[১১৬] প্রকৃতির ওপর

১১৩ এ ক্ষেত্রে অবশ্য রাষ্ট্রের 'সবুজ বিপ্লব' মানসিকতা কাজ করে বেশি। ১৯৬০ এর দশকে অধিক ফসল ফলানোর নাম করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশে মাটির তলার জল যন্ত্র দিয়ে টেনে তুলে, রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহার করে এক তথাকথিত উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত প্রবর্তন করার ভেতর দিয়ে যে রাসায়নিক কৃষি বাণিজ্যের সূচনা হয় তাই সবুজ বিপ্লব। যে 'বিপ্লবের মাধ্যমে' বহুজাতিক কোম্পানির কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে আর নিশ্চিহ্ন হয়েছে কৃষক-জুমিয়ার ঐতিহাসিক কৃষি ও জুমপ্রাণবৈচিত্র্যের অধিকার। আর এটিই এখন 'আধুনিক কৃষি'। 'আধুনিকতার রাজনীতি' বিষয়ে দক্ষিণের গরিব দেশের নিম্নবর্গ হিসেবে গভীর যাতনা উপনিবেশিক ক্ষত নিয়ে আমরা এখনও চলতে ফিরতে বাধ্য হচ্ছি। 'আধুনিকতার' নামে ক্ষমতার বলপ্রয়োগকে এভাবে মেনে নেয়াকেই হয়তো আন্তোনিও গ্রামসি 'হেজিমনি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

১১৪ প্রতিবেশের সাথে সম্পর্কিত রাজনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ক্ষমতার সম্পর্ক ও ধরণকে ব্যাখ্যা করে তাঁরা এই প্রত্যয়টি প্রস্তাব করেন। কিভাবে 'ডিপ-ইকোলজি' ও 'ইকো সোশালিজম' থেকে এই চিন্তাপদ্ধতির জায়গা আলাদা সেটিও তারা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আরো জানতে দেখুন : Greenberg, James B. and Park, Thomas K. 1994, 'Political Ecology', *Journal of Political Ecology*, Volume-1.

১১৫ বিষয়টি আরো জানতে হলে পড়ুন : Mark Q. Sutton and E . N . Anderson. 2010, *Introduction to Cultural Ecology*, Second Edition, Altamira Press.

১১৬ d'Eaubonne, Frangoise. 2000, 'Feminism - Ecology: Revolution or Mutation?', In: *Ethics and the Environment*, 4(2):1 75-1 77, Copyright © 2000 Elsevier Science Inc.

এলাপাতাড়ি নিয়ন্ত্রণ ও অবিচারকে পুরুষতান্ত্রিক অন্যায় হিসেবেই দেখা হয়। প্রতিবেশ ও নারীর সম্পর্ককে রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করে যেসব বৈশ্বিক বাহাস চলছে, তা যেন খনার আখ্যান ও অনিবার্য পরিণতিরই তাত্ত্বিক ময়দান। মেলর (১৯৯৭) নারীবাদ ও প্রতিবেশের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর এক দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলাপে প্রতিবেশ নারীবাদের প্রধান দুটি ধারাকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি ধারা, যা প্রকৃতির সঙ্গে নারীর র‍্যাডিকেল, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে এবং নারী ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতাকে তুলে ধরে। অপর ধারাটি অনেকটাই কাঠামোবাদী এবং মার্ক্সীয়, যা সমস্যার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও সমাধানের ইশারা দেয়। মেলর বিশুদ্ধ র‍্যাডিকেল প্রতিবেশবাদীদের মতো চিন্তা না করে বিষয়ের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক ও সংঘাতকে বুঝতে চেয়েছেন এবং সমস্যাকে ধারণ করার জন্য নিজস্ব ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন, যা বিদ্যমান সমস্যা মোকাবিলায় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককেই মজবুত করে।[১১৭] প্রতিবেশ-নারীবাদী লেখক কারেন (১৯৯৩) তাঁর লেখায় নারী ও প্রকৃতির আট ধরনের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন। এসব সম্পর্ক কখনো প্রতিযোগিতামূলক, কখনো সহযোগিতামূলক কি আন্তরিক কখনোবা সম্মতিমূলক।[১১৮] খনার বচনকে খনার বচন করে তোলার ক্ষেত্রে খনার দুর্বিনীত লড়াইয়ের কথা স্মরণ করি আসুন। রাক্ষসপুরী থেকে রাজপুরী। কোনোখানেই খনার স্বাধীন উপস্থিতি ছিল না। প্রতিটি পদক্ষেপই তাঁকে শরীর ও মগজ দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। জিব কাটার আগে খনা তাঁর বচনসমূহ উচ্চারণ করেন। খনা-আখ্যানের এ জায়গাটি হয়তো প্রতীকী কিন্তু জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার ব্যাকরণ জিইয়ে রাখতে জরুরি। খনা তাঁর শারীরিক মৃত্যুকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞান-দর্শনের মৃত্যুকে মেনে নেননি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাই তিনি প্রকৃতি ও যাপিতজীবন থেকে আহরিত জ্ঞানপ্রবাহ বাঁচাতে তাঁর বচনসমূহের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন আসমান থেকে পাতালে, মানুষ থেকে টিকটিকিতে, প্রকৃতির মাঝে, বস্তুর অবিনশ্বরতায়। কিন্তু খনার মৃত্যুর পর আমরা দেখতে পাই অধিপতি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের গণিত বদলেছে, এক উপনিবেশ থেকে আরেক উপনিবেশকালে প্রবেশ করতে হয়েছে।

নিম্নবর্গের জ্ঞানপ্রবাহের বিজ্ঞান ও দর্শনকে পাত্তা না দিয়ে তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের নামে' ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে 'বহুজাতিক কোম্পানিনিয়ন্ত্রিত

১১৭ দেখুন : Mellor, Mary. 1997, *Feminism & Ecology*, New York University Press, New York, p. 221.

১১৮ Michael E. Zimmerman et al., (Eds.), *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993, p. 253-267.

এক আধুনিক কৃষি প্রকল্প'। দক্ষিণ এশিয়ায় সবুজ বিপ্লবের বিপদ ও ভয়াবহতাকে তুলে ধরে শিবা (২০০১) কৃষির অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবকে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১১৯] পরিবেশবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ক্যারোলন মার্চেন্ট ১৯৮০ সালে প্রকাশ করেন তাঁর যুগান্তকারী বই *দ্য ডেথ অব নেচার : উইমেন, ইকোলজি অ্যান্ড দ্য সায়েন্টিফিক রেভুল্যুশন*। যেখানে তিনি প্রকৃতি ও মাতৃদুনিয়ার মৃত্যুর জন্য যন্ত্রনির্ভর বৈজ্ঞানিক-বিপ্লবকে দায়ী করেন। পরবর্তীতে মার্চেন্ট (২০০৬) তাঁর আরও একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, যন্ত্রনির্ভর বিজ্ঞান রাসায়নিকের দূষণের মাধ্যমে মাটির মৃত্যু ঘটিয়েছে। বৈশ্বিক আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হলো প্রকৃতির ওপর নির্বিচার শোষণ, অবিরত বাণিজ্যিক বিস্তার এবং সামাজিক-অর্থনীতির উন্নয়ন মানে নারী-অধঃস্তনতা। প্রকৃতির মতো এক জীবন্ত সত্তা ও রূপকল্পকে কোনো ধরনের গ্রাহ্য না করেই এই প্রশ্নহীন যন্ত্রনির্ভর বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।[১২০] খনা এই ধরনের উন্নয়ন নীতি ও দর্শনের চূড়ান্ত বিরোধী ছিলেন, খনার বচনসমূহই তার প্রমাণ। ঔপনিবেশিককালে কেন খনার বচন সংগ্রহ ঔপনিবেশিক শাসকদের মাথাব্যথার কারণ ছিল না এবং কেন পরবর্তী একটি বড় সময়জুড়ে খনার বচনকে প্রায় নিরুদ্দেশ করার প্রক্রিয়া চালু আছে তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট।

নির্ঘুম টিকটিকি

থোড় তিরিশে, ফুলো বিশে
ঘোড়ামুখো তেরো জেনো,
বুঝে সুঝে কাটো ধান্য।[১২১]

(থোড় জন্মানোর তিরিশ দিন পরে, ফুল বার হওয়ার কুড়ি দিন পরে, শিষ নত হওয়ার তেরো দিন পরে ধান কাটতে হবে। অন্যথায় লাভের আশা থাকে না।)

পার্থ (২০১২) বাংলাদেশের বন্যাপ্লাবন সমভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ শস্যফসলপঞ্জিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনশীলতা বিষয়ে একটি প্রতিবেশীয় সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, পঞ্জিকাকেন্দ্রিক জীবনযাপন থেকে বিচ্ছিন্নতা, গ্রামীণ ক্ষমতা সম্পর্ক, লিঙ্গীয় অসমতা, সাংস্কৃতিক রূপান্তর, বাজার নির্ভরশীলতা, বহিরাগত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, জাতের বিশুদ্ধতা, তথাকথিত আধুনিক রাসায়নিক কৃষির বিস্তার, গ্রামীণ

১১৯ দেখুন : Shiva, Vandana. 2001 (3rd impression), *The Violence of Green Revolution*, Other India Press in association with RFSTE, India.

১২০ দেখুন : Merchant, Carolyn. 2006, 'The Scientific Revolution and The Death of Nature', In : *Isis*, 2006, 97:513–533, 2006 by The History of Science Society.

১২১ পান্ডে, তুষার কান্তি (সম্পাদনা)। ১৯৯০, *চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবীরের দোহা ও মীরার পদাবলী*, পৃ. ৪।

আচাররীতির পরিবর্তন, কৃষকের নিজস্ব পছন্দ, জমির ভূবৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া ও জলবায়ুগত বিপর্যয়, লোকায়ত বিজ্ঞান ও গ্রামীণ জীবনের প্রতি রাষ্ট্রীয় অবহেলা, বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি, আলোকগ্রহণশীলতার পরিবর্তন ও ঋতুভিত্তিক কৃষিজমির রঙের পরিবর্তন গ্রামীণ শস্যপঞ্জিকার রূপান্তরকে প্রভাবিত করে।[১২২] তার পরও গ্রামীণ নিম্নবর্গ এখনো এই পরিতর্বনশীলতার ভেতরও খনার বিজ্ঞান-দর্শনকে তাদের যাপিতজীবনের উৎপাদনের মৌলিক দর্শন হিসেবে মান্য করে। এটি এমন নয় যে, প্রতিটি পদক্ষেপেই খনার বচন মেনে চলছে সবাই। আসুন একটি 'জনপ্রিয়' খনার বচন এবং এর প্রতিবেশ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে চলতি আলাপকে শেষের দিকে টেনে নিয়ে যাই।

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্র হবে বৃষ্টি যেন॥[১২৩]

(খনার বচনে বলে যে, ব্যাঙের ডাক বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ।)

আমাদের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঙের উপস্থিতি এবং ব্যাঙের ডাক প্রকৃতির এক প্রতিবেশীয় সূচক এবং আবহাওয়ার এক অনন্য নির্দেশক। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়া বনে অবস্থিত লাউয়াছড়া খাসিয়াপুঞ্জির পানজুমিয়াদের কাছে বনের নানা প্রজাতির ব্যাঙ হচ্ছে পরিবেশের নানা তারতম্যের নির্দেশক। লাউয়াছড়া বনে একটি সবুজ ব্যাঙ প্রজাতি, যা বনের আর্দ্রতা ঠিক থাকার নির্দেশক ছিল বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। ব্যাঙ বিলুপ্তির ফলে পানজুমিয়া খাসিয়ারা এখন অনেক ক্ষেত্রেই ঠাহর করতে পারেন না বনের আর্দ্রতার পরিমাপ, কিন্তু পানজুমের জন্য একটি স্থিতিশীল আর্দ্রতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং হবিগঞ্জের হাওর জনপদের বাঙালিদের ভেতর বৃষ্টির প্রার্থনায় ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করা হয়। অনাবৃষ্টি এবং খরার সময় গ্রামের কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা মিলে গ্রাম ঘুরে ঘুরে এই পর্ব পালন করে বৃষ্টির প্রার্থনায়। টাঙ্গাইলের মধুপুরের শালবনের মান্দি জনগোষ্ঠীর ভেতর জুম চাষের সময় বীজ লাগানোর পর বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয়, এই ধরনের প্রার্থনা খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ভেতরও আছে। হাওর জনপদের মানুষেরা জানালেন, ব্যাঙ যদি ডাকে তবে বোঝা যায় বৃষ্টি হবে।

১২২ পার্থ, পাভেল। ২০১২। 'গ্রামীণ শস্যপঞ্জিকা : রূপ ও রূপান্তর' (বাংলাদেশের বন্যাপ্লাবন সমভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ শস্যফসলপঞ্জিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনশীলতা বিষয়ে একটি প্রতিবেশীয় সমীক্ষা)। লেখাটি সুকান্ত সেন ও সিলভানুস লামিন সম্পাদিত ও সংকলিত *বাংলাদেশের কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য* পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ৪৩-৭৯।

১২৩ আলাপের এই অংশটুকুর জন্য বিস্তারিত পড়ুন : পার্থ, পাভেল। 'বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ু বিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ', লেখাটির রচনাকাল ২০০৮। এটি দেশের বিভিন্ন পাবিলক বিশ্ববিদ্যালয় ও অঞ্চলে আয়োজিত 'জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়ক সেমিনারে পঠিত এবং *শিক্ষবার্তা*সহ অনেক প্রকাশনায় প্রকাশিত।

কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙ যেমন নেই সেটিও সত্য, আবার বৃষ্টি কখন না কখন হয় সেটিরও ঠিক নেই। এই যে প্রতিবেশের একটি প্রাণীর অনুপস্থিতি, একেই হাওর জনপদের মানুষেরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভেতর জলবায়ুগত পরিবর্তনশীলতার একটি ঘটনা হিসেবে পাঠ করেন। এই ঘটনাটি স্থানীয় জনগণের আবহাওয়াপঞ্জিকাতে নির্দেশ করে বৃষ্টিপাতের আগমন এবং পরিমাণ।

ব্যাঙ এবং বৃষ্টিপাতের এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখার জায়গা এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিবেশকেন্দ্রিক ধারণা ও চিন্তাজগতের পাটাতন। খনা যে বিজ্ঞান-দর্শনের কথা আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্থানীয় জনগণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও করপোরেট মুনাফা বাজার কিন্তু ব্যাঙদের আর ভারসাম্যের বাস্তুসংস্থানে থাকতে দেয়নি। ব্যাঙ নেই বলে যে বৃষ্টিপাতের ধরন এবং আগমনকেই কেবল পাঠ করা যাচ্ছে না তা নয়, ব্যাঙের অনুপস্থিতি প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বিপন্ন করেছে। দেশে অনেক জনগণের খাদ্যের উৎস ছিল এই ব্যাঙ, ব্যাঙের বিলুপ্তি অনেক জনগণের খাদ্যাভাস এবং খাদ্যসংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ব্যাঙ কৃষি ও জুমের অনেক পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের শস্য ফসলকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙের পা বাণিজ্যের ফলে এই ব্যাঙ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর আমাদের কৃষকের ধানখেতে পোকামাকড় মারতে সমানে দোকান খুলেছে মনসান্টো, সিনজেন্টা, বায়ার ক্রপ সায়েন্স, বিএএসএফের মতো বড় দশাসই করপোরেট বিষ কোম্পানিরা। বাংলাদেশের গ্রাম জনপদ থেকে একটা সময় ব্যাঙ হত্যা করে ব্যাঙের পা দেশের বাইরে উত্তরের ধনী দেশগুলোর জন্য রপ্তানি করা হয়েছে। সেসব ব্যাঙ কারবারি দেশগুলোর জন্যই আজ পৃথিবীর জলবায়ু বদলে গিয়ে অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে পড়ছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১২ বছরের একটি গড় হিসাবে দেখা যায়, ভারত থেকে প্রতিবছর ২৭৭০ মেট্রিক টন সোনা ব্যাঙের পা আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জার্মানিতে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য রপ্তানি হয়েছে। ৬০টি ব্যাঙের পা একত্র করলে ওজন হয় মাত্র এক কেজি। ২৭৭০ মেট্রিক টন ব্যাঙের মাংসের জন্য প্রতিবছর ভারতে হত্যা করা হয়েছে চার কোটি ১০ লাখ ব্যাঙ।[১২৪] একটি ব্যাঙ গড়ে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম পোকামাকড় খায়, ব্যাঙ না থাকায় কৃষিজমির পোকামাকড়দের মারার জন্য কি ব্যাপক পরিমাণ করপোরেট বিষ ঢালতে হয়েছে, তা কি ভাবা যায়? কিন্তু বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ বরাবরই নির্বিচারে ব্যাঙ হত্যা এবং করপোরেট ব্যাঙ বাণিজ্যের বিরোধিতা করেছেন। ১৯৭৯ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশে

১২৪ দাঁ, দীপক কুমার। ১৯৯৯। *পরিবেশ সংকটে বিপন্ন পাখি*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ভারত। পৃ. ১০১।

প্রচণ্ড খরা হয়। পুকুর, খাল, বিল শুকিয়ে যায়। বোরো ধান হয়নি, আউশ বপন করা যায়নি। বোনা পাট মরে যেতে থাকে। কাপ্তাই হ্রদে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তাপমাত্রা ৪৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। গরমে ও পানির অভাবে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার মরতে থাকে। এ অবস্থায় গাইবান্ধায় গ্রামবাসীরা ব্যাঙশিকারিদের আক্রমণ করেন। তাঁদের ধারণা, শিকারিরা ব্যাঙ ধরে ফেলছে, সে জন্য দল বেঁধে ব্যাঙ ডাকতে পারছে না, ফলে বৃষ্টিও হচ্ছে না।[১২৫] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁরা বলছেন 'খনার বচন এ যুগে অচল' তাঁরা কি এ যুগে 'বহুজাতিক রাসায়নিক বিষ বাণিজ্য আর নির্মম ব্যাঙ বাণিজ্যকেই' একমাত্র সচল ও যুগোপযোগী মনে করছেন? খনার এ বচন বস্তুকে ঘিরে, এটি তখনো সত্য ছিল, এখনো সত্য। প্রতিবেশে ব্যাঙ থাকা না থাকা কি উত্তরের ভোগবাদী দুনিয়ার নির্মমতায় জলবায়ু বদলে যাওয়া মেঘের পরিবর্তন কি কোনোভাবেই এই বচনের 'সত্যের' সঙ্গে তুলনামূলক তর্কে জায়গা পেতে পারে? খনার বচনসমূহ এমনই চারধারের সূত্র থেকে উদ্ভাবিত, চারধারকে অন্যায়ভাবে বদলে ফেলে 'খনার বচনের' অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা কেবল অধিপতি ঔপনিবেশিক পুরুষতান্ত্রিক চরিত্রকেই হাজির করে। খনার বচনের আখ্যানের বরাহমিহির থেকে শুরু করে আজকের বিদ্যায়তনিক গরিমা কি আধুনিক কৃষি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান বাহাদুরি সবখানেই এই একই রকম বৈষম্যের ধারাবাহিকতা। কিন্তু তাতে কোনোভাবেই খনার বচনের বিজ্ঞান-দর্শন বদলে যায় না বা এর উপযোগিতা হারিয়ে যায় না। খনার জিব কেটে ফেললেও টিকটিকিরা এখনো নির্ঘুম। জ্ঞানজাগতিক দুনিয়ার বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই।

ঋণস্বীকার

বাংলাদেশের নানা প্রান্তের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জ্ঞান ও খনাপাঠ আমার খনার বিজ্ঞান-দর্শনকে জানা-বোঝার ভিত্তি তৈরি ও মজবুত করেছে। তাঁদের সবার কাছে এই নিতান্তই ছোট্ট এক 'খনালাপ' আপাদমস্তক ঋণ স্বীকার করছে।

হোসেন, সেলিনা। ২০১২। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৮৯, *খনার বচন, কৃষি ও বাঙালি সংস্কৃতি*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধানমন্ডি, ঢাকা।

Singh, Upinder. 2008, *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century*, Pearson Education India, p.581.

চৌধুরী, তিতাশ। ২০০০, *বৈশাখ ও আমাদের ঐতিহ্যচেতনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Sen, Dhiman. 2008, 'Impact of Kahan's Vachan on traditional agriculture in Bengal', *Asian Agri-History*, Vol. 12, No. 3, p. 211.

ভট্টাচার্য, পণ্ডিত রামপদ (আচার্য)। মোট ৪৭ পৃষ্ঠার বইটির কোথাও প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

১২৫ নওয়াজ, ড. আলি, ১৯৮৯। পৃ.১২৮।

খনার বচন বা সরল জ্যোতিষ বচন। রাজেন্দ্র লাইব্রেরি, ১৩২ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

দাস, শ্রীবাসব বিজয় (সম্পাদিত)। ১৪১৫। *বৃহৎ খনার বচন* (যদিও বইয়ের মলাটের ভেতরে বইটির নাম লেখা হয়েছে 'প্রাচীন ও বিশুদ্ধ খনার বচন'), মানসী হালদার বইটি সংশোধন করেছেন। বইটি প্রকাশ করেছে সজল পুস্তকালয়, ৩৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

রায়, শ্রী বিজয় চন্দ্র (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)। ১৯৯৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ), *খনার বচন*, ২/২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০ থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন বিজয় রায়। গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক। বর্ণবিন্যাস-ফাইন টাইপ কম্পিউটারস অ্যান্ড প্রিন্টার্স, শাঁখারীবাজার, ঢাকা। মুদ্রণ-ডিসি রায়, অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২/২ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০।

পাণ্ডে, তুষার কান্তি (সম্পাদনা)। ১৯৯০, *চাণক্য শ্লোক, ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন, কবীরের দোহা ও মীরার পদাবলী*, গ্রন্থনা, কলকাতা-৯।

Chatterji, Roma. 2007, 'Orality, Inscription and the Creation of a New Lore', *Cultural Analysis* 6 (2007): 71-90, The University of California.

রিপন, জাহারাবী। ২০১০। *মধ্যযুগের পাঁচালি নাট্যে বাংলার কৃষি-প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল। ১৯৯৫, *লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুবাস উদ্দিন, মুহম্মদ। ২০০৭, *সুনামগঞ্জের লোকসংস্কৃতি : কৃষি ও কৃষক সমাজ*, বারসিক, ঢাকা।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা। ২০০৭, *খনার বচন*, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা।

Bandyopadhyay, Monanjali and Chakraborti, Kalyan. 'Folk poetry as a Media of Agriculture Extension in Bengal', available in
http://www.academia.edu/1604047/Full_length_paper_Folk_poetry_as_a_media_of_agricultural_extension_in_Bengal

রাহী, অরূপ। ২০০৬। *খনার বিজ্ঞান* (সম্পাদিত), শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

ইসলাম, শহীদুল। ২০১৩, *বিজ্ঞানের দর্শন*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

নওয়াজ, অধ্যাপক আলি। ১৯৭৯, *খনার বচন ও কৃষি*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ধানমন্ডি, ঢাকা।

Partha, Pavel. 2012, 'Climate Calendar: Changes and Challenges' (an eco-feminist analysis on climate change and the local knowledge of rural Bangladesh), this paper was presented in the ``SAARC festival of literature 2012'', 16-19 March 2012, Lucknow, India. This festival was organized by SAARC, ICCR and Arpana Caur.

Geertz, Clifford. 1992, 'Local knowledge and its limits', *The Yale Journal of criticism*, Volume-5, Number-2, Yale University.

Philip, K.S. 2001, 'Indigenous Knowledge: Science and Technology Studies', In: *Indigenous Knowledge and Technology, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ISBN: 0-08-043076-7.

Warburton, H. and Martin, A. 1999, *Local People's Knowledge in Natural Resources Research. Socio-Economic Methodologies for Natural Resources Research,* Chatham, UK: Natural Resources Institute.

Beckford, Clinton and Barker, David. 2007, 'The Role and Value of Local Knowledge in Jamaican Agriculture: Adaptation and Change in Small-scale Farming', *The Geographical Journal*, Vol.173, No. 2, June 2007.

Mackinson, Steven and Nøttestad, Leif. 'Combining Local and Scientific Knowledge', *Reviews in Fish Biology and Fisheries,* 8(4):481-490.

Stern, Simon. 2001-2002, 'Note on Between Local Knowledge and National Politics: Debating Rationales for Jury Nullification After Bushell's Case', *Yale Law Journal*, Volume-111, p. 1815-1854.

Pitt-Rivers, Lt. Gen A. Lane. 1906, *The Evolution of Culture and Other Essays*, edited by J. L. Myres, M.A., Oxford at the Clarendon Press.

সমাজমনস্ক পোস্টমডার্ন সাহিত্যপত্র *হাওয়া ৪৯* এর 'অপর' সংখ্যা থেকে, এটি সম্পাদনা করেছেন অরবিন্দ প্রধান, হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০।

ভদ্র, গৌতম। ১৯৯৪, *ইমান ও নিশান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

Mazzocchi, Fulvio. 2006, 'Western science and traditional knowledge', *EMBO Reports*, V-7, N-5, European Molecular Biology Organization, p. 463-466.

Calvet-Mir, Laura; Reyes-García, Victoria , and Tanner, Susan. 2008, 'Is There a Divide between Local Medicinal Knowledge and Western Medicine? A Case Study among Native Amazonians in Bolivia, *J Ethnobiol Ethnomed*. 2008; 4: 18. Published online 2008 August 18. doi: 10.1186/1746-4269-4-18.

Plumwood, Val. 1993, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London and NY, p.195-196.

Mills, Patricia Jagentowicz. 1991, 'Feminism and Ecology: On the Domination of Nature', In: *Hypatia* vol. 6, no. 1 (Spring 1991).

Greenberg, James B. and Park, Thomas K. 1994, 'Political Ecology', In: *Journal of Political Ecology*, Volume-1.

Mark Q. Sutton and E . N. Anderson. 2010, *Introduction to Cultural Ecology*, Second Edition, Altamira Press.

d'Eaubonne, Frangoise. 2000, 'Feminism- Ecology: Revolution or Mutation?', In: *Ethics and the Environment*, 4(2):1 75-1 77, Copyright © 2000 Elsevier Science Inc.

Mellor, Mary. 1997, *Feminism & Ecology*, New York University Press, New York , pp 221.

From Michael E. Zimmerman, J. Baird Callicott, George Sessions, Karen J. Warren, and John Clark (Eds.), *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993, pp. 253-267.

Shiva, Vandana. 2001 (3rd impression), *The Violence of Green Revolution*, Other India Press in association with RFSTE, India.

Merchant, Carolyn. 2006, 'The Scientific Revolution and The Death of Nature', In : *Isis*, 2006, 97:513–533, 2006 by The History of Science Society.

পার্থ, পাভেল। ২০১২। 'গ্রামীণ শস্যপঞ্জিকা : রূপ ও রূপান্তর' (বাংলাদেশের বন্যাপ্লাবন সমভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ শস্যফসলপঞ্জিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনশীলতা বিষয়ে একটি প্রতিবেশীয় সমীক্ষা), লেখাটি সুকান্ত সেন ও সিলভানুস লামিন সম্পাদিত ও সংকলিত *বাংলাদেশের কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য* পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে, বারসিক, ঢাকা।

পার্থ, পাভেল। 'বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ু বিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ', লেখাটির রচনাকাল ২০০৮। এটি দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অঞ্চলে আয়োজিত 'জলবায়ু পরিবর্তন'বিষয়ক সেমিনারে পঠিত এবং *শিক্ষাবার্তা*সহ অনেক প্রকাশনায় প্রকাশিত।

ব্যবহৃত ওয়েব লিংকসমূহ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Khana_%28poet%29।

http://www.scribd.com/doc/89654073/khonar-bochon ।
http://choturmatrik.net/blogs ।
http://issuu.com/saptarishisastrologyvol7/docs/48-khannarvachan-1/1?mode=a_p
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=4725 ।
http://bn.wikisource.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A6%A8 ।
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A6%A8 ।
http://chorakobita.blogspot.com/2009/12/blog-post_30.html ।
http://khona.blog.com/khonas-speech/ ।
http://rathindrabharati.wordpress.com/%E0%A6%96%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A6%A8/
http://www.dw.de ।
http://prothom-aloblog.com/posts/16/58775 ।
http://prothom-aloblog.com/posts/16/53422 ।
http://zizipoka.com/known-unknown/263 ।
http://www.somewhereinblog.net/blog/rupokrasel31/29721043 ।
http://www.somewhereinblog.net/blog/qshohenq/29308834 ।
http://choturmatrik.net/blogs ।
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=4725 ।
http://www.ik.org.bd/?page_id=22 ।
http://groups.yahoo.com/group/kabishabha/message/3788 ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শূদ্র সম্প্রদায়

রাহমান চৌধুরী

ভারতে প্রাচীনকালে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। শিক্ষা ছিল কেবল শাসক, পুরোহিত ও সুবিধাপ্রাপ্তদের জন্য। চতুর্বর্ণের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা শূদ্রদের এবং সকল বর্ণের নারীদের, শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। প্রাচীন ভারতে শূদ্ররা ছিল জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ। তাদের সবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ। প্রাচীন ভারতে বেদ পাঠ ছিল শিক্ষালাভের একটি প্রধান দিক।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বিষয় নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। এই কালপর্বে শিক্ষা যেমন সর্বজনীন ছিল না, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপও বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না। *মহাভারত* থেকে জানা যায়, উপনয়নের পরই শিক্ষার শুরু। হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখিত ষোড়শ সংস্কারের অন্যতম হলো উপনয়ন। উপনয়ন সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত কেউ দ্বিজ হতে পারে না। দ্বিজ কথাটার অর্থ হলো দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিজত্ব লাভের সারকথা হলো ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে পরিচয়। দ্বিজত্বপ্রাপ্তির মানে তাই শিশুর প্রথম জন্ম পিতামাতার দ্বারা, আর দ্বিতীয় জন্ম গুরুর কাছে শিক্ষালাভের মাধ্যমে।[১] উপনয়নের মাধ্যমে গুরু আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যকে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। উপনয়ন-কালে নতুন শিষ্যকে মূলত গায়ত্রী মন্ত্র শেখানো হয়। প্রাচীন সমাজে উপনয়ন সংস্কার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সমাজের নানা কাজে যুক্ত হওয়ার অধিকার জন্মাত বর্ণহিন্দুর। উপনয়নের মাধ্যমে

১ বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস*, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১, পৃ. ১৭।

দ্বিজত্ব লাভ করলে তবেই বেদবিদ্যা অধ্যয়নের অধিকার জন্মায়। সুপ্রাচীনকালে উপনয়নই ছিল বিদ্যারম্ভের একমাত্র বা প্রধান সংস্কার।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় তাই উপনয়নের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। দ্বিজত্ব লাভ বা উপনয়নের মধ্য দিয়েই একটি বালক সমাজের পূর্ণসদস্য হয়েছে বলে গণ্য করা হতো। উপনয়ন সংস্কারের জন্য নির্ধারিত বয়স ব্রাহ্মণের জন্য আট, ক্ষত্রিয়ের ১১, আর বৈশ্যদের বেলায় ১২। উপনয়নের পর শিক্ষার্থী একজন ব্রাহ্মণ গুরুর গৃহে কয়েক বছর থেকে শিক্ষা অর্জন করত। পণ্ডিতগণ উপনয়ন অনুষ্ঠানের আরেকটি অর্থ করেছেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ব্রত, সংযম, নিয়ম, গুরু ও দেবতার সংস্পর্শে আসতেন। ব্রহ্মচর্যকালে শিক্ষার্থীর বেশভূষা বলতে ছিল নিম্নাঙ্গে বাস, ঊর্ধাঙ্গে অজিন, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী ব্রহ্মচারীর বেশ। দণ্ড ধারণের অর্থ হলো শিক্ষাজীবনে দীর্ঘ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজনীয় অবলম্বন। এ ছাড়া থাকত যজ্ঞোপবীত বা পৈতা। উপনয়ন অনুষ্ঠানে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে নাম ও জন্মপরিচয় দিয়ে নবীন শিক্ষার্থী গুরুর কাছে শিষ্যত্বলাভের আবেদন জানাতেন। শিক্ষাজীবনে একনিষ্ঠ থাকার শপথ নিতে হতো শিক্ষার্থীর। এই অনুষ্ঠানে শিষ্যের উদ্দেশ্যে গুরু যা বলতেন তার ভাবার্থ এ রকম : তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে শিষ্যের হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হোক, শিষ্যের অন্তর গুরুর অনুগামী হোক এবং গুরুতেই যেন শিষ্যের অবিচল মতি থাকে, শিষ্যের চিন্তা-ভাবনা-শ্রদ্ধা সবকিছু যেন গুরুতেই কেন্দ্রীভূত হয় ইত্যাদি। শিক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল বেদ।[২]

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর কাছে বেদসংহিতা ছিল কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্রের সংকলন। সব মন্ত্রের অর্থও সবার জানা ছিল না। খুব চমৎকার ভাষায় পরিব্রাজক আল বিরুনি লিখেছেন, ব্রাহ্মণরা বেদ আবৃত্তি করেন না বুঝেই এবং তা কণ্ঠস্থ করেন লোক পরম্পরায় শুনে শুনে। ঋষিদের মধ্যে এমন লোক অল্পই রয়েছেন, যাঁরা বেদের ব্যাখ্যা করতে পারেন। ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের বেদ শিক্ষা দেন। ক্ষত্রিয়রা বেদ শিক্ষা নিতে পারেন কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁদের নেই। বেদ শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন ব্রাহ্মণরা। প্রাচীনকালে বেদ লেখার অনুমতি দেওয়া হতো না। কারণ, বেদপাঠ করার সুনির্দিষ্ট সুর ও পদ্ধতি রয়েছে। বেদ লেখনী পরিহার্য বলেই বিবেচিত হয়। কারণ, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকা সম্ভব এবং লিখিত পাঠে সংযোজন এবং বিয়োজন ঘটতে পারে।[৩] ফলে বেদ শুধু মুখস্থই রাখতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, বেদপাঠে কেন শূদ্রদের অধিকার

২ দিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা রচিত ও গৌরীশংকর দে অনূদিত, *আদি ভারত*, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৬১।

৩ আল বিরুনি রচিত ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, *ভারত*, নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৪৪-৪৫।

নেই? *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার শির থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম, রাজা বা ক্ষত্রিয়র জন্ম বাহু থেকে, বৈশ্য তার জঙ্ঘা থেকে ও শূদ্র তার পদযুগল থেকে সৃষ্ট।[৪] ব্রহ্মার পদযুগল থেকে সৃষ্ট—তাই শূদ্র খুবই নিম্নজাতের, এ কারণেই তার বেদপাঠে অধিকার নেই। বিদেশি পর্যটক আল বিরুনির রচনায় এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, হিন্দুধর্মে মানুষকে চার বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে, যা চতুর্বর্ণ নামে পরিচিত। সর্বোচ্চ বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ। প্রাচীন ভারতে সৃষ্ট এই বর্ণভেদ-প্রথা তার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রথার ফলেই শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে সর্বজনীন চরিত্র লাভ করতে পারেনি।[৫] সর্বনিম্ন বর্ণের শূদ্রদের বেদ উচ্চারণ বা আবৃত্তি করা তো দূরের কথা, বেদপাঠ শোনার অধিকার পর্যন্ত ছিল না।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন বাধ্যতামূলক ছিল। সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মূল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নতি সাধন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাধারা জাতি বা বর্ণভিত্তিক সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসকে লোকমানসে মান্যতা দিতে কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের জোরে ধর্মের অভিভাবক হিসেবে ব্রাহ্মণরা সব ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি, নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের টীকাকার, ব্যাখ্যাকার ও ভাষ্যকার হয়ে উঠেছিলেন। ভূস্বামী বা জমিদার শ্রেণী স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে নিষ্কর ভূমিদান করে এই ব্রাহ্মণ সমাজকে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কাজে ব্যবহার করত। ব্রাহ্মণরা কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আবশ্যিক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে দমনমূলক প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তাদের আনুগত্যের অনুশাসন প্রশাসনিক ব্যয় কমাতেও সাহায্য করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জাতি বা বর্ণভেদব্যবস্থা বিশেষ বলপ্রয়োগ ছাড়াই শ্রমজীবী মানুষকে কৃষি উৎপাদনব্যবস্থায় নিযুক্ত রাখার প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করত। সন্দেহ নেই, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রীয় শিক্ষাধারা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অঙ্গ হিসেবে, শোষণমূলক সামাজিক স্তরভেদকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতীয় শিক্ষাধারা ছিল গুরুমুখী, শুনে শেখার ঐতিহ্য। কারণ, বেদ কণ্ঠস্থ করতে হতো এবং মুখস্থ রাখতে হতো। ছাত্রদের জন্য কোনো গ্রন্থ ছিল না। তাই বই পড়ে বেদ মুখস্থ করা চলত না। জোর গলায় পাঠ করা এবং বেদবর্ণ কর্ণগোচর

৪ রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৬, পৃ. ২৬।

৫ আল বিরুনি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

করা বেদ-অধ্যয়নের অঙ্গ এবং গুরুর কাছে শুনেই তা করতে হতো।[৬] শ্রবণ হলো শিক্ষক বা গুরু কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ বা পাঠ্যবিষয়। এই ব্যবস্থাটিকে 'গুরু-শিষ্য পরম্পরা' বলা হয়। গুরুর কাছ থেকে শিষ্য, শিষ্য থেকে তার শিষ্য—এই রূপে পরম্পরায় জ্ঞান প্রবাহিত ও সংরক্ষিত হতো। এই কারণে সে যুগে জ্ঞান গ্রন্থনাকে বলা হতো 'স্মৃতি' বা 'শ্রুতি'। অর্থাৎ যা স্মৃতিতে ধরে রাখা হয়েছে বা যা শোনা গেছে। গুরুর মুখে শুনে শুনে শিক্ষালাভের আর একটি উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ করে রাখা। এতে শূদ্ররা শিক্ষালাভের সব ধরনের সুযোগ হারাল। পাঠদানের লিখিত পদ্ধতি বা গ্রন্থ না থাকায় শূদ্ররা চাইলেও লুকিয়ে এই শিক্ষালাভ করতে পারত না। ঠিক এভাবে সমাজের বিরাট এক অংশকে শোষণ করার জন্য প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম থেকেই চাতুর্যের পথ গ্রহণ করেছিল, পরবর্তী সময়ে যা শূদ্রদের জন্য শাপে বর হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্য যুগে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছিল যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বর্ণাশ্রম প্রথা এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থা এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র দান করেছিল। সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ছিল জ্ঞান আহরণ। প্রকৃত জ্ঞান বলতে বোঝানো হতো আত্মনিবেদনের মাধ্যমে পরমাত্মায় বিলীন হওয়া। আত্মনিবেদন বা আত্মোৎসর্গের শিক্ষা বলতে পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষি বা গুরুঋণ পরিশোধের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন প্রভৃতি কর্তব্য সম্পাদন করাকে বোঝানো হতো। বেদ কথাটার সঠিক অর্থ হলো অজ্ঞাত কিছুর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ। হিন্দুদের মতে, বেদ হলো ধর্মশাস্ত্র, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। ঠিক এই রকম বক্তব্য দানের মধ্য দিয়েই বেদের বিধানকে তাঁরা অনড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ঋষিরা শিক্ষাজীবনকে এক অপরিবর্তনীয় সর্বজনীন জীবনধারার সমার্থক বলেই মনে করতেন। আর এই জীবনধারা গ্রথিত হয়েছিল ব্রহ্মচর্যের বাঁধনে। গুরুর আশ্রমে প্রাচীন ঋষিরা শিষ্যকে পুত্র, স্বামী এবং পিতা হিসেবে কী কী কর্তব্য পালন করতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। দণ্ডনীতি, ধনুর্বেদ, সামাজিক বিধি-বিধান এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল সমাজজীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের কথা মনে রেখে। একদিকে পরমজ্ঞান, সত্যোপলব্ধি এবং অন্যদিকে পার্থিব দায়িত্ব পালন—এই দুই লক্ষ্য পূরণের জন্য গুরুগৃহে-তপোবন আশ্রমে বিদ্যাকে দুভাবে পরিবেশন করা হতো—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। 'পরাবিদ্যা' হলো পরমজ্ঞান লাভের জন্য তিন বেদ ছয় বেদাঙ্গ অনুশীলন করা; আত্মসংযম এবং যোগসাধনা দ্বারা এই বিদ্যা অর্জন করতে হতো। আর 'অপরাবিদ্যা'র অর্থ হলো পার্থিব

৬ ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত, *মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১, পৃ. ১৫৯।

জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে যা কিছু প্রয়োজন তার অনুশীলন করা। বৈদিক শিক্ষা এই 'পরা' ও 'অপরা' বিদ্যার সমন্বয় ছিল।[৭]

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় স্মৃতির উন্নতি সাধন করা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সময়কার শিক্ষায় বাচনিক স্মৃতির ক্ষমতা এত বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছিল, যা আধুনিক কালে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। গুরুর মুখে শুনে বেদ কণ্ঠস্থ করার মধ্যে যত দিন শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল তত দিন অবশ্যই অন্তত ব্রাহ্মণদের প্রাক্-উপনয়ন শিক্ষার তেমন দরকার ছিল না। শিক্ষার সীমা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ও গ্রন্থের গুরুত্ব অবশ্যই বাড়তে লাগল। ক্রমে বেদ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার অঙ্গীভূত হলে লিখিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও চর্চা চালু হয়। সেই সঙ্গে প্রাক্-উপনয়ন লেখাপড়ার প্রথা সীমাবদ্ধভাবে হলেও চালু হয়েছিল বলেই মনে হয়। প্রাচীন স্মৃতির যুগে লেখার যথেষ্ট প্রচলন ছিল সন্দেহ নেই। তবে তা রাজকার্যেই বেশি প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রচর্চায় নয়। *ধর্মসূত্র* এবং *গৃহ্যসূত্র*-এর সাক্ষ্যে মনে হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে লেখা বা গণিত শেখার প্রথা বিশেষ ছিল না। কিন্তু প্রাচীন ভারতে গণিতশাস্ত্রের চর্চা যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতে যে অগ্রগতি ঘটেছিল তার প্রমাণ, হিন্দুরাই প্রথম 'শূন্যে'র আবিষ্কারক। গণিতবিদ্যা যে সব বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, বৈদিক সাহিত্যের একাধিক স্থানে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের সঙ্গে বৈদিক হিন্দুরা পরিচিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গণিতের বা লিপির ব্যবহার ছিল না। ভারতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালিপির যে নমুনা পাওয়া যায় তা খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। অশোকের শিলালিপিতে এই উভয়বিধ সংখ্যালিপির নিদর্শন মেলে।[৮] সমাজব্যবস্থাকে অনড় রাখার জন্য ব্রাহ্মণরা লিপির ব্যবহার না করে শূদ্রদের বেদ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু দেখা যায়, বেদ পাঠের অধিকার না থাকলেও শূদ্ররা ভিন্ন ধারার এক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। সব শূদ্র নয়, শূদ্রদের একটি অংশ। ব্রাহ্মণদের বেদ শিক্ষায় দেখা গেছে সেখানে লেখা বা অক্ষর শেখার ব্যাপার ছিল না। শিক্ষা ছিল শ্রুতি এবং স্মৃতির ওপর নির্ভরশীল। অথচ শূদ্রদের শিক্ষাধারায় লেখা এবং পড়া দুটোরই স্থান ছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতেই পারে নিম্নবর্ণের পক্ষে কী করে সেটা সম্ভব হলো?

শূদ্রদের পড়াশোনার ব্যাপারটা যে হঠাৎ ঘটে গিয়েছিল তা নয়। ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথেই সেটা হয়েছিল। ভারতে মহাবীরের জৈনধর্ম এবং সিদ্ধার্থের বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রধানত ছিল একটি রাজনৈতিক ঘটনা। ক্ষত্রিয়রা শাসক হলেও

৭ বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৮ অনিল ভট্টাচার্য, *শিক্ষা সমাজ ও সময়*, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৪-১৫।

সমাজে তাদের অবস্থান ছিল দ্বিতীয় স্তরে। ক্ষত্রিয় হিসেবে মহাবীর এবং বুদ্ধ কেউই ব্রাহ্মণদের এই আধিপত্য মেনে নিতে চাননি। কিন্তু তাঁরা জানতেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার না করে তাকে প্রতিহত করা যাবে না। ভারতে জীব হত্যা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। ধর্মের নামে সেই একই প্রশ্ন তুলেছিলেন মহাবীর এবং বুদ্ধ। ভারতের মন্দিরে মন্দিরে গো হত্যার উৎসব ছিল একদা। পশু বলি পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল। মন্দিরে মন্দিরে পশু বলির মহা-উৎসবের কারণে হালচাষের জন্য পশুর অভাব দেখা দিয়েছিল। মহাবীর তখন জীবহত্যা নিষেধ করলে সাধারণ কৃষকেরা খুব খুশি হয় এবং মহাবীরের ধর্মমত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কিছুদিন পর দেখা গেল, জীব হত্যার ব্যাপারে মহাবীরের নিষেধের কারণে চাষের জমিতে পোকামাকড় বা ইঁদুরের উপদ্রব দেখা দিলেও সেগুলোকে মেরে ফেলা যাচ্ছে না। জীব হত্যা নিষেধে গরু রক্ষা পেল ঠিকই, কিন্তু খেতের ফসল নষ্ট হতে লাগল পোকামাকড় ধ্বংস করতে না পারায়। কৃষকদের সেই সংকটে বুদ্ধ নতুন মত, ধর্মের নতুন বাণী প্রচার করলেন। তিনি জীব হত্যা নিষেধ করলেন না। বললেন, অকারণে জীব হত্যা কোরো না। সে কারণেই বুদ্ধদের একটি সম্প্রদায় মাংস খেয়ে থাকে। বুদ্ধের নতুন বাণীতে গো হত্যা যেমন রোধ করা গেল, তেমনি ফসলের খেতের পোকামাকড় হত্যায় কোনো বাধা রইল না। বুদ্ধের ধর্মমত তাই মহাবীরের চেয়ে বহুগুণ বেশি সাফল্য লাভ করে।[৯]

ভারতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব শূদ্রদের লেখাপড়ার পথকে সুগম করে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বর্ণপ্রথার বিরোধিতা না করলেও সকল বর্ণের মানুষকে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বৈশ্যরা। নালন্দার বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০ বণিক ১০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি ভূমিখণ্ড ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করে বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন।[১০] ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধের মতকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ব্যাপারে বৈশ্য বা বণিক সম্প্রদায়ের বিরাট ভূমিকা ছিল। কারণ বুদ্ধ শূদ্র ও বৈশ্যদের স্বার্থকে রক্ষা করেছিলেন। ইতিহাসের গতিপথের কিছু দ্বান্দ্বিক নিয়ম রয়েছে। শূদ্রদের লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে সেই দ্বান্দ্বিক নিয়ম কাজ করেছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক পর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা কায়িক পরিশ্রম থেকে সরে দাঁড়ালে চাষাবাদের দায়িত্ব পুরোটাই এসে পড়ে বৈশ্য ও শূদ্রদের ওপর। ফলে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই শূদ্রদের ওপর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে।

৯ রাহমান চৌধুরী, 'যন্ত্রসভ্যতা এবং পরিবেশ বিনাশের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নাটক', *নতুন দিগন্ত*, দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৯, পৃ. ৩৭।

১০ বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।

শূদ্রদের উৎপন্ন দ্রব্য না পেলে ব্রাহ্মণদের চলে না। প্রাচীনকালের কোনো এক পর্বে যেসব শূদ্র প্রধানত গৃহভৃত্য, দাস, কারিগর ও কৃষিশ্রমিক ছিল, আদি মধ্যযুগে তাদের কৃষক হিসেবে রূপান্তর ঘটে।

হিউয়েন সাঙ শূদ্রদের দেখেছেন কৃষিজীবী হিসেবে। বিভিন্ন পুঁথিতেই তাদের কৃষক বলা হয়েছে। কৃষির প্রসার কৃষিমজুর বা কৃষকের সংখ্যা বাড়ায়। শূদ্ররা এই পেশায় যোগ দিতে থাকে। একটা পেশাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেই অবশ্য শিক্ষার পরিবর্তন ঘটেছে। বারো শতকে কল্‌হনের বিবরণে দেখা যায়, পথে পাওয়া একটি বাচ্চাকে শূদ্রা-ধাত্রী মানুষ করে। লেখাপড়া শিখে সে কোনো এক গৃহস্থের বাড়িতে শিশুদের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হয়। দুই দিক দিয়ে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, শূদ্রা-ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়েও সে লেখাপড়া শিখেছে এবং দ্বিতীয়ত, সে গৃহশিক্ষকের কাজ করে। সেকালে শূদ্রের পড়ালেখা শেখা তাহলে একেবারে অসম্ভব ছিল না। বরং শূদ্রদের মধ্যে লেখা, পড়া আর গণিত শেখার রেওয়াজ কিছুটা চালু হচ্ছিল। ধনী বৈশ্য বা শূদ্ররা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণেই আগ্রহী ছিল। কারিগরি বা বৃত্তি শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকত বণিক সংঘের কাছে বা নির্দিষ্ট পরিবারের ওপর। জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাটুকুই সাধারণত তারা শিখত। বর্ণমালার সঙ্গে সঙ্গে এসব শিশুকে সাধারণ গণিত শেখানো হতো। এ ধরনের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিল বণিক, গ্রাম্য করিগর ও কৃষকেরা। এই শিক্ষায় লেখার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। সে কারণেই ছাত্রদের অক্ষর চিনতে হতো, নিরক্ষর হলে চলত না। সন্দেহ নেই তখনো জনশিক্ষার প্রচলন হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার শূদ্রদের জন্য লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং একটা পেশাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কিন্তু এতে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার কোনো সাধারণ প্রথাবদ্ধ ধারা গড়ে উঠেছিল। প্রধানত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই পড়াশোনা সীমাবদ্ধ ছিল।

রামশরণ শর্মা মনে করেন যে গুপ্ত সাম্রাজ্যে শূদ্রের অবস্থা তুলনামূলক কিছুটা ভালো হয়েছিল। বৈদিক যুগে শূদ্রদের কাজ ছিল মূলত দ্বিজগণের সেবা করা। রামশরণের মতে, মৌর্য আমলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও গুপ্ত আমলেই শূদ্রদের অনেককে কৃষিকাজ, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম করতে দেখা যায়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে এগুলো যদিও বৈশ্যের করণীয় কাজ বলে বিবেচিত। গুপ্ত আমলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে অনেক শূদ্র বেশ ধনী হয়ে ওঠে। এমনকি অনেক ব্রাহ্মণ এসব ধনী শূদ্রকে বেশ সমীহ করত। শূদ্রের শিক্ষা সম্পর্কে সমাজ অনেকটা উদারনীতি গ্রহণ করতে থাকে। ফলে শূদ্রদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু সেটা ঠিক বেদ শিক্ষা নয়। হিসাবপত্র রাখা, চিঠিপত্র লেখার মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনের শিক্ষা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের পর থেকে সামাজিক ও

অর্থনৈতিক দিক থেকে বৈশ্য ও শূদ্র পরস্পরের কাছাকাছি এসে যায়। বৈশ্য ও শূদ্র উভয়ই যেহেতু কৃষক নামে অভিহিত হতো, তাদের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। শূদ্রের জন্য নির্দেশিত অনেক ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ব্রত ও তীর্থযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ ব্রাহ্মণ ও নিম্নকোটির পুরোহিত বর্গের দান-দক্ষিণার সংস্থান হয়। শূদ্ররা *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও পুরাণ পাঠ শোনার অধিকারী হয়।[১১] গুপ্তযুগে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ যে বাড়ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য লেখা, পড়া আর গণিত শেখায় তাদেরই ছিল প্রাধান্য। পাশাপাশি শিক্ষাধারায় কিছুটা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায় এ সময়। ব্রাহ্মণ্য চতুর্বেদ শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা শূদ্রদের শিক্ষাদানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

বর্ণভেদ-প্রথা প্রাচীন ভারতে সর্বশক্তি নিয়েই বিরাজিত ছিল। তা সত্ত্বেও ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শূদ্র মাত্রেই অস্পৃশ্য ছিল, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বে ও অনুশাসনপর্বে বলা হয়েছে, বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত বাকি সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান শূদ্র করতে পারবে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক বিধান দিয়েছিলেন যে বেদ পাঠ বা বৈদিক যাগযজ্ঞ করার অধিকার শূদ্রের নেই। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে বেদ অধ্যয়ন করাত এবং শূদ্রের জন্য যাজন করত।[১২] নিশ্চয় এগুলো ব্যতিক্রম। মনে রাখতে হবে টাকা বা সম্পদের শক্তিই বড় শক্তি। শূদ্রদের একটি অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে ধনী হয়ে উঠছিল। নানা রচনায় তার প্রমাণ মেলে। এসব শূদ্রের জন্য রাষ্ট্র বা ব্রাহ্মণদের নতুন নতুন বিধান তৈরি করতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শূদ্রদের দুভাগে ভাগ করা হয়—সৎ ও অসৎ। যারা অসৎ ছিল তারা ছিল অস্পৃশ্য। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সেটাকেও মানা হয়নি। ব্রাহ্মণরা যেখানে শূদ্রদের, এমনকি সকল বর্ণের নারীদের জন্য বেদ পাঠ বা বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ করেছিল, সেখানে বৌদ্ধধর্মমতে বৌদ্ধ ধর্মসংঘগুলোতে যেকোনো জাতের মানুষই সদস্য হতে পারত। সে ক্ষেত্রে জাতপাতের কারণে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতো না।

সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসেন হিউয়েন সাঙ। তিনি চার বর্ণের লোক এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের কথা বলেছেন। হিউয়েন সাঙ নালন্দা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণও দিয়েছেন। সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সময় বহুতর বৌদ্ধমঠ বঙ্গের সর্বত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মের প্রভাবই বাংলায় প্রচলিত ছিল বলে হিউয়েন সাঙ জানান। হিউয়েন সাঙের বিবরণে জানা যায়, একজন বাঙালি তখন নালন্দার বিশ্ববিশ্রুত বিহারের অধ্যক্ষের

১১ রামশরণ শর্মা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯।

১২ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ. ১১৫।

পদ অলংকৃত করেছিলেন। হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজা আদিসুর বাংলায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব লক্ষ করে কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিয়ে আসতে বাধ্য হন। এই ব্রাহ্মণরা ও তাদের বংশধরদের সাহায্যে পুনরায় বেদের ক্রিয়াকাণ্ড মধ্যবঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু অন্যত্র, বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ রয়ে গেল। সাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকৃত বৌদ্ধমতেরই সমধিক প্রচলন ছিল।[১৩] কিন্তু হিন্দুধর্মে বেদ পাঠ আগের রীতি মেনেই চলছিল। মধ্যযুগেও তা ছিল মুখস্থ কিংবা আবৃত্তি করার ব্যাপার। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় কিছুটা লেখার ধারাও চালু হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ ব্রাহ্মণদের ৪৭ অক্ষর এবং এসব অক্ষরের যোগে বিভিন্ন শব্দ গঠনের কথা বলেছেন। প্রতিটি প্রদেশের প্রশাসকেরা সব ঘটনার লিখিত নথি রাখত বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

শিশুরা সাত বছর বয়সের আগেই বারো অধ্যায়ের *সিদ্ধ-বাস্তু* পাঠ করত। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে বৌদ্ধ যুগের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম থেকে জানা যায় যে শিশু শিক্ষার্থী সর্বপ্রথম পরিচিত হতো 'সিদ্ধম'-এর সঙ্গে অথবা দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত প্রাথমিক পুস্তকের সঙ্গে। ওই পুস্তকে সংস্কৃত বর্ণমালা ও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যৌথ বিন্যাস ছিল। বলা হয়ে থাকে যে সিদ্ধম, সিদ্ধবাস্তু বা সিদ্ধবস্তু মহেশ্বর প্রথম শিখিয়েছিলেন এবং শিশুরা এটা ছয় মাসে মুখস্থ করে। ছয় বছর বয়সে শিশুরা *সিদ্ধ-বাস্তু* মুখস্থ করত। সিদ্ধবাস্তু ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় মাত্র। সাত বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করার পর তা শেষ হলে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী কিশোরেরা ১৬ বছর বয়সের পর পঞ্চবিদ্যা শিখত। সাধারণত ১৬ বছরের কম বয়সীরা এই শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি লাভ করত না—কারণ, এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিজগৃহ ছেড়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতে হতো। হিউয়েন সাঙের মতে, এই পঞ্চবিদ্যা হচ্ছে শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা। আর ব্রাহ্মণরা এর ওপর আবার চার বেদ পড়ত। এদের শিক্ষা শেষ হতো ৩০ বছর বয়সে। হিউয়েন সাঙের বিরবণ থেকেও লিপিশালা, পাঠশালা বা লেখা, পড়া, আর গণিত শেখার সাধারণ ধারা সম্পর্কে খুব একটা নতুন খবর পাওয়া যায় না। ছয় বছর বয়সে লেখা শেখানো হতো এমন কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। *সিদ্ধ-বাস্তু* মুখস্থ করা হতো বলেই উল্লেখ আছে। পরবর্তী চীনা পর্যটক আই সিন ৪৯টি অক্ষরের উল্লেখ করেছেন। *সিদ্ধ-বাস্তু*তে এসব অক্ষরযোগে ৩০০ শ্লোক থাকত, যা মুখস্থ করতে হতো। চারটি পদে তৈরি একটি শ্লোকে ৩২টি শব্দাংশ থাকত। এরপর আট বছর বয়সে আট মাস ধরে ব্যাকরণের

১৩ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাঙ্গলা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৩৪।

মূল সূত্রগুলো মুখস্থ করতে হতো।

স্বভাবতই বৈদিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গুরুগৃহকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গুরুগৃহে বাসকালে শিক্ষার্থী যে শিক্ষালাভ করত, তাকে 'গুরুকুল' শিক্ষাও বলা হতো। এটাই ছিল সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা। গুরুকুলকে বৈদিক যুগের মূল শিক্ষাকেন্দ্রও বলা যায়। বিভিন্ন গুরু বা ঋষি পরিচালিত 'গুরুকুল' বিভিন্ন হলেও এর পরই শুরু হতো উচ্চতর শিক্ষা। পরবর্তীকালে পরিষদ এবং বিতর্ক সম্মেলনও ছিল একধরনের উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র। উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্ররা গুরুকুলের প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেই তাঁদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের তত্ত্ব আলোচনা করতেন অথবা প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা বিশেষ ঋষি শিক্ষকের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। সত্যিকার অর্থে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈদিক শিক্ষাচিন্তার অচলায়তন ভাঙতে শুরু করে। শিষ্যদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জন্ম নিতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল বেদ-বিরোধিতা, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও বর্ণাশ্রম-চতুরাশ্রমপ্রথাকে অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। বিশেষ বর্ণের সীমায় শিক্ষাকে আবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষায় সর্বজনীনতাকে বৌদ্ধধর্ম স্বীকৃতি দিয়েছিল; গণশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বৌদ্ধযুগে।[১৪] কিন্তু মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহ্য যেমন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল, বৌদ্ধশিক্ষার ক্ষেত্রেও তা-ই ছিল। মূলত বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় আলোচনা ও বিতর্ককে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পূর্ণ ভিক্ষুত্বপ্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হতো। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধশিক্ষা পাঠক্রম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমেই রসায়ন, ভেষজ, চিকিৎসা, শিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বিশেষ করে নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্রে লিখন ও পুঁথির অনুলিপি তৈরি করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ জন্য 'রত্নসাগর', 'রত্নদধি', 'রত্নরঞ্জক' নামে তিনটি বিশাল গ্রন্থাগার তিনটি বৃহৎ অট্টালিকায় স্থান পায়। নালন্দার পাঠক্রমে শুধু তত্ত্বগত বিষয়ই ছিল না, সৃজনশীল বাস্তবসম্মত বিষয়ও স্থান পেয়েছিল। নালন্দার বহু আগে প্রথমাবস্থায় তক্ষশিলা ছিল বৈদিক শিক্ষার কেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগে তক্ষশিলা বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। নালন্দায় বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বাংলায় এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।

বাংলার শাসক বল্লাল সেন তাঁর *দানসাগর* গ্রন্থের শিক্ষাদান অধ্যায়ে শেখা ও শেখানোর আদর্শ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করেছেন। 'ভূমিদান' ও 'শিক্ষাদান' নামক দুই অধ্যায়ে সেন আমলে বাংলায় সংস্কৃত

১৪ বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

উচ্চশিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। শিক্ষাপ্রক্রিয়ার বাচনিক বা কথ্যধারা এই 'শিক্ষাদান' ধারণার অন্তর্ভুক্ত। বাংলার প্রথম মনুস্মৃতির টীকাতিথির মতে, 'অধ্যয়ন' শব্দের অর্থ উচ্চারণ বা আবৃত্তি ও তা শ্রুতিগোচর করা। মনে রাখতে হবে বেদকে শ্রুতি বলা হয়, যার অর্থ গুরুর উচ্চারণ বা আবৃত্তি শ্রবণ। আর শাস্ত্রীয় বিধানসমূহকে বলা হয় স্মৃতি, যার অর্থ স্মরণ-উদীর্ণ। আসলে সংস্কৃতে শিক্ষা কথার অর্থ অধ্যবসায় বা পুনঃপুন অভ্যাস করা। শিক্ষা ছয় বেদাঙ্গের একটি বিজ্ঞান, যা সঠিক উচ্চারণ ও উচ্চারণের বিবিধ কৌশল আয়ত্ত করার অভ্যাস। শিক্ষার সংজ্ঞা থেকেই এ কথা পরিস্ফুট যে এতে লেখার কোনো স্থান নেই। অন্তত প্রাচীনকালে ছিল না। ফা হিয়েন ভারত ভ্রমণ করেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে। তখনো মুখে মুখে শুনে শাস্ত্র শেখার রেওয়াজ ছিল বলেই তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। ফা হিয়েন সারা উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন সংঘারাম ঘুরেও *বিনয়পিটক*-এর কোনো পুঁথি সংগ্রহ করতে পারেননি। শেষে পাটনায় এসে বিনয়ের একটা পুঁথি হাতে পান। এর থেকে বোঝা যায়, পুঁথি লেখা এবং লেখা পুঁথির সাহায্যে শিক্ষার প্রথা তখনো তেমন চালু ছিল না। বরং গুরুমুখে শুনে কণ্ঠস্থ করার রেওয়াজ তখনো চলছে। লিপিশালা বা লেখার প্রথা যদি ব্যাপক প্রসার লাভ করত, তবে নিশ্চয়ই বিনয়ের মতো ধর্মগ্রন্থের পুঁথির এমন অভাব দেখা যেত না। সপ্তম শতাব্দীতেও শাস্ত্রীয় শিক্ষা বাচনিক ধারাতেই চলত, কেননা লিখিত পাণ্ডুলিপির কোনো ভূমিকা দৃষ্টিগোচর হয়নি। এগারো বা বারো শতকের আগের পুঁথি মাত্র দু-একটিই পাওয়া গেছে, বেশির ভাগ পুঁথি যা পাওয়া গেছে, তা বারো শতকের পর লিপি করা।

বাচনিক বা কথা ধারায় শেখা ও শেখানোর প্রথা, শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের একাধিপত্যকে সুনিশ্চিত করে। শিক্ষা একমাত্র শিক্ষকের থেকেই পেতে হবে। কাজেই *দানসাগর*-এর 'শিক্ষাদান' অধ্যায়ে শিক্ষকের প্রশংসা বা গুণকীর্তন একটি প্রধান বিষয়। *দানসাগর*-এ বলা আছে, শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা যেহেতু ফলপ্রসূ হয় না, তাই শিক্ষক সর্বদাই সম্মানীয়। শিক্ষকের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে যে সর্বদা মাল্য, বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা শিক্ষককে পিনাকী বা শিবজ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে সে সেই অনুযায়ী ফল লাভ করবে। অতএব সব শিক্ষার্থীরই যত্নসহকারে এ কাজ করা উচিত। *দানসাগর* অনুযায়ী শাস্ত্রীয় বিদ্যার চৌদ্দটি শাখা বা বিভাগ ছিল। সেগুলো হচ্ছে চার বেদ, ছয় বেদাঙ্গ বা বেদের আনুষঙ্গিক বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র পুরাণ, মীমাংসা অর্থাৎ কর্মমীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত এবং তর্কবিদ্যা। এই চৌদ্দ শাখা থেকে আরও অনেক প্রশাখার উৎপত্তি হয়েছিল। যেমন: আয়ুর্বেদ, শস্যবেদ, ধনুর্বেদ, আত্মবিদ্যা, কলাবিদ্যা, বার্তা, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি। যদিও তখন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাধারায় মুখস্থ করার প্রক্রিয়াকেই গুরুত্ব

দেওয়া হচ্ছিল, তবুও বল্লাল সেনের গ্রন্থ রচনা এটা প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণসহ অন্য সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাদের পবিত্র রচনাসমূহ সংরক্ষণ এবং সংবহনের কাজে লেখন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় রূপে ইতিমধ্যে গণ্য হয়েছে। যখন শুধু স্মৃতির ভরসাতেই সংরক্ষণ করা হতো, তখনকার চেয়ে লেখনের মাধ্যমে সঠিকরূপে এসব টিকে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে গেল। বিশেষ করে গদ্যের ক্ষেত্রে। যদিও শিক্ষকেরা নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের মুখস্থ করার ব্যাপারটাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছিলেন।

দানসাগর-এ শিক্ষকের গুণাবলি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। *দানসাগর*-এর মতে, যে শিক্ষক অর্থ প্রকাশের উপযুক্ত বাগ্‌ধারা ও উচ্চারণের প্রাসঙ্গিক কৌশলসমূহে পারঙ্গম হয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সব যুক্তিপরম্পরায় প্রকাশে সমর্থ, তিনি গুণময় শিবশম্ভুর সমতুল্য। সূর্যের আলো ব্যতিরেকে যেমন পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন, তেমনি শাস্ত্রসমূহ শিক্ষকের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে দুর্বোধ্য। উচ্চারণের কৌশল রপ্ত করে সঠিক উচ্চারণে পারঙ্গম না হলে এবং ব্যাকরণ, অলংকার ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী না হলে, শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও যুক্তিপরম্পরা উপলব্ধি ও ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় বাচনিক ধারার প্রাধান্য বা একাধিপত্য এই আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট। এখানে মনে রাখতে হবে প্রাক্ পাণিনি বৈদিক ভাষায় বহুক্ষেত্রেই উচ্চারণভেদে অর্থভেদ ঘটত। কাজেই উচ্চারণবিধি বা কৌশল রপ্ত করা শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য ছিল। সে জন্য সেই যুগের ছন্দোবদ্ধ আবৃত্তি ছিল একটি সুকুমার কলা। শিক্ষকের মুখ থেকে শোনা মন্ত্র নির্দিষ্ট ছন্দে ও ধ্বনিসহযোগে শিষ্যকে আয়ত্ত করে স্মৃতিতে ধরে রাখতে হতো। এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বল্লাল সেনের আমলে শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় পাণ্ডুলিপির কিছু স্থান ছিল, এমন সাক্ষ্যও পাওয়া যায়। বল্লাল সেন তাঁর *দানসাগর*-এ কীভাবে পুঁথি নকল বা অনুলিপি করতে হবে, কীভাবে তা সংশোধন করতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথোচিত ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা যথার্থভাবে শ্রুতিগোচর করার নিয়ম ও পড়ার পদ্ধতি বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

দানসাগর-এ বলা হয়েছে, পাণ্ডুলিপির বা পুঁথির অনুলিপিকারক পূর্বমুখী হয়ে সোনা, রুপা বা হাতির দাঁত অথবা ভালো কাঠের উপযুক্ত লেখনীর সাহায্যে মূল পাণ্ডুলিপির বিষয়সমূহ ভূর্জপত্রে বা অন্যপত্রে লিপিবদ্ধ করবে। অনুলিপির পত্রগুলো আকারে লেখা অংশের দ্বিগুণ হবে। অনুলিপি সাঙ্গ হলে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে সঠিক লিপি হয়েছে কি না। কীভাবে এই পাণ্ডুলিপির বিষয়সমূহ শিক্ষক পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষক হবেন একজন দক্ষ, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, যিনি শুধু লিপির অর্থ

উদ্ধারেই সমর্থ হবেন না, সেই সঙ্গে ছন্দবিজ্ঞান ও শব্দশাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে। তিনি হবেন সুকণ্ঠের অধিকারী এবং যথার্থ উচ্চারণে পারঙ্গম। তা ছাড়া বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় থাকবে তাঁর অধিকার। *দানসাগর*-এ উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিশ্চয়ই সহজলভ্য ছিল না। শিক্ষককে উজ্জ্বল সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, সূর্য যেমন পৃথিবী থেকে অন্ধকার দূর করে, তেমনি শিক্ষক তাঁর প্রাজ্ঞ উচ্চারণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করেন। শিক্ষার্থী কীভাবে শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনবে এবং কীভাবে পাণ্ডুলিপি পাঠ করবে, সে বিষয়েও *দানসাগর*-এ বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থী শিক্ষকের দিকে মুখ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষকের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনবে। কোনোভাবেই অন্যমনস্ক হবে না বা শিক্ষকের পড়ানোয় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকলে, শিক্ষকের ব্যাখ্যা শেষ হলে তবেই ছাত্র তা বিনম্রভাবে ব্যক্ত করবে। কিন্তু কোনোক্রমেই শিক্ষকের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করবে না।[১৫]

বল্লাল সেন বারো শতকের শুরুতে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। বল্লাল সেনের বাবা বিজয় সেন তার কিছুকাল আগে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। বল্লাল সেন বা সেন বংশের রাজত্বের আগে বাংলায় তিন শ বছরের অধিক সময় পাল রাজাদের শাসন ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে পাল শক্তির পতন বৌদ্ধধর্মের ওপর আঘাত হানল। পাল রাজাদের আমলে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত বাংলায় পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে সেন রাজাদের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ বা শাস্ত্রের কঠোর নিয়মসমূহের কিছু সংশোধন বা সংস্কার সাধন করে অনেকটাই নমনীয় করে তোলা হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে সংগতভাবেই অনুমান হয়, সেই সময় পাঠারম্ভের সংস্কার হিসেবে উপনয়ন সংস্কার তার তাৎপর্য হারিয়ে শুধু দ্বিজ সংস্কার বা পৈতে সংস্কারে পর্যবসিত হয়েছিল। এই সময়েই বাংলায় আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারার প্রবর্তন হয়, যা টোল নামে পরিচিত। সাধারণভাবে, সেন যুগে অর্থাৎ এগারো ও বারো শতকে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা বাংলায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল বলেই অনুমান করা যায়। সেন বংশের কুলপ্রধান সেন রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় শিক্ষাচর্চা বা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাংলার বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উর্বর গ্রাম দান করে বাংলায় বসতি করান বলেই কথিত আছে। এর পক্ষে কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাংলায় সেনযুগে বৈদিকধর্ম এবং বেদ শিক্ষা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই প্রসার লাভ

১৫ পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা*, কলকাতা : অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ১৫২-১৫৩।

করেছিল। সাধারণের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ মতেরই প্রভাব অধিক ছিল। কিন্তু মুসলিমদের আগমনে ভারতের শিক্ষাধারা আবার ভিন্ন মাত্রা পেতে থাকে। মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল ব্যাকরণ, বাগ্মিতা, তর্কবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, অধিবিদ্যা, সাহিত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ঔষধশাস্ত্র এবং ব্যবহারশাস্ত্র। মোগল যুগের শেষ ভাগে পাঠক্রমে যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানগুলোর প্রাধান্য দেখা যায়। সম্রাট আকবর-সৃষ্ট ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিটিও উল্লেখযোগ্য। পড়তে শেখার পরে লিখতে শেখার ফারসি পদ্ধতিটির পরিবর্তে লিখতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শেখার পদ্ধতিটিকেই তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন। সময় বিভাজনও ঘোষিত হয়েছিল। যথা উচ্চারণসহ অক্ষর শেখার জন্য দুদিন, অক্ষরগুলো সাজানোর জন্য এক সপ্তাহ। তারপর অক্ষর সংযুক্ত করে ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষাসংবলিত ছোট গদ্য ও পদ্য পড়া এবং শেষে নিজে নিজে পড়তে শেখা। আকবর চারটি দৈনিক কার্যসূচি ঘোষণা করেছিলেন—অক্ষর শেখা, অক্ষর সাজানো, নতুন পড়া এবং পুরোনো পাঠের পুনরাবৃত্তি।[১৬] মুসলিম ও মোগল যুগের শিক্ষায় এভাবেই লিপিশিক্ষা ও লেখার বিষয়টি পাওয়া যায়, পুঁথির ব্যবহার আরম্ভ হয়। মুসলিম শাসনে বাংলা এর বাইরে ছিল না।

কালক্রমে বাংলার শিক্ষাধারায় পুঁথি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ে পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি রচনাও 'বিদ্যাদান' হিসেবেই স্বীকৃতি পেত। শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় পাণ্ডুলিপির ভূমিকা স্বীকৃতি পেলে শিক্ষা বা অধ্যয়নের সংজ্ঞারও সংস্কার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ষোলো শতকের প্রখ্যাত বাঙালি স্মৃতিকার ছিলেন রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের মতে, তিনভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে, যেমন 'বাচিক' বা উচ্চকণ্ঠে পাঠ, 'উপাংশু' বা অনুচ্চ স্বরে পাঠ এবং 'মানস' বা মনে মনে পড়া।[১৭] সন্দেহ নেই, এই মানস চর্চা বা মনে মনে পড়ার সঙ্গে পুঁথির সম্পর্ক বাংলার সংস্কৃত শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। যদিও শিক্ষক ও বাচনিক ধারার প্রাধান্য বজায় ছিল। আসলে পাণ্ডুলিপির ব্যবহার প্রধানত শিক্ষকের পড়ানোয় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা খুব সহজ ছিল না। কথিত আছে, বাসুদেব পণ্ডিতের টোলে রঘুনাথ নবদ্বীপের পাঠ শেষ করেন। বাসুদেব নিজে আবার মিথিলায় গিয়ে মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সার্বভৌম উপাধি লাভ করে দেশে ফিরেছিলেন। দেশে ফিরে অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে তিনি *কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থটি অবিকল লিখে ফেলেন। বাসুদেবকে নিয়ে এ রকম গল্প আছে: একবার একজন

১৬ বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

১৭ স্মৃতিতীর্থ শশীভূষণ সম্পাদিত, *জ্যোতিষতত্ত্বম্*, কলকাতা ১৩৩৪, পৃ. ৩৪২।

তাঁর ঝোলার মধ্যে কী কী পুঁথি আছে দেখতে চাইলে তিনি উত্তর দেন, 'পুঁথিতে কী প্রয়োজন! গুরুর কৃপায় সবই স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে'।[১৮]

রঘুনন্দনের মতে, যে ব্যক্তি শিক্ষালাভ করেছে তার আবশ্যিক কর্তব্য উপযুক্ত কোনো শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা। তিনি বেদের সাক্ষ্যে, যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করেছে অথচ শিক্ষাদান কর্তব্য পালন করেনি, তার মুক্তির পথ রুদ্ধ এমনই বলেছেন। এই শিক্ষাদান ত্রিবিধ উপায়ে করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ তিন উপায় হচ্ছে: শিক্ষক হিসেবে, কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যাকার হিসেবে বা পুঁথি রচনা করে।[১৯] রঘুনন্দন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মনুর অনেক বিধানেরই সংস্কার করেছিলেন। রঘুনন্দন আগের ব্রাহ্মণদের মতো শূদ্রদের শিক্ষার ব্যাপারে কঠোর থাকেননি। সমাজ বাস্তবতার কারণে সেটা আর সম্ভবও ছিল না। রঘুনন্দনের মতে, ব্রাহ্মণের উপনয়ন হবে সাধারণত আট বছর বয়সে, কিন্তু 'ব্রহ্ম তেজস্কামী ব্রাহ্মণে পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন করা উচিত'।[২০] কালানুসারে রঘুনন্দনের সময় বিদ্যারম্ভের সংস্কার হিসেবে উপনয়নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য হ্রাস পায়। ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্যপালনীয় সংস্কার হিসেবে উপনয়নের গুরুত্ব বজায় থাকলেও তা শুধু পৈতে সংস্কার হিসেবেই পালিত হতে থাকে। উপনয়নের সঙ্গে বিদ্যারম্ভের সম্পর্ক রীতিমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। অন্যপক্ষে প্রাক্-উপনয়ন বিদ্যারম্ভ সংস্কার প্রাধান্য পেতে থাকে, যা 'হাতেখড়ি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নানা দিক বিবেচনা করে মনে হয়, আই সিনের দেওয়া বিবরণ ও বৌদ্ধ আমলের পার্থিব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরবর্তী টোল-চতুষ্পাঠীর উৎস খোঁজার চেষ্টা করা যায়। গুরুগৃহ বা তপোবন আশ্রম থেকে টোল-চতুষ্পাঠীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারার রূপান্তরের পথে হয়তো বৌদ্ধ মঠের শিক্ষাধারা একটা মধ্যবর্তী ধাপ। টোল ও চতুষ্পাঠীর শিক্ষায় দেখা যায় কাব্য-ব্যাকরণের প্রাধান্য। আর গুরুগৃহে বেদপাঠের যে প্রাধান্য, তা টোলের শিক্ষায় নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বাংলার টোলগুলো সম্পর্কে এ কথা খুবই ঠিক।

মুসলিম শাসকদের আমলে ষোলো শতকের বাংলায় আগের ব্রাহ্মণদের নিয়মের বহু ব্যত্যয় ঘটে। বেদপাঠে সবার অধিকার না থাকলেও শিক্ষালাভের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। শিক্ষালাভের জন্য সর্বক্ষেত্রে আর উপনয়নের দরকার হতো না। সাধারণের জন্য উপনয়নের জায়গায় 'হাতেখড়ি'র প্রচলন শুরু হয়। হিন্দুসমাজের চার বর্ণের শিশুরাই পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ সংস্কার বা হাতেখড়ির অধিকার লাভ করে। রঘুনন্দন বিদ্যারম্ভের পর এবং উপনয়নের আগেই শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন। এমনকি শিক্ষক বা গুরুর

১৮ কালীপসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাঙ্গলা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৫৬।

১৯ স্মৃতিতীর্থ শশীভূষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২।

২০ ঐ, পৃ. ৩৪৯।

সংজ্ঞা বিষয়েও রঘুনন্দন যথেষ্ট উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, গুরু সে-ই যিনি বিদ্যা দান করেন, পুঁথি রচনা করেন বা শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী সংস্কৃত, প্রাকৃত বা শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষণীয় বিষয় ব্যাখ্যা করেন। লক্ষ করার বিষয়, বাংলার পণ্ডিতেরা শাস্ত্রব্যাখ্যায় মাতৃভাষার তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হয়তো বৌদ্ধ ঐতিহ্য এ বিষয়ে তাঁদের কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান যে বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি, তা বোঝা যাচ্ছে। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, যখন মাগধী সভ্যতা নানাভাবে বিভক্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ, মগধের লোকেরা তখন ক্রমাগত পূর্বমুখী হয়ে বাংলায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। দীনেশচন্দ্র সেন আরও লিখেছেন, বৌদ্ধ সংঘারামগুলো নষ্ট হওয়ার পর বাংলাদেশজুড়ে টোল বসার উদ্‌যোগ শুরু হয়। সংঘারামগুলো ধ্বংস হওয়ার পর কে আর তিন শ ফুট উঁচু বিরাট মঠ নির্মাণ করবে বা বিশাল আয়তনের বিহার নির্মাণ করার টাকা কে জোগাবে, তাই তার স্থলে ছোট ছোট কুটিরে টোল বসে গেল।[২১]

বৃন্দাবন ঠাকুর লিখেছেন, ষোলো শতকে নবদ্বীপের টোলগুলোতে বহুসংখ্যক পড়ুয়া ছিল। সতেরো শতকে নবদ্বীপের টোলগুলো খুব জোরেশোরে চালু হয়েছিল। *ক্যালকাটা মান্থলির* ১৭৯১ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় লেখা হয়েছে, নবদ্বীপের টোলগুলোর গৌরব সর্বজনবিদিত। টোলগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল খুবই আলোচিত; নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও গোপালপাড়ার টোল। এগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। নবদ্বীপের টোলেই প্রায় ১১০০ ছাত্র এবং ১৫০ জন অধ্যাপক রয়েছে। কিন্তু টোলগুলোর অবস্থা তখন পড়ন্ত দশায়। পত্রিকার প্রতিবেদক আরও জানাচ্ছেন যে রাজা রুদ্রের সময় ১৬৮০ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল চার হাজার এবং অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল ছয় শ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বহু দূরদেশ থেকে নদীয়াতে ছাত্রসমাবেশ হয় এবং ছাত্রমণ্ডলীর অধিকাংশই প্রৌঢ়। কারণ তাঁরা বহুকাল অন্যত্র দর্শন অধ্যয়ন করার পর নবদ্বীপের ন্যায়দর্শন পাঠ করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

যারা সাহিত্যচর্চার জন্য নবদ্বীপের টোলে আসে, তারা প্রত্যেকেই টোলের বৃত্তি লাভ করে। তারা যেসব গ্রন্থ পাঠ করে, তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতে হয়। যখন দুজন অধ্যাপক দর্শন নিয়ে কোনো একটা মত নিয়ে তর্ক করেন, ছাত্রছাত্রীদের তা শোনার অধিকার থাকে। যদি কারও কাছে অধ্যাপকদের আলোচনা ও তর্ক দুরূহ বা জটিল মনে হয়, তাহলে সেই ছাত্র দরকারমতো প্রশ্ন করে বিষয়টি বুঝে নেওয়ার

২১ দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ ১৪১-১৪৫।

অধিকার রাখে। বিদ্যাদান করে অর্থগ্রহণ ওই সব অধ্যাপক পাপ মনে করেন। নবদ্বীপের টোলে সাধারণত স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র পড়ানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে নদীয়ার খ্যাতি ভারতব্যাপী। ভারতের সর্বস্থান থেকেই এখানে ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসে। স্মৃতির টোলে সাধারণত আট বছর পড়তে হয়, ন্যায়ের টোলে দশ বছরের কম নয়। টোলগুলো মাসে ১০ দিন করে বন্ধ থাকে। প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের দুই তিথিতে টোল বন্ধ রাখা হয়। এ ছাড়া সরস্বতী পূজায় দুই সপ্তাহ এবং অন্যান্য পর্ব উপলক্ষে ছাত্ররা ছুটি পায়। ন্যায়ের টোলের ছাত্ররা আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত ছুটি ভোগ করে, স্মৃতির টোলের ছাত্ররা ভাদ্র থেকে কার্তিক পর্যন্ত। নবদ্বীপের টোলের পাঠ শেষ করতে পারলে সে পণ্ডিত ভারতের সমস্ত বিদ্যাকেন্দ্রে সম্মানিত হয়।[২২]

ন্যায়ই নবদ্বীপের টোলগুলোর প্রধান দিক ছিল। বাংলার টোলগুলোর এই ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধরা স্মৃতি-শ্রুতি স্বীকার করে না। সুতরাং তর্কবুদ্ধি তাদের প্রধান অবলম্বন। স্বয়ং বুদ্ধ তাদের শিষ্যদের বলেছিলেন, 'পণ্ডিতেরা যেভাবে সোনাকে আগুনে পুড়িয়ে নিকষ পাথরে পরীক্ষা করে থাকে—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার কথাগুলোকে সেভাবে পরীক্ষা করে গ্রহণ করবে। কেবল আমার গৌরব রক্ষার জন্য তা গ্রহণ করবে না।[২৩] যার অর্থ দাঁড়ায় বুদ্ধ তার শিষ্যদের অন্ধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতির বিধান অন্ধভাবেই পালনীয় ছিল। তা সত্ত্বেও ইতিহাসের সেই আদিপর্বে হিন্দু দার্শনিকেরা তর্কবিতর্ক দ্বারা সত্য নিরূপণ করার চেষ্টা করতেন। নবীন যুবক নিমাই পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) অল্প বয়সে নবদ্বীপেই পাঠ শেষ করে ব্যাকরণের টোল খুলে শব্দ ও অলংকারশাস্ত্রে প্রতিভার পরিচয় দেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়িতে বড় চণ্ডীমণ্ডপে অনেকের এক সঙ্গে বসে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলে নিমাই রীতিমতো অধ্যাপনা করতেন। সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত টোলে পাঠনা তারপর স্নান-আহার। বিকেলে আবার ভ্রমণের সময় গঙ্গাতীরে শিষ্যসঙ্গে মণ্ডলী করে বসে পাঠাদির আলোচনা—এভাবেই দিবা অতিবাহিত হতো।[২৪] নদীয়াতে এ ধরনের বহু টোলের কথা জানা যায়। নদীয়ার এক প্রান্তে খালপাড়ে বিদ্যানগর পল্লি স্থাপিত হয়েছিল।

মধ্যযুগে বাংলায় সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো টোল নামেই পরিচিত ছিল। উত্তর ভারতে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাধারণত চতুষ্পাঠী বলা হতো।

২২ ঐ, পৃ ১৪৮।
২৩ ঐ, পৃ ১৫১।
২৪ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

সত্যিকারভাবে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে টোল আর চতুষ্পাঠীর মধ্যেও কিছু প্রভেদ ছিল। চতুষ্পাঠী কথার অর্থ চারবেদ পাঠের প্রতিষ্ঠান, যদিও অন্য শাস্ত্র পাঠের সুযোগও থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, উত্তর ভারতের সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চতুষ্পাঠীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়ন আবশ্যিক হলেও বাংলার টোলে বেদ পাঠের তেমন প্রচলন ছিল না। আসলে বাংলায় বেদচর্চা তেমন বিস্তার লাভ করেনি কখনো। বাংলায় সাধারণত তিন ধরনের টোল ছিল। কিছু টোলে প্রধানত ব্যাকরণ, সেই সঙ্গে সাহিত্য, অলংকার ও কখনো পৌরাণিক কাব্য পড়ানো হতো। দ্বিতীয় ধরনের টোলে প্রধানত স্মৃতি এবং সেই সঙ্গে কখনো পৌরাণিক কাব্য পড়ানো হতো। আর তৃতীয় ধারার টোলে ন্যায়শাস্ত্রই ছিল প্রধান পাঠ্য বিষয়।

সাধারণত কোনো বিশেষ টোলে কোনো একটি বিষয়েই উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু প্রায় সব টোলেই ব্যাকরণ ও অলংকার পড়ানো হতো। হয়তো টোলের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের পরিবর্তে কোনো প্রবীণ ছাত্র এসব বিষয়ে পাঠ দিতেন। আবার ব্যাকরণ, অলংকার বা কাব্য-সাহিত্যেও উচ্চতর বিশেষজ্ঞ শিক্ষার প্রচলন ছিল। এসব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তরা সাধারণত ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যতীর্থ বা কাব্যরত্ন উপাধি লাভ করতেন। যাঁরা ন্যায়শাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রে অথবা উভয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষালাভ করতেন, তাঁরা ন্যায়তীর্থ বা স্মৃতিতীর্থ অথবা উভয় উপাধিই লাভ করতেন। একই বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষক ভিন্ন উপাধিও প্রদান করতেন। যেমন : স্মৃতিরত্ন, কাব্যরত্ন, ন্যায়রত্ন, ন্যায়বাগীশ বা তর্করত্ন প্রভৃতি। খুব কম ক্ষেত্রেই একজন শিক্ষার্থী পাঁচ বা সাতটি বিষয়ে উচ্চতর বিশেষজ্ঞ শিক্ষা পেতেন। এসব ছাত্র পঞ্চতীর্থ বা সপ্ততীর্থ উপাধিতে ভূষিত হতেন। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে সাধারণত একাধিক শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন টোলে শিক্ষালাভ করতে হতো। সংখ্যা কম হলেও যাঁরা বেদ বা বেদান্তে বিশেষজ্ঞ শিক্ষালাভ করতেন, তাঁরা বেদান্ততীর্থ উপাধি পেতেন।

ছাত্ররা প্রয়োজনানুসারে যথেষ্ট ব্যাকরণের শিক্ষা পেলে তবেই অন্য বিষয়সমূহ যেমন : কাব্য, স্মৃতি বা দর্শনের পাঠ শুরু করতেন এবং সেই সঙ্গে ব্যাকরণের অনধীত অংশের পাঠ চালিয়ে যেতেন। যেসব ছাত্র স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, তাঁরা এক বা একাধিক টোলে ছয়, আট, এমনকি দশ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। টোলের পাঠাভ্যাস প্রধানত বাচনিক ধারায়ই চলত—এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যদিও পুঁথির ব্যবহারও চালু ছিল পাশাপাশি। টোলের শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় উচ্চস্বরে পাঠ ও শোনার গুরুত্বই ছিল সবচেয়ে বেশি। লক্ষণীয় যে প্রধানত মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করার দ্বারা বাংলার টোলের শিক্ষাপ্রক্রিয়া নির্বাহিত হলেও এই ব্যবস্থা অনেক সৃজনশীল প্রাজ্ঞপণ্ডিতের জন্ম দিয়েছে। বাংলায় বিভিন্ন ধরনের ও বিশেষ বিষয়ের উচ্চশিক্ষার টোল ছিল।

সাধারণত ব্রাহ্মণ বসতিপূর্ণ গ্রামেই এসব টোল অবস্থিত ছিল। কারণ, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিপুলাংশই ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত হতেন। বাংলায় পুঁথির ব্যবহার বৃদ্ধিতেও টোলের শিক্ষক ও ছাত্রদের অবদান যথেষ্ট। অনেক শিক্ষকই পুঁথি রচনা করতেন। মনে রাখতে হবে, পুঁথি রচনার কাজও শিক্ষাদানের মর্যাদা পেত। পুঁথি নকল করা উপার্জনের একটি উপায় ছিল।

বাংলার জমিদার শ্রেণীর উদার ভূমিদান ব্যতিরেকে বাংলায় সংস্কৃত উচ্চশিক্ষা বা বাংলার টোলের শিক্ষাব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হতো না। বাংলার টোল বা সংস্কৃত উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই ভূস্বামী শ্রেণীর ওপর প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই টোল ছাড়াও মধ্যযুগে বাংলায় আরও কয়েক ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায়। মক্তব, মাদ্রাসা ও পাঠশালা। মক্তব ও মাদ্রাসা শাসক বা স্থানীয় ভূস্বামীর সহযোগিতা পেলেও বাংলার পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থা তেমনভাবে ভূস্বামী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। পাঠশালায় লেখা, পড়া এবং অঙ্ক শেখানো হতো। পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থা কবে থেকে চালু হয়েছিল নিশ্চিত করে বলা যায় না। ধারণা করা হয়, কৃষি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষিজমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, লিখিত নথির প্রচলন, হিসাবের নানা জটিলতা ক্রমেই লেখা আর গণিত শেখার প্রয়োজনকে বড় করে তুলেছিল। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি হয়েছিল পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থা। বাংলার ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষিজীবীরা মিলে নিজেদের প্রয়োজনে নিজ উদ্যোগে এই পাঠশালা শিক্ষার ভিত গড়ে তোলে। কৃষক ও কারিগরদের এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বা পার্থিব বিষয়কে কেন্দ্র করে। সাধারণ গ্রাম্য জনসাধারণেরা যুক্তি-তর্ক, ন্যায়শাস্ত্র বাদ দিয়ে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সেই শিক্ষাধারা গড়ে তুলেছিল। ব্রাহ্মণদের দিক থেকেও এ শিক্ষাদানে কোনো বাধা ছিল না। কারণ, সময়ের প্রয়োজনে উৎপাদনব্যবস্থাকে ঘিরেই সে শিক্ষাধারার জন্ম।

বাংলার শূদ্ররা হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী, ব্রাহ্মণেরা তা নয়। বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের তুলনায় অনেক সময়েই শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। এদের বেশির ভাগ ছিল কৃষক ও কারিগর। বাংলার শূদ্র সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই চাষাবাদ বা খেতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। অনেকে ব্যবসা ও হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যবসার চেয়ে জমি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার তৎকালীন সমাজ এই শূদ্রদের উপেক্ষা করতে পারেনি। কারণ, ঠিকমতো জমি চাষ বা কর্ষণ না হলে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের সর্ববৃহৎ বা ব্যাপক অংশজুড়ে আছে শূদ্ররা, সামাজিক কাঠামো থেকে এদের বাদ দেওয়া হলে সমাজব্যবস্থাই টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। ফলে, মনুর কঠোর বিধান ক্রমেই নমনীয় হয়ে আসে, শূদ্রদের লেখাপড়া করার অধিকার জন্ম

নিতে থাকে। সমাজ বাস্তবতাও শূদ্রদের কিছু কিছু বাস্তব জ্ঞান আহরণের দিকে আগ্রহী করে তোলে। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে শূদ্রদের ব্যবহারিক শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জমিজমা চাষ ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে গণনা ও হিসাবের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সে জন্য অন্তত গণিত শিক্ষা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাংলায় পাল ও সেন রাজবংশের পর ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসনের গোড়াপত্তন হয়। সুলতানি আমলে বাংলায় শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল : প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তর। প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদসংলগ্ন মক্তবে কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মন্দিরে, অভিভাবক বা শিক্ষকের গৃহে, পথিকের বিশ্রামগৃহে, দোকানের কোণে অথবা গাছের নিচে প্রদান করা হতো। মুসলিম সমাজের প্রতিটি শিশু চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে উপনীত হলে তাকে সুন্দর পোশাকে সাজিয়ে পরিবারের সব সদস্য ও অন্য স্বজনদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের সূচনা করা হতো। শিশুটিকে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করানোর চেষ্টা করা হতো—শিশুটি পড়তে না চাইলে তাকে অন্তত 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করানোর প্রথা ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় জোর দেওয়া হতো বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে। পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে *পান্দনামাহ*, *আন্দনামাহ*, *গুলিস্তান*, *বোস্তান* ইত্যাদি ফারসি শিক্ষার গ্রন্থ পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক ছিল। তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যাপার ফারসি ভাষায় প্রকাশ করতে শেখানো হতো। পাশাপাশি ছাত্রদের *ইউসুফ-জোলেখা*, *লাইলি-মজনুর* কাহিনি, *সিকান্দারনামাহ*, *আলেকজান্ডারের বিজয়ের ইতিহাস* ইত্যাদি অধ্যয়ন করানো হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী প্রথমে ফারসি নাম, পরে আরবি এবং তারপর অন্যান্য ভাষায় নাম লেখার অভ্যাস করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ফারসি-আরবির পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল। বাংলা বহু মুসলমানের মাতৃভাষা ছিল বলে বাঙালি মুসলমানরা মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে পারেনি। বহিরাগত মুসলমানরাও বাংলা ভাষা এবং এ দেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[২৫]

বাংলায় সুলতানি শাসনামলে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের বিদ্যালয়গুলো 'মাদ্রাসা' নামে আখ্যায়িত ছিল। সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মক্তব থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তর ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের ওপর কোনো প্রকার বেতন ধার্য করা হতো না। মুসলিম শাসক ও সম্পদশালী অভিজাত ও জমিদারবর্গ করমুক্ত জমি দান করে মসজিদ, মক্তব, টোল ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতেন। পাঠশালার শিক্ষকেরা সামান্য বেতনেই ছাত্রদের নিজগৃহে শিক্ষা দিতেন বা স্থানীয়দের সঙ্গে মিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পাঠশালার গুরুই ছিলেন প্রধানতম বিচারক। ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেই তিনি ছাত্রকে সনদ প্রদান করতেন। রাষ্ট্র কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিক্ষার্থীরা জানত যে শিক্ষকই তাদের মূল্য যাচাই করার একমাত্র কর্তা। সুতরাং, এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য বাছাই করে পড়ার বা ফাঁকি দেওয়ার অবকাশ ছিল না। বাংলায় অধ্যয়ন বলতে পড়াশোনা শব্দবন্ধের ব্যবহার কিন্তু বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বাংলার টোলের শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে 'পড়াশোনা' বললেও বাংলা পাঠশালার শিক্ষাপ্রক্রিয়া থেকেই 'লেখাপড়া' শব্দবন্ধের উদ্ভব বলেই মনে হয়। যদিও পরবর্তীকালে পড়াশোনা ও লেখাপড়া সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। পাঠশালার পড়াশোনা শেষ করে যে কেউ ইচ্ছা করলে টোল বা মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

মুসলিমদের আগমনের আগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম শাসকেরা সুবিধাভোগী হিন্দুশ্রেণীর কবল থেকে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সুবিধালাভের সুযোগ করে দেন। ফলে, নিম্নবর্গের হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুসলিম শাসকেরা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য যে করমুক্ত ভূমি দান করতেন, তা শুধু মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যই ছিল না, হিন্দুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যও করমুক্ত তথা লাখেরাজ সম্পত্তি দান করা হতো। নিষ্কর জমি সরকার থেকে দান করা হতো মাদ্রাসা ও টোলের জন্য, প্রাথমিক শিক্ষা বা পাঠশালার জন্য নয়। পাঠশালা শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। মুসলিম শাসকেরা পাঠশালা শিক্ষার জন্য কোনো নিষ্কর ভূমি বরাদ্দ না করলেও নিম্নবর্গের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সেটা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। হিন্দু কবির রচিত *মানিকচন্দ্র রাজার গান* নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়, মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর 'হরি' ও 'সউদ'গণ দলিলপত্র পড়া ও লেখার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। এমনকি নাপিত ও ঝাড়ুদাররা বিদ্যা ও সাহিত্যজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেন। *নল-দময়ন্তীর* কবি মধুসূদন ছিলেন একজন নাপিত। একজন ধোপা ভাগমন্ত ধোপী *হরিবংশ* লিখে সম্মান অর্জন করেন।

সুলতানি আমলেই বাংলায় মাদ্রাসাশিক্ষার শুরু হলেও তা ছিল সাধারণভাবে মুসলমান শাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে মুসলমান শাসকেরা কখনোই বাংলা ভাষার চর্চা বা শিক্ষার বিরোধিতা করেননি। বরং অনেক সুলতান বাংলার ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হুসেন শাহের নাম বারে বারে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন, 'নৃপতি হুসেন

২৫ মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *'ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা : সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১২।

শাহ হএ ক্ষিতি পতি। সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী।' সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বাড়বাড়ন্ত তাই কিছু অস্বাভাবিক নয়।[২৬] যা-ই হোক, সুলতানি আমলের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় গড়ে ওঠে মধ্যযুগের বিশাল বাংলা সাহিত্য আর পাশাপাশি গড়ে ওঠে বাংলা শিক্ষার প্রথাবদ্ধ ধারা বাংলা পাঠশালা। স্বাভাবিকভাবেই নিচুতলার শূদ্ররাই মূলত এই দুই ধারার ধারক-বাহক। সঙ্গে ছিল আর সবাই। পাদরি উইলিয়াম অ্যাডামের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বর্ধমানের ১৩টি থানায় ৬২৯টি পাঠশালায় ৬৩৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৫৯ জনই ছিলেন কায়স্থ। বাকিদের ১০৭ জন ব্রাহ্মণ, ৫০ জন সদ্‌গোপ, ৩০ জন আগুরি, ১৩ জন বৈষ্ণব, ১০ জন তেলি, নয়জন ভট্টা, ছয়জন গন্ধবণিক, ছয়জন কৈবর্ত, দুজন বাগদি; আর নাগ, তাঁতি, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, যুগী, বাড়ুই, কামার, ময়রা, ধোপা, রাজপুত ও কলু একজন করে। নয়জন মুসলমান আর তিনজন খ্রিষ্টান। বীরভূমে মোট যে ৪১৪ জন শিক্ষক সম্পর্কে খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ ছিল মোট ৩৫৪ জন। বাকিরা অন্য বর্ণের বা ধর্মের। একমাত্র কায়স্থ শিক্ষকের সংখ্যাই ছিল ২৫৬। একজন ছিলেন মুসলমান শিক্ষক আর চারজন খ্রিষ্টান। দক্ষিণ বিহারে ২৮৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৭৮ জনই ছিলেন কায়স্থ। মুর্শিদাবাদে ৬৭ জন শিক্ষকের ৩৯ জন ছিলেন কায়স্থ।[২৭]

সুলতানি আমলে গড়ে উঠলেও সতেরো শতক নাগাদই বাংলা পাঠশালার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। সতেরো-আঠারো শতকের বাংলা সাহিত্য ও বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে পাঠশালার উল্লেখ ও বর্ণনার ছড়াছড়ি। পাঠশালার প্রধান দুটি শিক্ষার বিষয় ছিল লেখা আর গণিত। উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮০৩ সালে লিখেছেন যে বাংলার প্রায় সব বড় গ্রামেই সাধারণ বিদ্যালয় ছিল। খড়-ছাওয়া মাটির ঘরে অথবা ছায়াযুক্ত গাছের তলায় এসব পাঠশালা বসত এবং দরিদ্র জনগণের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন এই পাঠশালা বহুকাল ধরে মিটিয়ে আসছিল।[২৮] তিনি আরও জানাচ্ছেন, গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে পার্থিব শিক্ষা দেওয়া হতো। পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'অক্ষরে পরিচিতির পর যুক্তাক্ষর লিখতে হতো। তারপর মানুষের নাম, গ্রামের নাম, পশুপাখির নাম লিখতে হতো। পরে অঙ্ক লেখা শুরু হতো। পাতায় লেখা শুরু হলে পড়ুয়ারা দিনে দুবার সর্দার পড়ুয়ার সঙ্গে কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ ও কাহনের নামতা মুখস্থ বলত। তারপর এক থেকে

২৬ পরমেশ আচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

২৭ কাজী শহীদুল্লাহ, *পাঠশালা থেকে স্কুল*, আবদুল মমিন চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৭।

২৮ সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃ. ১১।

এক শ পর্যন্ত সংখ্যা ও নামতা মুখস্থ করতে হতো। শেষে কলাপাতায় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং ওজনের নিয়ম ইত্যাদি শিখতে হতো। বড় ছেলেরা সাধারণ চিঠিপত্র ও দলিল বা চুক্তিপত্র লিখতে শিখত।' উনিশ শতকের প্রথম দশকেই বুকানন হ্যামিলটন জানাচ্ছেন যে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা হতো পাঠশালায় কোনো গুরুমশাইয়ের কাছে। আর এই গুরুমশাইরা যেকোনো বর্ণের ও ধর্মের হতো। এসব পাঠশালায় শিক্ষকের জন্য কোনো সরকারি অনুদান বা সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না। জীবনধারণের জন্য তাঁদের সম্পূর্ণভাবে পড়ুয়াদের ওপর নির্ভর করতে হতো। তিনি আরও জানাচ্ছেন যে পাঁচ বছর বয়সেই শিশুরা পাঠশালায় যেত। এরা একই সঙ্গে লিখতে ও পড়তে শিখত। এই পদ্ধতি ছিল দারুণ।

খাতি অনুস্মৃতি চিন্তা

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাক্ষাৎকার

‘সওগাত’ ও আমার জীবনকথা

[মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে, কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর থানার পাইকারদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। শুরুতে তিনি বিমা কোম্পানির একজন বিমাকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তারপর তিনি এ পেশা ছেড়ে কলকাতায় এসে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯১৮ সালের ২ ডিসেম্বর তিনি প্রথম সচিত্র সাহিত্যিক পত্রিকা *সওগাত* প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্থের অভাবে ১৯২২ সালে *সওগাত* পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তিনি ১৯২৬ সালে এটি আবার প্রকাশ শুরু করেন, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি সওগাত সাহিত্য মজলিশ গঠন করেন। যার মাধ্যমে তরুণ লেখকদের সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করে তোলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতায় সওগাত কালার প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, যা মুসলিম সমাজ সংস্কারে ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ১৯৪৬ সালে তিনি নারীদের জন্য *বেগম* পত্রিকা নামে আরেকটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৫৪ সাল থেকে *সওগাত* আবার প্রকাশ হতে থাকে। তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সাল থেকে তাঁর নামে ‘নাসিরউদ্দীন স্বর্ণ পদক’ চালু হয়, যা তরুণ লেখক ও সাংবাদিকদের দেওয়া হয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৯৯৪ সালের ২১ মে ঢাকায় মারা যান। এ লেখায় ১৯৪১-’৪২ সাল অব্দি সময়ের তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে ধরা হয়েছে। একজন সম্পাদক হিসেবে তার এ জীবন-অধ্যায় বর্তমান সময়ের বিবেচনায় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।]

১. জীবনকথা

আমার জীবন বলতে *সওগাত*-এর জীবনকেই বুঝি। কারণ, আমার ব্যক্তিগত জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। আমার যা-কিছু অর্জন, তার সবই *সওগাত*-এর কারণে। *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* নামে আমার লেখা একটা বই আছে। এ বইতে সেকালে যাঁরা লেখক-লেখিকা ছিলেন, তখন তাঁরা কীভাবে কোন পরিবেশ থেকে লিখতেন, সে কথাও আছে। বইটা এসব কিছুরই সংকলন এবং আমার নিজেরও কিছু কথা আছে তাতে। এভাবেই শেষ করেছি বইটি।

সাধারণ গৃহস্থঘরেই আমার জন্ম। নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জোরেই কাগজটা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। প্রেস করেছিলাম। আমি দাঁড়িয়েছি একমাত্র নিজের চেষ্টায়।

আমার জন্ম কুমিল্লা জেলার তখনকার চাঁদপুর থানার পাইকারদি গ্রামে। ছোট্ট গ্রাম। ওখানেই আমার জন্ম ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে। সেকালে কেউ কিছুটা আরবি-ফারসি মুখস্থ করতে পারলেই তাকে শিক্ষিত বলা হতো। মাতৃভাষা যে বাংলা, তখনকার মুরব্বিরা সে ব্যাপারে, বলতে গেলে, গুরুত্বই দিতেন না। তার চর্চাও করতেন না। বলতেন, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তাহলে আমাদের ভাষাটা কী?

জবাবে বলতেন, আরবি, ফারসি। অথচ তাদের কেউ আরবি-ফারসি শব্দের মানেই জানতেন না। আর সেটাই ছিল শিক্ষার বাহন এবং সেই যে শিক্ষা, তার পরিণতি হয়েছিল এই যে, কাজকর্ম, চাকরি-বাকরি, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি সবকিছু হিন্দুরাই করতেন। অথচ বাংলার মুসলমানদেরও সবাই বাংলায় কথা বলে। এই অবস্থায় আমার বাবা ঠিক করলেন যে আমাকে মক্তবে পাঠিয়ে প্রথমে নামাজ-রোজা অর্থাৎ ধর্মকর্ম ইত্যাদি শেখাবেন। তারপর পাঠশালায় পাঠাবেন। তখনকার দিনে মুসলমানদের বাংলা পাঠশালা ছিল না। তাই মক্তবের পাঠ শেষে এক হিন্দুপণ্ডিত, তাঁর নাম চন্দ্রকুমার পাল, তাঁর প্রাইমারি স্কুলে (পাঠশালায়) আমার বাবা আমাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। গ্রামের লোকজন বললেন, মক্তবে না দিয়ে ছেলেকে পাঠশালায় দিলেন কেন?

বাবা বললেন, বাংলা-ইংরেজি না জানলে ছেলেটা খাবে কী করে? ভালো কোনো কাজ তো করতে পারবে না। উনিও কিছু বাংলা জানতেন, আর গ্রাম্য ভাষায় পদ্য রচনা করতেন। সেকালে দেখেছি সন্ধ্যার পর তাঁদের সবাই জটলা করে বসতেন এবং নিজেদের মধ্যে পুঁথি পড়া নিয়ে অনেকটা কবির লড়াইয়ের মতো করে প্রতিযোগিতা করতেন। পাঠশালায় যেদিন ভর্তি করালেন, সেদিন তিনি পণ্ডিত মশাইকে দিলেন কিছু মিষ্টি আর এক হাঁড়ি দই। কারণ, বাবা বলতেন যে, পণ্ডিত যদি প্রসন্ন থাকেন, তাহলে ছেলের পড়াশোনা ভালো হবে। সেই কালে এসব পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোকজনকে গ্রামের সাধারণ মানুষ খুবই মান্য করতেন। ছাত্ররা যেমন শিক্ষকদের মানতেন, তেমনি অভিভাবকেরাও তাঁদের মানতেন।

পাঠশালায় পড়া শেষ হলে বাবা এবার আমাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা দেখে গ্রামের লোকজন আপত্তি তুললেন। স্বজনরা নানা ধরনের কথা বলতে লাগলেন। বাবা তাদের সমস্ত ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করে বললেন যে, আমার ছেলেকে আমি ইংরেজি স্কুলেই পড়াব। করলেনও তাই। স্কুলটা ছিল বেশ দূরে। ওটার নাম ছিল হরিনাথ হাইস্কুল। চাঁদপুরের কাছে। আমাদের গ্রাম থেকে তিন-চার মাইল দূরে। সেখানে যেতে হতো মাঠ, সুপারির বাগান—এই সব পার হয়ে। সেই স্কুলে অনেক ছেলে ছিল। তিন শরও বেশি। তার মধ্যে মাত্র তিন কি চারজন মুসলমান ছাত্র। কারণ ইংরেজি স্কুলে মুসলমান ছেলেদের পড়তে দিলে মোল্লা-মৌলবিরা নিন্দা করতেন।

২. সহশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ

যা-ই হোক, স্কুলে তো ভর্তি হলাম। ছোটবেলা থেকেই আমার খবরের কাগজ আর ছবির বইয়ের ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল ছিল। আকর্ষণও ছিল দুর্বার। তখনকার দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বা গ্রামের কোনো নাটক কি যাত্রাগানের অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখতে যাওয়া, বিশেষ করে মুসলমানের ছেলেদের, এমনকি বড়দের জন্যও ছিল নিষিদ্ধ। কেউ গেলে গ্রামের লোকজন বিচার করে তাদের শাস্তি দিতেন। তার পরও আমি যেতাম। শারদীয় পূজার সময় আমাদের গ্রামে বা তার আশপাশের গ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হতো। কিন্তু মুসলমানরা এসবে তেমন বেশি যোগ দিত না। যা-কিছু হতো, হতো হিন্দু ছেলেদের উদ্যোগেই। আমার ওপরের ক্লাসে পড়া একটি ছেলে একদিন আমাকে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বলল। আমি বললাম, বাবা যদি ধরে পিটুনি দেয়, তাহলে কী হবে? তখন কী করব?

ছেলেটা বলল, যা বলছি করে ফেল। 'সোহরাব-রোস্তম' থেকে কয়েকটা সিন তৈরি করে নিল। তারপর আমাকে বলল, এতে তোমাকে পাট দিলাম। এই ফাঁকে কে বা কারা আমার বাবাকে বলে দিল যে আমি নাটক করেছি। আমার বাবা আমাকে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা সত্যি কিনা?

বললাম, হ্যাঁ, সত্যি। আমার ভালো লাগে বলেই করেছি।

বাবা বললেন, গুনাগারির কাজ করেছ।

শাস্তি হলো। কান ধরে উঠবস করানো হলো।

কিন্তু শাস্তি হলে কী হবে, আমার কাছে যে জিনিসটা ভালো লাগত, সেটা আর কিছু নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা, বই আর পত্রিকা পড়া, নাটক করা, আবৃত্তি করা—এই সব। এসব কিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ার সময়ই সচেতনভাবে প্রথম এই অভাবটা বোধ করলাম যে, মুসলমানদের লেখা

বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা একেবারেই কম। অঙ্গুলিমেয়ও নয়। আমাদের ক্লাসে একটু অবস্থাপন্ন ঘরের একটা হিন্দু ছেলে ছিল। সে প্রায়ই কলকাতা থেকে বই, পত্র-পত্রিকা—এই সব আনাত। সেগুলো নিয়ে সে ক্লাসে আসত। সে যে অনেকগুলো পত্রপত্রিকা আর বইয়ের মালিক— এই রকম একটা মনোভাব দেখাত। আমি তার কাছে একবার একটা ছোটদের মাসিক পত্রিকা পড়তে চেয়েছিলাম। সে দেয়নি। উপরন্তু অপমানজনক একটা উক্তি করেছিল। বলেছিল, তোদের মুসলমানদের কী আছে! আমার এসব নিয়ে টানাটানি করিস কেন?

৩. বইয়ের প্রতি আগ্রহ

আমাদের লাইব্রেরিয়ান আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি একদিন তাঁকে গিয়ে বললাম, স্যার, আমাদের মুসলমানদের লেখা কোনো গল্প-উপন্যাসের বই কিংবা পত্রিকা কিছুই কি নেই?

জবাবে তিনি বললেন, বাবা, তোমাদের যদি কিছু থাকত, তবে আমরা জানতাম। স্কুলপাঠ্য কোনো বইয়েও মুসলমানদের লেখা আমাদের নজরে পড়ে না।

সেদিন মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। এত বড় একটা জাতি, এত বড় একটা সমাজ, তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, অথচ তাদের বাংলা কোনো পত্রপত্রিকা নেই! এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। মাথায় কেবলই ঘুরপাক খেত ব্যাপারটা। ওই বয়সেই ছবির বই কিংবা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করার স্বপ্ন দেখতাম। রাতে ঘুম হতো না।

আমাদের লাইব্রেরিতে সাধারণভাবে ইংরেজি বই, 'ঈশপের উপকথা' জাতীয় বই দেখেছি। তাতে ছবিটবি ছিল। বিলাতি বই তো! এমন সুন্দরভাবে বাঁধাই করা ছিল যে, দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। পড়ে অনেক সময় সব বুঝতাম না; কিন্তু মনোযোগ দিয়ে ছবিটবি দেখতাম। খুবই উঁচুমানের বই ছিল সব। আমি ছোটদের বই-ই বেশি পড়তাম। যেমন ডা. আবুল হোসেনের 'যমজ ভগিনী কাব্য' বলে একটা বইয়ের নাম করতে পারি। ওটা তো মাইকেলি ঢঙে ভাষায় লেখা ছিল। বইটার বাঁধাই ভালো ছিল। বেশ মোটা কলেবরের যে ছিল, আমার এখনো বেশ মনে আছে। আরম্ভটা ছিল এ-রকমের : 'কুক্ষণে রে কাপুরুষ, কৃষ্ণ দাস তুই গিয়েছিলি কলিকাতা লয়েছিলি ইংরেজদের আশ্রমে আশ্রয়।' এ রকমভাবে আরম্ভ করা হয়েছিল বইটা। সিরাজউদ্দৌলার শাসনের সময় ইংরেজের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়েই বইটা লেখা। আসলে ওই সময় অনেক বই পড়েছি কিন্তু তেমন বুঝতাম না। যেমন মাইকেলের লেখা বুঝতাম না। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' বুঝতাম না। কিন্তু না বুঝলেও যেটুকু পড়তাম, ভালো লাগত। মাইকেলের

'মেঘনাদবধ কাব্য'-র তো লাইনের পর লাইন আমার মুখস্থ। একটুখানি শোনাই :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি / বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে / অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি, / কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, / পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি / রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা / ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে— অজেয় জগতে— / ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা? / বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দগতি / আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে / ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া, / বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন) / যবে খরতর শরে, গহন কাননে, / ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা, / তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি। / কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে? / নরাধম আছিল যে নরকুলে / চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে, / মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি! / হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর / কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে, / সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে! / হায়, মা, এহেন পুণ্য আছে কি এ দাসে? / কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে / মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি / সমধিক। ঊর তবে, ঊর দয়াময়ি / বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি, / মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া। / —তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী / কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু / লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে / আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এই যে সূচনা, এটা এতটা বীরত্বব্যঞ্জক, এতটাই কাব্যমণ্ডিত যে বলে শেষ করার নয়।

আমি তখন ম্যাট্রিক পাস করিনি। ওই নজরুলের যে অবস্থা, আমারও অনেকটা তা-ই হয়েছিল। ও যেখানে গিয়ে থেমেছিল, আমিও সেখানে গিয়েই থেমেছিলাম। ম্যাট্রিক, এখনকার এসএসসি পরীক্ষা দেবার ঠিক আগেভাগে হঠাৎ করেই বাবা মারা গেলেন। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ায় তখন এমন একটা মুশকিলে পড়ে গেলাম যে, সংসার চলবে কী করে, কে চালাবে আমাদের—এই ভাবনা গভীরভাবে পেয়ে বসল। এত অল্প বয়সে একটা বিরাট দায়িত্ব কাঁধে এসে চাপল। কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না! না আমি ব্যবসা করতে পারি, না এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে! বড় ধরনের একটা চাকরি পাব, তেমন সম্ভাবনাও নেই। কোনো দিক দিয়েই কোনো রকমের সম্ভাবনা ছিল না। ফলে ভেবেচিন্তে শুরু করলাম ছোটখাটো একটা ব্যবসা। মৌসুমে কাঁচা সুপারি স্টক করে রেখে দিতাম। শুকোলে ছয় মাস পর এগুলো বিক্রি করতাম। আমি তখন চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখছি। এছাড়া তেমন কিছু করারও তো ছিল না। খাওয়া-পরা, সংসারের নিত্যদিনের খরচ—এসব কিছু কোথা থেকে কীভাবে আসবে, এই চিন্তায় পাগল হওয়ার জোগাড়। চারদিকে ছুটোছুটি করেও কোনো উপায় করতে পারছিলাম না।

আমরা ছিলাম পাঁচ ভাই-বোন। একজন মারা গিয়েছিল। আর ছিলেন মা।

ফলে খুবই কষ্টের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের ওখানে স্টিমার স্টেশন ছিল। তাতে স্টিমার এসে ভিড়ত। মূলত দুটো জাহাজ কোম্পানিরই জাহাজ এই লাইনে চলাচল করত। একটা জাহাজ কোম্পানির নাম ছিল মেসফিল কোম্পানি আর একটার নাম ছিল আরএসএল অ্যান্ড আইজিএম কোম্পানি। আমাকে একদিন স্টিমার ঘাটে হাঁটতে দেখে স্টেশনমাস্টার, হিন্দু ভদ্রলোক, বললেন, 'আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের অনুমতি পেয়েছি। ঘোরাঘুরি বন্ধ করে তুমি আমার সাথেই থাকো।'

কথাটা তিনি বললেন খুবই সহানুভূতির সঙ্গে।

বললাম, কত টাকা মাইনে হবে?

বললেন, 'কুড়ি টাকা। তাতে তোমার খাওয়া-পরা চলে যাবে।'

তখন তো ভালো চালের মণও ছিল দুই টাকা। কাজেই তখনকার দিনে কুড়ি টাকা ছিল অনেক টাকা।

স্টেশনটার নাম ছিল নরসিংহপুর। এখন আর নেই। নদী ভেঙে নিয়ে গেছে। আমার কাজ ছিল টিকিট বিক্রি করা এবং টিকিট সংগ্রহ করে সেগুলো জমা দেওয়া। সারা দিনে দুই বার স্টিমার থামত—একবার সকালে আর একবার বিকেলে। সারা দিন আর কোনো কাজ নেই। ওই দুই বেলা যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহ করতাম। তারপর সন্ধ্যায় জমা দিতাম।

কাজটা পাওয়ার পরও মনটা বেশ খারাপ হয়ে থাকত। একসময় ভাবনা এল, এটা কী রকমের চাকরি! সামান্য একটু কাজ। তারপর সারা দিন হাত গুটিয়ে বসে থাকা। একদিন একটা স্টিমার ঘাটে ভিড়ল। তার থেকে একজন যুবক নামলেন। তার নাম এম সি দত্ত, আমাদের স্কুলে আগে পড়তেন। তিনি একটা জীবন বিমা কোম্পানিতে কাজ করেন। কোম্পানির নাম 'চায়না মিউচ্যুয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি এখানে কী করো?

আমি বললাম, এই কাজ করি। সেই সঙ্গে এও বলি আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি। তিনি বললেন, দেখো আমারও তোমার মতোই এ রকম অবস্থা হয়েছিল। আমিও সংসার নিয়ে বিপদে পড়েছিলাম, অল্প বয়সে গার্জিয়ানহারা হয়ে। গার্জিয়ান মারা যাওয়ায় আমিও কষ্ট পেয়েছিলাম। তারপর আমি লাইফ ইন্স্যুরেন্সে কাজ নিই। এখন তো আমি ভালোই আছি।

আমাদের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি ছিল মাইল তিন-চারেক দূরে। তিনি আরও বললেন, তুমি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কাজ করলে কোনো পুঁজি লাগবে না। অন্য আর কিছু লাগবে না। খালি কথা বলতে পারলেই হয়। তাহলেই তুমি ভালোভাবে চলতে পারবে।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। পরে দেখা করলাম তাঁর সাথে। দেখলাম লোকটা

বেশ সচ্ছল। আমাকে কেবল খাওয়া-দাওয়াই করালেন না, বেশ হাসিখুশিতেও রাখলেন। আমাকে বললেন, তুমি বিলেতি কোম্পানির কাজ করতে পারবে না। কারণ, তাহলে আরও বেশি লেখাপড়া শেখার দরকার। তোমার জন্য ভারতীয় কোম্পানিই ভালো হবে। বাংলাদেশে কোনো মুসলমান এজেন্ট নেই। এসব কাজকে মৌলবিরা গুনাগারির কাজ বলে মনে করে থাকেন। তাই এসব জায়গায় কাউকেই লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কথা বোলো না। ব্যাংকের সাথে কোনো যোগাযোগ রেখো না।

যা-ই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই ওই কোম্পানিতে আমার চাকরি হয়ে গেল। আমাকে মিস্টার দত্ত সবকিছু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিলেন। উপদেশ দিলেন কোন কোন জায়গায় ধরবে, এত বছর বয়সের ছেলে হলে এই হবে তার প্রিমিয়াম। দশ বছর পর এই হবে তার প্রফিট। 'সুদ' বলবে না। খবরদার, সুদ বললে লোকজন মারবে। তুমি বলবে, প্রফিট। বইতেও প্রফিটই লেখা আছে। কাজেই এভাবে আরম্ভ করে দাও। আমি দেখলাম অর্থের যদি কোনো সংস্থান না থাকে, তাহলে আমি কোনো কাজই করতে পারব না। তাহলে এভাবে চললে, আমি না খেয়েই মারা যাব। সে জন্যই আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজটা আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু অবস্থাপন্ন লোক যারা, তাদের কাছে গেলেই তারা আমাকে নিন্দা করত, এ কী রকম মুসলমান! মৌলবি, পীর, মাওলানারা বলে দিয়েছেন, জীবন বিমা ও ব্যাংকের সঙ্গে কেউ কোনো ধরনের যোগাযোগ রাখবে না। এসবই গুনাগারির কাজ। তখনকার দিনে যত জমিদার-মহাজন ছিলেন, তাদের সবাই হিন্দু। মুসলমানরা তখনকার দিনে খুব গরিব ছিল। দত্ত আমাকে শিখিয়ে দিলেন সব কিছুর কায়দা-কানুন। আমি তাঁর কথামতো একজনকে বললাম, দেখেন, এটা তো সুদ না, কোম্পানি এটাকে তো প্রফিট বা লাভ বলে ঘোষণা করেছে। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, আপনার কথা শুনব, না মৌলবি-মাওলানাদের কথা শুনব? তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, এর মধ্যে কয়জনার ইন্স্যুরেন্স করেছি আমি?

আমাদের ওদিকে আসাম বেঙ্গল রেলে তখন অনেক মুসলমান কাজ করত। চাঁদপুর ছিল বড় রেলস্টেশন। সেখানে তাদের আড্ডায় আমি ঢুকলাম। আমার কথা শুনেটুনে সেখানে সবাই কিছু কিছু পলিসি গ্রহণ করল। তখনকার দিনে ম্যাজিস্ট্রেটের মাইনা ছিল ১৫০ টাকা এবং সাব-রেজিস্টাররা পেতেন মাসে ৬০ টাকা করে। আমার প্রথম মাসের বিল হয়েছিল ৩০০ টাকা, যা এখনকার ৩০ হাজার টাকার সমান। তখন আমার ফুর্তি দেখে কে! এরপর একজন তো বলেই বসলেন, এখানে একটা ছোট্ট অফিস করে বসো। চাঁদপুরে আমি যেখানে বসে কাজকর্ম করছিলাম, সেটা ছিল একজন হিন্দু ডাক্তারের ঘর। বেশ প্রশস্ত ছিল ঘরটা।

ডাক্তার সাহেব বললেন, তুমি এখানে থাকো। তাহলে আমার ঘরটার পাহারার কাজও হবে। আমি তো নামেমাত্র ডাক্তার। কাজ করি কন্ট্রাকটারির। তুমি এখানে থাকলে ভালোই হয়। ফলে সেখানেই থাকতে শুরু করলাম। আর, এদিক-ওদিক কেবলি ঘুরতে লাগলাম। আগেই বলেছি ঘরটা ছিল বেশ বড়সড়। মাসে ভাড়া ছিল ৭ টাকা। সঙ্গে রান্নাঘরও ছিল। কিছু আসবাবপত্র এনে সাইনবোর্ড লাগিয়ে সেখানেই আমার আস্তানা গেড়ে বসলাম। আর একটা কাজের লোক ছিল নাম মহব্বত আলি। বাড়ি ছিল তার নোয়াখালী। সে রান্নাবান্নার কাজটা করত। আমার অভ্যেস ছিল সাধারণত শিক্ষিত লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করা, বিকেল হলে তাদের সঙ্গে বসে চা-নাশতা করা। বিকেল বেলা যেসব উকিল-মুন্সেফ বেরুতেন, তাঁরা আমার সেই সাজানো-গোছানো ঘর দেখে সেখানে চলে আসতেন। তাঁদের আমি চা-টা খাওয়াতাম। একদিন জহুরুল কাইয়ুম চৌধুরী নামের একজন ম্যাজিস্ট্রেট, চাটগাঁর লোক, তিনি আমার সেই ঘরে এলেন। চা-টা খাবার পর বললেন, আপনার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কাজ। তা আপনি এখানে ঢুকলেন কী করে?

তাঁকে বললাম আমার এ কাজে ঢোকার ইতিহাস। বলার পর জানালাম এখানে ঢোকার পর আমার একরকম ভালোই চলে যাচ্ছে। তবে অবস্থাপন্ন মুসলমান যারা, তাঁরা আমার সঙ্গে বড় একটা ভালো ব্যবহার করছেন না। ইন্স্যুরেন্স করতে তাঁরা রাজি না। তাঁদের সাফ মতামত এটা নাকি গুনাগারির কাজ।

এ কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চটে গেলেন। বললেন, ব্যাটারা কিচ্ছু বোঝে না, মোল্লা-মৌলবিরা জ্বালিয়ে শেষ করে গেল আমাদের। সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছে।

এই ভদ্রলোক খুবই উৎসাহী ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার কাছে গিয়েছিলেন?

আমি একজন আড়তদারের নাম বললাম।

শুনে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। একজনকে বলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। বলুন যে আমি ডাকছি।

আমি সেই আড়তদারকে গিয়ে বললাম যে আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডেকেছেন।

শুনে তো তিনি অস্থির, আমি আবার কী অপরাধ করেছি যে হুজুর আমাকে তলব করেছেন। তখনকার দিনে পুলিশের কনস্টেবলকে দেখলেই লোকজন ভয় পেয়ে যেত। ভয়ে কেউ দারোগা-ম্যাজিস্ট্রেটদের ধার-কাছ দিয়েও হাঁটত না।

আমি বললাম, অপরাধ-টপরাধ কিছু না।

তাহলে আমার মতো লোককে হুজুর কেন ডাকবেন? নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে কিছু আছে!

আমি বললাম, না, ও-রকম কিছু না। তবে যখন দেখা করতে বলেছেন তখন

চলেন না গিয়ে দেখা করে আসবেন।

এ কথা বলে তাকে নিয়ে এলাম আমার সেই ডেরায় বসে থাকা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তিনি সেই আড়তদারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আসেন, আসেন, বসেন।

তবুও বসে না লোকটা। কেবল হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই অবস্থায় তিনি তাঁকে একটা ধমক দিয়ে বললেন, এ রকম হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসেন এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসতে বসতে বললেন, হুজুর, আপনি আমাকে তলব করেছেন বলে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আচ্ছা, আপনার কাছে নাসিরউদ্দীন সাহেব গিয়েছিলেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স করার জন্য?

শুনে বললেন, হ্যাঁ হুজুর, গিয়েছিলেন।

তো আপনি কী বলেছেন?

আমি বললাম, উনি বলেছেন যে মওলবি আর পীর সাহেবরা বলে দিয়েছেন, এসব গুনাগারির কাজ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন, আপনার গায়ে যে জামাটা, এটা দেশি কাপড়, না বিলেতি কাপড়?

এটা হুজুর বিলেতি কাপড়।

আচ্ছা, এই কাপড়টা এ দেশে কী করে এল, আপনি তার খবর রাখেন?

না, হুজুর। আমি দোকান থেকে কিনেছি।

তাহলে আমার কাছ থেকে শোনেন। এ কাপড়টা যখন এ দেশে আসে তার আগে এটাকে ব্যাংকে জমা দিতে হয়েছে। ব্যাংকওয়ালারা এটাকে এনসিওর করেছে। তারপর এটা বিলেত থেকে চাঁদপুরে এসেছে। তারপর আপনি কিনেছেন। কাজেই আপনি গুনাগারির কাজ অনেক করেছেন। ইন্স্যুরেন্সের টাকাও দিয়েছেন, ব্যাংকের টাকাও দিয়েছেন।

কাইয়ুম সাহেব এভাবে সেই আড়তদারকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলেপিলে আছে?

আছে স্যার।

তাদের কি লেখাপড়া শেখাচ্ছেন?

হ্যাঁ, কেউ শিখছে, কেউ আমার সঙ্গে কাজ করছে।

আচ্ছা, আপনার কারবার যদি না চলে, যদি আপনি মরে যান, তাহলে এদের কী অবস্থা হবে? এরা তো খেতে পারবে না। তার চাইতে আপনি যদি এখন ৫০০০ টাকার ইন্স্যুরেন্স করেন, আর আপনি যদি মরেও যান, তারা কিছু করে-টরে খেতে

পারবে। কাজেই এটা গুনার কাজ না। এটা ছোয়াবের কাজ।

লোকটা তখন বললেন, এটা যদি ছোয়াবের কাজ হয়, তাহলে হুজুর আমি ৫ হাজার টাকার ইন্স্যুরেন্স করব।

এভাবে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কাজ আস্তে আস্তে বেশ জমে উঠল। তখন আমি আর গরিব না, বেশ সচ্ছল অবস্থায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু এই যে আমি টাকা-পয়সা, অর্থ উপার্জন করছি, এটা আমার মনে শান্তি দিচ্ছিল না। তিন বছরের মাথাতেই আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। কেবল সাহিত্য নিয়ে ভাবনা। এসব নিয়েই আলোচনা করে সময় পার করি। এই অবস্থায় একদিন ঠিক করলাম, দেখি চেষ্টা করে আমাদের মুসলমান সমাজ থেকে একটা পত্রিকা বের করা যায় কি না? এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি একদিন সোজা কলকাতা চলে গেলাম। ১৯১৭ সালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ওই বিশাল মহানগরে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। তবে খোঁজ পেয়েছিলাম যে, মেছুয়া বাজারে আমাদের ফরিদপুরের একজন লোক আছেন। তিনি সাহিত্যচর্চা-টর্চা করে থাকেন। আমি সোজা তাঁর কাছে চলে গেলাম। তিনি সবকিছু শুনেটুনে তো মহাখুশি। এই রকম একটা কাজে কেউ এগিয়ে আসছে না বলে সমাজকে তিনি গালাগাল করতে করতে বললেন, আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমার এখানে থাকবেন, খাবেন। তাঁর নাম ছিল আমির হোসেন খান। লিখতেন-টিখতেন না। তবে পড়তেন খুব বেশি। সামাজিক কাজ-কর্মও করতেন। ব্যবসা করতেন। পারফিউমের ব্যবসা। এছাড়া চা মজুত করে তা বিক্রি করতেন। অবস্থা ভালোই ছিল। সবকিছু শুনেটুনে তিনি বললেন, আপনি চেষ্টা করে যান। এখানে আপনার থাকা-খাওয়ার জন্য কোনো খরচ লাগবে না। কিছু নাম দিয়ে বললেন, এই এই লোকের কাছে যান। অবস্থাপন্ন সবাই। তাঁর কথামতো আমি যার কাছেই যাই, তিনিই তওবা তওবা করে বলে ওঠেন, এই হিন্দুদের কাগজের মতো গল্প-উপন্যাস নিয়ে ছবিটবি দিয়ে পত্রিকা বের করবেন, এটা কেমন কথা! আপনি বরং ইসলামি কাগজ বের করেন। আমরা সাহায্য করব। এ রকম সবাই বললেন! আমি তখন চলে গেলাম আবার চাঁদপুরে। সেখানে কিছুকাল থেকে আবার কলকাতায় চলে এলাম। এবার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এলাম, যে করেই হোক কাগজ বা পত্রিকা আমাকে বের করতেই হবে। আমার সঙ্গে তখন আর একজন এসে জুটলেন। তাঁর নাম মওলানা সাহাদাত হোসেন। তিনি 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা'র প্রচারক ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কাগজ বের করবেন শুনলাম?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

খুব ভালো কাজ, তিনি বললেন। তাঁর হাতে দেখলাম *প্রবাসী*সহ আরও কিছু কাগজ। তখন *মোহাম্মদী* মাসিক ছিল না। ছিল সাপ্তাহিক। আকরম খাঁ

সাহেবের। তখন মওলানা সাহাদাত হোসেন বললেন, আমি যে প্রচারকাজ করছি, সে উপলক্ষে বহু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে এবং তাঁদের কে কোথায় আছেন, আমি সব জানি। আমি তোমাকে সেই সব জায়গায় নিয়ে যাব।

সত্যি সত্যি তিনি নিয়ে গেলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আর হাকিম মশিউর রহমানের মতো বিশিষ্ট মানুষজনের কাছে। তারপর ব্যারিস্টার আমিনুর রহমানের বাড়িতেও নিয়ে গেলেন। তাঁর চা-বাগান ছিল। খুব বিত্তশালী লোক। তিনি কাউন্সিলের মেম্বারও ছিলেন। ব্যারিস্টার সাহেব তাঁর বাড়িতে আমাদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। একেবারে সাহেবি কায়দায়। ওই পর্যন্তই। এ ধরনের কাজে সাধারণত বড়লোকদের পাওয়া যায় না। ব্যারিস্টার সাহেবও তাঁর বাইরে ছিলেন না। তখন মওলানা সাহাদাত হোসেন আমাকে বললেন, আরেকজন লোক আছেন। তিনি আপনাদের দেশি।

আমি বললাম, কে?

বললেন, ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল। খুব তেজি লোক আর এসব কাজে তিনি সব সময় এগিয়ে আসেন। সিদ্ধান্তমতো আমরা দুজন তাঁর ওখানে একদিন গেলাম।

৪. *সওগাত*-এর আরম্ভ

উনি বললেন, সাহিত্য পত্রিকা মুসলমান সমাজ থেকে আরও ৫০ বছর আগেই বের হওয়া উচিত ছিল। ব্যারিস্টার সাহেব বলে চললেন, এ সমাজে তো কিছু করার উপায় নেই। আমি একটা কাগজ বের করেছি। সাপ্তাহিক *দি মুসলমান*। মওলানা মুজীবুর রহমানকে দিয়েছি সম্পাদনার দায়িত্ব। তিনি চালান। কিন্তু শুরুটা আমিই করিয়ে দিয়েছি। ওটা প্রকাশ করার প্রাথমিক খরচাপাতিও দিয়েছি আমিই।

রসুল সাহেব আমাকে বললেন, তুমি এক কাজ করো। প্রথমে একটা পরিকল্পনা করে ফেলো। তারপর সেই পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে চলো।

আমি তাঁর পরামর্শমতো বিলেতি ম্যাগাজিন আর আমাদের *প্রবাসী*সহ আরও কিছু সাময়িকী দেখে ও পড়ে নিজে একটা পরিকল্পনাগত ছক তৈরি করে নিলাম। পত্রিকাটা হবে আধুনিক মেজাজ ও মননের। ছবি থাকবে। যাঁরা স্বাধীনভাবে লিখবেন, চিন্তা করবেন, তাঁদের লেখা ছাপা হবে। বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। এসব কিছু ঠিকঠাক করে মনে করেছিলাম, আমি তাঁর কাছে আবার যাব। হঠাৎ খবর পেলাম তিনি হার্টফেল করে মারা গেছেন। সন্তান বলতে তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল বোম্বাইয়ের কোনো এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে। পরের দিন বিয়ে। তার ঠিক আগের দিন রাতেই তিনি মারা যান। যা হোক, তিনি আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল আমার কাছে একটা বড় সম্বলস্বরূপ। সিদ্ধান্ত নিলাম, তাঁর উৎসাহে যে পরিকল্পনা করেছিলাম, সে

অনুসারেই কাগজ বের করব। কিন্তু প্রথমেই হোঁচট খেলাম উপযুক্ত লেখা পাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে। আমি চাই জ্ঞান-বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা বেশি প্রকাশ করতে। কিন্তু যার কাছেই লেখার জন্য যাই, তিনিই বলেন হযরত ওমরের জীবনী লিখে দেব। কেউ বলেন তাপসী রাবেয়ার জীবনীটা লিখে দেব। আমি বললাম, শতকরা ৫০ ভাগ বই-ই এ জাতীয় লেখায় ভরা। আমি চাই, আপনারা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের চেহারাটা কেমন হবে—তা নিয়েই লিখুন। কিন্তু সে রকম কোনো লেখা আর জোগাড় করা সম্ভব হলো না। তবু কয়েকজনের লেখা পেলাম। একটা লেখা পেলাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের। উনি একটা লেখা পাঠালেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নিয়ে। লেখাটা ভালো। কবি শাহাদাৎ হোসেন লেখা পাঠালেন। উনি সোজাসাপটা বলে দিলেন, আমি আপনার সাথে আছি।

লেখা চেয়ে সবার কাছেই চিঠি পাঠিয়েছিলাম। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাছে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছে। সবার কাছেই আলাদা আলাদাভাবে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কাউকে বাদ দিইনি। কাগজ বা পত্রিকার নাম ঠিক করতে গিয়ে আমি বেশ মুশকিলে পড়েছিলাম। মুসলমানরা তখন পত্রপত্রিকার আরবি নাম রাখত। যেমন— *আল-ইসলাম*, *মোহাম্মদী*, *নবনূর* ইত্যাদি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আমার কাগজের এমন নাম রাখব, যাতে সবাই সেটা পছন্দ করে। এই করতে গিয়ে আমি অনেক কাগজ নষ্ট করেছি। আর অভিধানের কোনো পাতা পড়ার বাকি রাখিনি। কোন নাম রাখব—এই চিন্তায় তখন বিভোর আমি। তারপর খুঁজতে খুঁজতে 'সওগাত'—এই শব্দ বা নাম আমি বাংলা অভিধানেই পেয়ে গেলাম। তাতে লেখা আছে আন্তরিকতার সাথে কিছু উপহার দেওয়াকেই 'সওগাত' বলে। উর্দুভাষী একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার পত্রিকার নাম 'সওগাত' রাখতে চাই, তখন তিনি খুবই উৎসাহিত হলেন এবং বললেন, এর চেয়ে সুন্দর ভালো নাম আর হতে পারে না। আপনি তো সাহিত্যের 'সওগাত' দিচ্ছেন, তাই না! সত্যি, এর চেয়ে ভালো নাম আর হতেই পারে না।

তারপর ঠিক করলাম, মুসলমান যেসব লেখকের লেখা পেয়েছি, সেগুলো তো আছেই। হিন্দু লেখকদের কাছ থেকেও লেখা এনে পত্রিকাটা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেই কথা সেই কাজ। গেলাম *ভারতবর্ষ*-র সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেনের কাছে। বয়স্ক মানুষ তিনি। আমার অনুরোধের মুখে তিনি বললেন, আমি তো ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখি। তা তুমি এ ধরনের মাসিক কাগজ বের করছ শুনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। মুসলমান সমাজ যত দিন শিক্ষিত না হবে, যত দিন তারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা না করবে, তত দিন বাঙালি জাতির কোনো উন্নতির

সম্ভাবনা নেই।

রায়বাহাদুর আরও বললেন, আমি পল্লির একটা ঘটনা নিয়ে গল্প লিখেছি। তোমাকে দুই-তিন দিনের মধ্যে সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সত্যিই তিনি পাঠিয়েছিলেন সেই গল্পটা।

তারপর গেলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। তিনি বললেন, আপনারা তো খুব ভালো কাজ করছেন। কিন্তু আমার চোখে অসুবিধা হয়েছে। আমার লিখতে মানা। তবে আমি 'সওগাত' নামটা খুব পছন্দ করেছি। ভালো নাম দিয়েছেন। আমি কষ্ট করে হলেও *সওগাত*-এর জন্য একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কথা রেখেছিলেন তিনি- পাঠিয়েছিলেন শাহজাদি জেবুন্নেসার একটি ফারসি কবিতার অনুবাদ। শিরোনাম ছিল 'সৌন্দর্য-সূর্যের প্রতীক'।

অনেকে তখন কবিতাটা পড়ে বলেছিলেন, এত সুন্দর ছন্দ, মনে হয়, মূল ফারসি কবিতা পড়ছি।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি খুশি হয়ে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তারপর গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে। এভাবে যদুনাথ সরকার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, আমার লেখালেখি তো মুসলমানদের ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি নিয়েই। আমার তো অন্য কোনো বিষয় নেই। আমাদের অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের পত্রপত্রিকা সেগুলোকে প্রাধান্য দিতে চায় না। কাজেই আমার খুব সুবিধা হবে, আমি একটা লেখা আপনার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখব। লিখব একজন মোগল বিদুষীকে নিয়ে। আমি লেখাটা নিয়ে তোমার ওখানে যাব।

তিনি কথা রেখেছিলেন। লেখা নিয়ে এসে খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন আমাকে।

যা-ই হোক, প্রথম সংখ্যার লেখা তো জোগাড় করলাম, জোগাড় করলাম কিছু ছবিও। কিন্তু মুশকিল হলো যেসব হাফটোন ছবি ছাপব, রঙিন ছবি ছাপব, সেসব-কিছু ছাপার জন্য মুসলমানদের তেমন কোনো প্রেস নেই। সারা কলকাতা ঘুরলাম আমি আর মওলানা সাহাদাত হোসেন। প্রেসে প্রেসে ঘোরাঘুরির এই সময়টায় একজন বললেন, কয়ড়া রোডে ইসলামিয়া আর্ট প্রেস নামে একটা প্রেস আছে। মালিকের নাম ইমদাদ আলী। সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি কম্পোজ করার কেসটেস আছে; কিন্তু মেশিন বেশি নেই। মাত্র একটা কি দুটো, তাও ভীষণ পুরোনো। মাত্র দুজন কম্পোজিটার কাজ করছেন। ম্যানেজার বসে বসে ঝিমুচ্ছেন।

আমি গিয়ে বললাম, আর্ট প্রেস নাম দিয়েছেন তো বুঝলাম। কিন্তু আমি যেভাবে কাগজ বের করব, হাফটোন ছবিটবি ছাপব, আপনারা তো তাহলে এসব কিছু ছাপাতে পারবেন না। তিনি বললেন, আমাদের এখানে বইয়ের ফর্মাটর্মা ছাপা

হলেও ছবিটবি ছাপা হয় না। তার কথা শুনে নিরাশ হয়ে গেলাম। এই সময় একজন ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি রায়বাহাদুর কালী সিংহের নাম শুনেছেন? মহাভারত ছেপেছিলেন? জমিদার, খুব বড় জমিদার ছিলেন।

আমি বলি, শুনেছি। তিনি উত্তর কলকাতার বড় জমিদার ছিলেন। কলকাতা শহরে একটা বড় প্রেস করেছিলেন। তাদের কথামতো সেখানে গেলাম। গেলাম ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার বললেন, আপনাদের কিছু আমরা ছাপতে পারব না।

কেন?

বললেন, আমরা আরবি-ফারসি টাইপ কোথায় পাব? আপনাদের কাগজের তো অর্ধেকই আরবি-ফারসি লেখা থাকে। মুসলমানদের পত্রিকা বলতে ওটাই বোঝায়। আমাদের ও ধরনের টাইপ-টুইপ নেই।

আমার হাতে তখন পত্রিকায় ছাপা-হতে-যাওয়া কপি ইত্যাদির ফাইল। বললাম, আপনি *প্রবাসী* ছাপতে পারবেন? *ভারতবর্ষ* ছাপতে পারবেন?

বললেন, হ্যাঁ, পারব।

আমি বললাম, ঠিক সেই ধরনের পত্রিকাই আমি ছাপব।

এ কথা শুনে ম্যানেজার খুশি হলেন। নানা হাঙ্গামার পর পত্রিকা তো বের করলাম। কভার-টভার দিয়ে খুব ভালোভাবেই বের করলাম। পাঠকমহলে একটা ভালো প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল।

এসবই সেই ১৯১৮ সালের ঘটনা। *সওগাত* বাংলা ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে বেরিয়েছিল। প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার পর সাহিত্যিক-কবিরা দেখলেন, বড় বড় কবি-লেখক তাতে লিখেছেন, ছাপানোও হয়েছে সুন্দরভাবে। ফলে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। মুসলমানদের মধ্য থেকে এ রকম একটা পত্রিকা কেমন করে বেরুতে পারে, অনেকেই যেমন অবাক হলেন, তেমনি খুব প্রশংসাও করলেন। আর মোল্লা-মৌলবিরা ক্ষিপ্ত হলেন তাদের কোনো কথা আমার পত্রিকায় ছিল না বলে। তাঁদের হাদিসের কথা, বাহাসের কথা, যেগুলো নিয়ে তারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ করতেন, তার কোনো কিছুই এতে নেই। আর ছবি আছে। ছবি দেখে তাঁরা আমার বিরুদ্ধে ভয়ানক খেপে গেলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, যে লোক ছবি ছাপছে, সে কী রকম মুসলমান? এসব নিয়ে তো তাঁদের মধ্যে একটা হইচই পড়ে গেল। তবে এসব ব্যাপার নিয়ে আমি মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। কথাও বলিনি। আমার পত্রিকা বের করার ব্যাপার নিয়ে কখনো তাঁর কাছে যাইনি। আমি তো তাঁদের কাগজ দেখেছি। *মোহাম্মদী* সাহিত্য পত্রিকা নয়। তার কাজ কেবল অনেকটা ধর্মীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়া। কোনটা ছহি, কোনটা নকল, কোনটা কী—এসব নিয়ে তাঁরা ঝগড়া করেন। আমাদের কাগজ অর্থাৎ *সওগাত* ছিল

একটা মৌলিক চিন্তার ধারক। লেখকেরা এখানে তাঁদের স্বাধীন মত নিয়ে লেখালেখি করবেন স্বাধীনভাবে।

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন নিরপেক্ষ লোক। তিনি নিজে যা পড়াশোনা বা পর্যবেক্ষণ করতেন, তা-ই লিখতেন তাঁর প্রবন্ধে। তিনি '*আল-এসলাম*'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি যা জানতেন, সেটা জানতেন ভালোভাবে। তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না, সরলভাবে তাঁর মত প্রকাশ করতেন। ব্যবসায়িক ঘোর-প্যাঁচ ছিল না তাঁর মধ্যে। আমি মোল্লা, মওলানা ও পীর—এই জাতীয় কোনো লোকের কাছে যাইনি ইচ্ছে করেই। কারণ, তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা-বোঝার পর, অনেক আগেই আমার মন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন স্কুলে পড়তাম সেই সময়ই আমার মনের এই দশা হয়েছিল। সে সব কথা বলে আর লাভ কী! আমাদের সমাজ যেসব কাজ করে, সেই তুলনায় একই সময়ে আমাদের প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের লোকজন আরও কত ভালো কাজ করে! তারা সাহিত্য করে, সংস্কৃতি করে—সবদিক দিয়ে তারা অগ্রগামী। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু করে আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে।

বস্তুত কিশোরকাল থেকেই মোল্লাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো ধারণা ছিল না। কাজেই আমার লেখক নির্বাচনের ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন ধরনের। যেমন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সাহেবের কথাই ধরুন। দার্শনিক গোছের মানুষ। আমাকে তিনি বলেছিলেন, আমার অনেক লেখা আছে মুসলমানদের ইতিহাস এবং তাদের দার্শনিক সাধনা বিষয়ে। কিন্তু আমার লেখা কেউ ছাপে না। কারণ, আমার লেখায় অনেক জিজ্ঞাসা থাকে। জিজ্ঞাসা থাকে সৃষ্টির বিষয়ে, সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে।

আমি তাঁকে বললাম, আপনি লেখা দেন, আমি ছাপব। সে দায়িত্ব আমার। তারপর উনি লেখা দিলেন। দিলেন তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলো। তাঁর পারস্য *প্রতিভার* সব কটা প্রবন্ধই আমার *সওগাত*-এ ছাপা হয়। কিন্তু প্রশ্ন করাটাই বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল সেকালে। বরকতুল্লাহ সাহেবের প্রত্যেকটা দার্শনিক প্রবন্ধেই জিজ্ঞাসা আছে, প্রশ্ন আছে এবং তার জবাবও আছে। যা-ই হোক, এভাবে আমি কয়েকজনকে নিয়ে তিন বছর কাগজ চালালাম। চালিয়ে দেখি যে, আমি যা চিন্তা করেছিলাম, যেভাবে কাগজ চালাব ভেবেছিলাম, সে রকমভাবে লেখক সংগ্রহ করতে পারিনি, পারিনি উপকরণ সংগ্রহ করতেও। এদিকে আমার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। লোকসানের পরিমাণ অনেক বেশি। তখন আমি চিন্তা করলাম যে সাময়িক কিছুকাল *সওগাত* বন্ধ রাখা যাক। ইচ্ছার রাশ কিছুটা টেনে ধরি। তা-ই করলাম। তারপর আমি আবার আমার সেই ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে ফিরে গেলাম। তাদের ক্লাইভ রোডের বিশাল অফিসে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি কয়েক বছর আগে আপনাদের এজেন্ট ছিলাম।

তখনো তারা মুসলমান এজেন্ট পাননি। আমি বললাম, আমি কাজ করব। সেখানে আমার কাজ হয়ে গেল। তখন মুসলমানরা কিছু কিছু চাকরি পাচ্ছে। আমি বেশ কিছু লাইফ পলিসি করিয়ে দিলাম। এভাবে কিছু কাজ করে অর্থ উপার্জন করে *সওগাত*-এর সব দেনাটেনা শোধ করলাম। তার পরও আমার হাতে কিছু পয়সা থেকে গেল। তখন আবার *সওগাত* বের করার চিন্তা পেয়ে বসল আমাকে। ভাবলাম, এমন লেখকদের আমার সাথে নেব, যাঁরা সমমনা। আমার এই চিন্তার ভালো ফল পেলাম আমি।

এই সময় আমার সঙ্গে আমি পেয়েছিলাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে। তিনি তখন *মোহাম্মদী* অফিস থেকে বিতাড়িত। তাঁর অবস্থাও খুবই খারাপ ছিল। আর পেলাম আবুল মনসুর আহমদ ও কবি শাহাদাৎ হোসেনকে। এ রকমভাবে চার-পাঁচজনকে পেলাম। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই কাগজে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে। আবুল মনসুর সাহেব বললেন, আমি যা লিখব সেটা তো মুসলমান সমাজের এসব ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। আমার যা চিন্তা, মুসলমান সমাজ তা হজম করতে পারবে না।

ওয়াজেদ আলী সাহেবও বললেন, আমি নিয়মিত কাজ করব *সওগাত*-এ। আবুল মনসুর বললেন, আমি পার্টটাইম কাজ করব বিকেলে। বললাম যে, এক কাজ করি, বিকেলের দিকে ওখানে একটা সাহিত্যের বৈঠক বসানোর ব্যবস্থা করা যাক।

এসবই বাংলা ১৩৩৩ এবং ইংরেজি ১৯২৬ সালের কথা। *সওগাত*-এর নব পর্যায়ের কথা। পত্রিকাটি তখন নতুন করে বার করছি।

৫. *সওগাত*-এর অফিস

সওগাত-এর অফিস ছিল প্রথমে কলুটোলায়। তারপর ওয়েলেসলি স্ট্রিটে। ওখানেই *সওগাত*-এর লেখকদের আড্ডা বসত। তাঁরা স্বাধীনভাবে আধুনিক ধরনের লেখা লিখতেন। আর তাই নিয়ে মওলানা সাহেবের সঙ্গে লেগে গেল। মওলানা সাহেব মানে মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব। তাঁরা বললেন, এরা তো ইসলামের বিরোধিতা করছে। অথচ প্রত্যেকটা লেখাই মুসলমানদের সমর্থনে। তবে তাঁদের চিন্তাধারা ছিল স্বাধীন এবং যুক্তিবহ। এভাবে চলতে আরম্ভ করল।

তাঁরা যখন আমাদের আক্রমণ করতেন, তখন লিখিতভাবেই সেটা করতেন। *হানাফী* ও *মোহাম্মদী* ছাড়া তখন কাগজ তো বেশি ছিল না। এই দুটো কাগজের একটাতেও কবিতা, গল্প, উপন্যাস—এসব কিছু ছাপা হতো না। যা ছাপা হতো, তার বেশির ভাগই ছক-বাঁধা গোছের লেখা। নিয়মের ভেতরে তাঁরা থাকতেন।

মওলানা-মৌলবিরা সব সময় আমাদের গালিগালাজ করেছেন। কিন্তু আমরা তা ভ্রুক্ষেপ করিনি। এসব সত্ত্বেও আমাদের দল ক্রমেই বেশ ভারী হয়ে উঠছিল। *সওগাত*-এর লেখকদের দল মানেই যাঁরা বয়সে তরুণ, তাঁরা। যাঁরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন বা যাঁরা আধুনিক চিন্তার সাথে যুক্ত আছেন, এমন তরুণ-যুবারাই যোগ দিয়েছেন *সওগাত*-এর দলে। এই দুটো দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে গেল সেই সময়। নজরুল ইসলামের জীবনের প্রথম লেখা আমিই ছেপেছি *সওগাত*-এ। নজরুল মাঝখানে চলে গিয়েছিলেন কংগ্রেসে। তিনি বাস্তবিকই কোনো দলের লোক ছিলেন না। কমিউনিস্ট দলের লোক এবং কংগ্রেসের বিপ্লবী একটা শাখার লোকজনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। নজরুল যা লিখেছেন তার অল্প কিছু ছাড়া বেশির ভাগই আমাদের কাগজে ছাপতে পারিনি। যেমন তিনি লিখেছিলেন দুর্গা পূজার সময় 'রক্তাম্বরধারিণী মা'। স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন লেখা আমি পছন্দ করি। তা সত্ত্বেও ওই ধরনের লেখা আমি ছাপিনি। কারণ, তাতে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সময় ছিল না। ওই সময়টায় নজরুল কমিউনিস্টদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা তাদের সমর্থন করতাম না। কাজেই নজরুলকে তখন কোনো লেখা দেওয়ার জন্য বিরক্ত করিনি। আমাদের কাগজ চলছে। ইতিমধ্যে আমরা 'সওগাত সাহিত্য মজলিশ' গঠন করেছি। নিয়ম করা হয় যে যেখানেই চাকরি করুক, বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় ওই মজলিশে এসে তাকে যোগ দিতে হবে। এর মধ্যে একদিন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন হঠাৎ করে এসে খবর দিলেন যে, নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে জ্বরে শয্যাগত। তাঁর আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, রোজ বাজার করতে পারেন না।

আমি বলি, কেন?

মঈনুদ্দীন বললেন, কংগ্রেসের লোকেরা তাকে কৃষ্ণনগর নিয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে তাঁকে দিয়ে উদ্বোধনী সংগীত লিখিয়ে নিয়েছিল তারা। অনেক গানও গাইয়েছিল তারা তাঁকে দিয়ে। আর বলেছিল, কৃষ্ণনগরে তোমাকে বাড়ি দেব, বাড়িভাড়া আমরা দেব, তোমার সমস্ত ব্যয় আমরা বহন করব—এই বলে নিয়ে গিয়েছিল।

হেমন্তকুমার সরকার তখন কংগ্রেসের ওই কৃষক পার্টি শাখার সভাপতি। তিনিই নজরুলকে সেখানে নিয়ে যান এবং দুই কি এক মাস কিছু খরচ-টরচ দিয়েছিলেন। এখন বাড়িভাড়াও দেন না। আহারবিহারের প্রতিশ্রুত খরচাপাতিও দেন না। এক মাস কিছু খরচ দিয়েছিলেন। নজরুলের কাগজ *লাঙ্গল* তখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আছেন তিনি চরম অসহায় অবস্থায়।

মইনুউদ্দীনকে আমি বললাম, তুমি এক কাজ করো, নজরুলকে নিয়ে আসো এখানে। গাড়ি ভাড়ার টাকা নিয়ে যাও।

৬. *সওগাত*-এ নজরুলের অন্তর্ভুক্তি

মঈনুদ্দীন নজরুলের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি চলে গেলেন কৃষ্ণনগরে। তারপর একদিন নজরুল এলেন। দেখলাম একটু শুকিয়ে গেছেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম, মানুষটা শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ঘরে বসেই হইচই করতে আরম্ভ করলেন। জোরে কথা বলতে লাগলেন এই বলে, আরে খুব ভালো অফিস করেছেন, বেশ করেছেন। কাগজ তো বেশ ভালোই চলছে। আমি তাকে বললাম, আপনি এক কাজ করুন, কৃষ্ণনগর থেকে এখানে চলে আসুন।

নজরুল বললেন, আমি এখানকার বাড়িভাড়া চালাব কী করে?

আমি বললাম, সেটা দেখা যাবে। আপনি তো কিছুদিন *নওরোজ*-এ কাজ করেছেন। কত টাকা পেতেন?

তিনি বললেন, এক শ টাকা।

আমি বললাম, এক শ টাকায় আপনার চলত?

বললেন, এক শ টাকায় চলে যেত।

আমি বললাম, তাহলে আপনাকে আমি এক শ নয়, দেড় শ টাকা দেব। *নওরোজ*-এর মতো একই শর্ত—আপনি এখানে কাজ করবেন, থাকবেন। সাহিত্যিকদের সাথে আড্ডা দেবেন। আর উপন্যাস, গল্প, গজল—এসব লিখবেন। আর এই যে, হলঘরটা আছে, এখানে বসে যখন খুশি গান গাইবেন।

আমার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন তিনি। বললেন, তাহলে খুবই ভালো হয়।

সপরিবারে এরপর নজরুল কলকাতায় চলে এলেন। এসে উঠলেন হাসির গানের লেখক নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে। নলিনীকান্ত নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু নজরুলের পক্ষে সেখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। নলিনীকান্তের স্ত্রীর হিন্দুয়ানি গোঁড়ামি ছিল। পরে নজরুল চলে আসেন আমার এখানে। এখানকার বাড়িটার ওপরের তলায় ছিল *সওগাত*-এর অফিস আর নিচতলায় ছিল প্রেস। তার পাশেই ছিল দুই কামরার একটা ফ্ল্যাট। এটা ১৯২৬ সালের ঘটনা। কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা দেখা দিল। নজরুল ছিলেন খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। হই-হুল্লোড় পছন্দ করতেন। সব সময় তিনি এখানে বসে গানটান করতেন। একদিন দেখি পাশের মসজিদের শ্মশ্রুমণ্ডিত বিহারি ইমাম সাহেব ধেয়ে আসছেন। এসেই বললেন, এখানে গানবাজনা হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে। নামাজ পড়তে পারি না। আপনারা এসব কী আরম্ভ করলেন?

আমি তখন ইমাম সাহেবকে লক্ষ করে বললাম, এখান দিয়ে যে ট্রাম যায়, ট্রামের আওয়াজে কান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এটা কি বন্ধ করতে পারেন না? নামাজ পড়েন কী করে? গান তো ভালো, সুরে হয়। ওই রকম শব্দ হয় না। আপনি এটা কেন বন্ধ করেন না? ট্রাম-গাড়ির শব্দ যদি বন্ধ করতে পারেন, তাহলে আমিও

এই গানবাজনা বন্ধ করে দেব।

ইমাম সাহেব তখন একটু নরম হলেন। তারপর আর কোনো উৎপাত করেননি। সেই থেকে নজরুল ওখানে বসে গানটান করতেন। আসর বসিয়ে এমনভাবে গল্পসল্প করতেন যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত। আমি তো ওখানে তেমন একটা বসতাম না। আমার তখন কেবল একটাই চিন্তা কোথায় প্রেস, কোথায় কাগজ, কোথায় ব্লক, কোথায় ছবি, কোথায় লেখা—এই ধান্দা নিয়ে কেবলি দৌড়ে বেড়াতাম। কিন্তু নজরুল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা হই-হল্লা করত, বলতে গেলে, প্রায় সর্বক্ষণই। আর গাইত হাসির গান।

নজরুলের এই আড্ডায় জুটেছিলেন আরেকজন হাস্য-রসিক। নাম ঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি যখনই হাসির যে কথা বলতেন, তাতেই লোকজন হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যেত। আর নলিনীকান্ত সরকারের কথা বলেছি, তিনিও ছিলেন হাসির গানের ওস্তাদ। তাদের গাওয়া একটা হাসির গান ছিল এই রকমের :

'মরি হায় কলিকাতা কেবল ভুলে ভরা।
উল্টা ডিঙ্গির খালে গিয়া দেখি সোম ডিঙ্গি-ভরা,
শ্যামবাজারে গিয়া দেখি শ্যাম গেছেন
অনেক দূরে...।'

ওই রকম অবস্থায় আমি যেই ঘরে ঢুকতাম, অমনি আমাকে লক্ষ করেই গেয়ে উঠতেন তারা, মরি হায় কলিকাতা কেবল ভুলে ভরা,/ঘাড়ের উপর এতবড় শির,/নাম রেখেছে তার নাসির।/মরি হায় কলিকাতা কেবল ভুলে ভরা।'

আবার এই যে হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক আর বিদ্রূপ, তার পাশাপাশি সেই একই মজলিশে বসে তাঁরা রচনা করছেন সিরিয়াস সব লেখা। এভাবে আমাদের সেই সময়কার দিনগুলো সেখানে ভালোই কেটেছে। আমাদের সেই আসরে কত নতুন নতুন লেখক আসতেন, তার বিবরণ তুলে ধরা সত্যিই কঠিন। তাদের আমি লিখতে বলেছি। উৎসাহ দিয়েছি, তাদের ছবি ছেপেছি, মাঝেমধ্যে তাদের ছবি দিয়েও সংখ্যা বের করেছি। আর একটা কথা না বললেই নয়, মেয়েদের লেখা পেতে তখন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল।

৭. সুফিয়া কামাল

একদিন সুফিয়া কামালের একটা লেখা তাঁর এক আত্মীয় (তখন তিনি সুফিয়া এন. হোসেন ছিলেন) আমার কাছে নিয়ে এলেন। বললেন, উনি (খালাম্মা) এটা লিখেছেন। তাঁর আরও লেখা আছে; কিন্তু তিনি লেখা বাইরের কাগজে দেন না।

বললাম, কেন?

ছেলেটি বলল, কারণ পরিবারের লোকজন এটা পছন্দ করেন না বেপর্দার কাজ

হয়ে যায় বলে। হাতের লেখা বাইরে গেলে নাকি মুসলমানি নিয়ম মতে বেপর্দার কাজ হয়ে যায়।

আমি তো শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। বলে কী? সে কবিতা লিখবে, আর সেই কবিতা কাগজে ছাপলে বেপর্দার কাজ হয়ে যাবে—এটা কোন্ ধর্ম? এটা তো বুঝতে পারলাম না। লেখাটা রাখলাম। তবে সুফিয়া কামালের হাতের লেখা পড়া যায় না। হাতের লেখাটা খুবই খারাপ। আঁকাবাঁকা, কমা নেই, দাঁড়ি নেই, কবিতার নামও নেই। কী আর করা, এসব ঠিকঠাক করে কবিতার নাম দিলাম 'আমার এ বনের পথে ভুলে করত না কেউ আসা যাওয়া'। সংশোধন ইত্যাদি করার পর নজরুলকে দেখালাম। বেশির ভাগ সংশোধন নজরুলই করেছে। আমি শুধু দাঁড়ি-কমাগুলো ঠিক করেছিলাম। করার পর নজরুলকে দিয়েছিলাম চূড়ান্ত সংশোধনের কাজ করার জন্য। পড়ে নজরুলও লাফিয়ে উঠল। বলল, আমি আগেই ওর নাম শুনেছি। বলে দিচ্ছি ও মস্তবড় কবি হবে, বাংলাদেশের মস্তবড় একজন মহিলা কবি হবে সে। আপনি ওর লেখা আনেন।

সুফিয়া কামালের লেখাটা ছাপা হয়ে গেল। ছাপা হয়ে যাবার পর সবাই প্রশংসা করল। প্রথম লেখা ছাপাবার পর সুফিয়া কামালের কবিতার পুরো খাতাটাই আনানো হলো। নজরুল কিছুটা সংশোধন করে দিলেন। তারপর আমি *সওগাত*-এ ছাপতে শুরু করলাম। এই হলো সুফিয়া কামালের কবিতা ছাপানোর কাহিনি।

প্রথমে বরিশালের কোনো একটা কাগজে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আমরা তা জানতাম না। কাজেই *সওগাত*-এ তাঁর কবিতা বেরিয়ে যাওয়ার পর চারদিক থেকে সবাই জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, কে এই সুফিয়া? কে এই সুফিয়া এন. হোসেন?

আমি বললাম, সে শায়েস্তাবাদের নওয়াব বাড়ির মেয়ে। পর্দার অন্তরালে থাকে। সেই অবস্থাতেই সে লেখালেখি করে। একদিন দেখি কি সুফিয়া নিজেই এসে হাজির। ভেলভেট কাপড়ের খুব দামি বোরকা পরে। তাঁর সঙ্গে একটা ছেলে। ওদেরই আত্মীয়স্থানীয় কেউ। নাম তার লালা। তাকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এসে বলল, আদাব, আদাব।

খুব তাড়াতাড়ি কথা বলত।

আমি বললাম, আরে সুফিয়া, বসো বসো। তুমি তো কবি হয়ে গেছ। সবাই তোমার কবিতার প্রশংসা করছে। আরে কবি মানুষ যদি বোরকা পরে, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় বলো তো? জিনিসটা তো বেমানান।

সুফিয়া লালাকে বললেন, লালা, বোরকা খুললাম। তুই এটা রেখে দে। সম্পাদক সাহেব বোরকার ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না। আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম তাঁর লেখা পেয়ে। তার পর থেকে প্রায়ই আসত। কিন্তু তার কথা ছিল

যখন ঘর থেকে বের হব, তখন বোরকা পরেই বের হব। কারণ, পারিবারিক বাধাবিঘ্ন ছিল অনেক। না হলে গোলমাল লেগে যাবে। আমি বললাম, আচ্ছা তাই-ই করো। এই করতে করতেই ওর লেখা ছেপে চলেছি আমি। আরও দুই-একজন লেখিকা, যেমন—নুরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী (ড. আহম্মদের সহধর্মিণী) ও আয়শা আহম্মদ—এই রকম সাত-আটজন লেখিকা *সওগাত*-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

আরও পরের দিকে অর্থাৎ *সওগাত*-এর গোড়ার দিককার যাঁরা, তাঁদের লেখাটেখা জোগাড় করে তাঁদের ছবিসহ ছাপালাম। 'মহিলা জগৎ' আলাদা করে দিলাম। তাতে করে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন মোল্লা-মৌলবিরা।

তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, কত সাহস—মহিলা বিভাগ করে আবার মেয়েদের ছবিও ছাপছে! এদের আস্পর্ধা বড্ড বেশি! সাংঘাতিক অন্যায় কাজ করছে। এই ধরনের খবর পেতাম। কবি শাহাদাৎ হোসেন, তার পাশাপাশি মইনুদ্দীন হোসেন (নূর লাইব্রেরির মালিক) আমাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা খবর আনতেন, মওলানা এই বলছেন, ওটা বলছেন, এটা করছেন, ওটা করছেন। আপনার বিরুদ্ধে খুব ষড়যন্ত্র চলছে। আপনি মেয়েদের ছবি ছাপছেন, তাদের লেখা ছাপছেন, আপনি তো খুব বিপদে পড়বেন। মওলানারা বলাবলি করছেন, *সওগাত*-এ আপনি যেসব লেখা আর ছবি ছাপছেন, তাতে করে আমাদের ইসলাম থাকবে না, ইসলাম নষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি।

৮. মহিলা সওগাত

এই অবস্থার মুখে আমি ঠিক করলাম মোল্লা-মৌলবিদের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে আমি পিছিয়ে যেতে পারি না। আমি এমন একটা কাজ করব, যা হিন্দুরাও করেনি কোনো দিন। কেবল মহিলাদের ছবি আর লেখা দিয়ে 'মহিলা সওগাত' বের করব। দেখি তারা কী বলে, কী করে! কারণ, আমি কিছু কিছু পড়েছি, আগেকার দিনে এমন সব মুসলিম মহিলা ছিলেন, যাঁরা রাজত্ব করেছেন, কেউ কবিতা লিখেছেন, কেউ রণক্ষেত্রে সশরীরে হাজির হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যুদ্ধও করেছেন, কেউ কেউ দরবারও পরিচালনা করেছেন—এসব কিছু আমার জানা ছিল। কাজেই আমার মোটেও সাহসের অভাব ছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের আস্তানা বা ঘাঁটিতেই আমাকে আঘাত হানতে হবে। 'মহিলা সওগাত' বের করব—দেখি তারা কী করে? কিন্তু কাজটা করতে গেলে তো মহিলাদের লেখা আর তাদের ছবির দরকার। তখনকার দিনে ছবি জোগাড় করা ছিল খুবই মুশকিলের ব্যাপার। একজন এসে বললেন, ব্যাটা তো বড় বদমাশ, পরের বউয়ের ছবি ছাপায়। নিজের বউয়ের ছবি ছাপিয়ে দেখুক না দেখা যাবে কত বড় তার বুকের পাটা! তখন আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম ফটো তুলতে। ওরও

ছবি ছাপলাম। তারপর মহিলা সংখ্যা বের হলো। কিন্তু বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটল, সেটা নিয়ে আমার এখনো মনে হাসির উদ্রেক হয়। মহিলা সংখ্যা যেদিন বের হয়, সেদিন *সওগাত* অফিসে সবচেয়ে বেশি ভিড় করেছিলেন মোল্লারাই। তাদের প্রত্যেকের মাথায় সাদা টুপি। এই রকম একটা অদ্ভুত জিনিস মুসলমান সমাজে বেরিয়েছে—মেয়েদের ছবি ছাপা হয়েছে, আর আমরা দেখব না! একদিকে ধর্মের কথা বলে, আর অন্যদিকে মেয়েদের ছবি না দেখলে তাদের চলবে না।

আসলে মুসলমান মেয়েদের ছবি তো কেউ এর আগে দেখেনি। সেকালে কোনো দিনই দেখেনি। আমাকে মনসুর সাহেব লিখেছিলেন, মুসলমানদের কোনো কাগজের অফিসে হকারদের এ রকম ঠেলাঠেলি এর আগে আর কখনো দেখিনি। আমি দোতলা থেকে দেখতাম আর হাসতাম। এ কী কাণ্ড, এরা যে ধর্মের কথা বলে সেটা তাহলে ধর্মের কথা নয়, এরা তাহলে ওটা নিয়ে ব্যবসা করে! আমার সাহস আরও বেড়ে গেল। তারপর প্রায়ই ওই 'মহিলা সওগাত' বের করতাম ছবি-টবি দিয়ে একইভাবে। ওটা ছাড়াও *সওগাত*-এ নিয়মিত 'মহিলা জগৎ বিভাগ' নামের একটা বিভাগ থাকত। তাতে দেশ-বিদেশের, তুরস্কের, পারস্যের ও মিসরের মেয়েদের নানা তৎপরতার খবর ও ছবি থাকত। ছবি বিদেশ থেকে নানাভাবে জোগাড় করে আনতাম। আমি লিখতাম এই ছোটখাটো নানা বিষয় নিয়ে। তবে সম্পাদকীয় আর অন্যদের লেখা ইত্যাদি আমাকেই দেখে দিতে হতো। অর্থাৎ সম্পাদনার প্রাথমিক কাজটা আমি নিজেই করতাম। বাদবাকিটা ছেড়ে দিতাম আমার যাঁরা সহযোগী, তাঁদের ওপর। লেখার বিষয়টা দেখে দিতাম, আর মোটামুটি ভাষাটা দেখতাম।

আমার সঙ্গে তখন অনেকেই ছিলেন। সহকারী সম্পাদক হিসাবে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন—এই তিনজনই ছিলেন প্রধান। আর হবীবউল্লাহ বাহার, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনসহ এই রকম আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা উৎসাহী লোক, তাঁরা সাহিত্যে উৎসাহী। এ ছাড়া তাঁরা *সওগাত*-এর জন্য লেখাটেখা জোগাড় করে দিতেন। সে সময় এ রকম আরও অনেকে ছিলেন। সিরিয়াস ধরনের বেশির ভাগ লেখাই নির্বাচন ও সম্পাদনা করতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম আহম্মদ। আর সমালোচনা করার দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়েছিলাম আবুল মনসুর আহমদ ও শামসুদ্দীনের ওপর। *সওগাত* যখন প্রথম বেরিয়েছে, তখনই তিনি কায়কোবাদের *মহাশ্মশান*-এর একটা সমালোচনা করেছিলেন। তখন তিনি ধরতে গেলে ছাত্র। এই ছাত্র অবস্থায় সমালোচনাটা করে পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে। আস্তে আস্তে অনেকে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। তাঁদের সবাই যে প্রত্যক্ষভাবে আমার সঙ্গে কাজ করতেন, তা

নয়, তবে *সওগাত*-এ এসে আসর জমাতেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে একটা উৎসাহের সৃষ্টি করতে হবে—আমাদের সকলের মধ্যেই এই রকমের একটা আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা প্রবলভাবে কাজ করত।

যা-ই হোক, নজরুল ইসলাম যখন *সওগাত* অফিসে এসে যোগ দিলেন, তখন আমাদের যারা তরুণ সাহিত্যিক, যারা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, তাঁদের সবাই এসে *সওগাত* অফিসে ভিড় জমালেন। নজরুলের সাথে দলবদ্ধ হয়ে কবিতা, গান ইত্যাদি লিখতে আরম্ভ করলেন। আর নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই দলের নেতা। মুসলমানদের মধ্যে যাতে সাহিত্যের প্রচার বেশি হয়, তাদের মধ্যে যাতে জাগরণ আসে, তরুণ-যুবকেরা যাতে সক্রিয় হয়, এ ব্যাপারে তাদের সব রকমভাবে উৎসাহ দেওয়াটাই সে সময় নজরুলের প্রধান কাজ ছিল। তবে এটা কোনোমতেই সাম্প্রদায়িক কোনো প্রয়াস ছিল না। হয়তো কেউ একে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করতে পারেন; কিন্তু আসলে কাজটা ছিল একটা অনুন্নত জাতি, যাদের কোনো সাহিত্য নেই, যাদের মধ্যে অন্য কিছুই নেই, তাদের জাগিয়ে তোলা, সত্যিকার অর্থেই একটা মহৎ কাজ ছিল। কোনোভাবেই সেটা সাম্প্রদায়িক কাজ ছিল না। তিনি যে কাজটা করেছেন, সেটা আমাদের সমাজের জন্য একটা বড় ধরনের কাজ ছিল। তিনি এসেই আমাদের যুবক-তরুণ সম্প্রদায়কে জাগানোর জন্য নানা ধরনের চেষ্টা করেছেন। তিনি 'রণ-সঙ্গীত' রচনা করেছেন। যেমন—'চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' জাতীয় গান। তরুণদের লক্ষ করে এ রকমের আরও অনেক কবিতা তিনি লিখেছেন। সেগুলো তিনি আবার *সওগাত* সাহিত্য মজলিশে সবার সামনে আবৃত্তিও করতেন। কোনো কোনোটায় সুরারোপ করে গাইতেনও। তাতে করে একটা দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন তিনি তরুণদের লক্ষ করে 'অগ্র-পথিক' কবিতাটা লিখেছিলেন। সেটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আর আমাদের তরুণ সাহিত্যিকরা সেটা পড়ে অপরিসীম উৎসাহিত হয়েছিলেন। ওই কবিতার একটা জায়গায়, আমার মনে আছে, তিনি তরুণদের লক্ষ করে বলেছিলেন :

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি হীরকের খনি করি খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল!
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল,
জোর কদম চল্ রে চল্ ॥

এ ধরনের লেখা তিনি অনেক লিখেছেন, বিশেষত তাঁর যে গজল গান, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে এ দেশের সবাই তা উপভোগ

করেছেন। এ ছাড়া তাঁর খুব সাধারণ কথার একটি গান আছে, যার প্রথম চরণটা এ রকমের :

'কে বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।'...

ওই গানটা কেবল আমাদের মতো লোকজনই নয়, গ্রামের ছেলেবুড়ো, অর্থাৎ চাষাভুষোরাও তখনকার দিনে যেখানে-সেখানে যখন-তখন গাইতেন। তাদের প্রাণের গান হয়ে উঠেছিল ওটা। নজরুলের অনেক গান আমার এখনো মনে পড়ে। ওই যে একটা গান আছে না :

এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী
আনলে বল কে,
টলমল জলমোতির মালা
দুলিছে হিয়ার ফলকে।

এসব গানের লাইন এখনো মাঝেমাঝেই আমার মনে পড়ে এবং নিজেই মনে মনে আউড়াই। ভীষণ আনন্দ লাগে। এসব গানের সুর, কথা ও গানের ভঙ্গি আমাকে এখনো ভীষণ আনন্দ দেয়। নজরুল সম্পর্কে বলতে গেলে টানা দুদিন ধরে বললেও আমার কথার শেষ হবে না।

আসলে আমি নজরুলকে যেভাবে দেখেছি, তিনি যেভাবে আমাদের সঙ্গে মিশেছেন এবং *সওগাত* পত্রিকায় তাঁর কাজ করার ফিরিস্তি বা বিবরণ অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে আমার যা জানা, সে সম্পর্কে অনেক কিছু আমার *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* বইয়ের 'সওগাত ও নজরুল ইসলাম' শিরোনামযুক্ত একটা বিশেষ অধ্যায়ে আমি লিখেছি। একে ঠিক নজরুলের জীবনী বলা যাবে না। কারণ, যাঁরা নজরুলের জীবনী লিখেছেন, তাঁরা সেটাকে ইতিহাসের মতো করেই লিখেছেন। যা জানেন না তাও তাঁরা গুছিয়ে লিখেছেন। অনেকে শোনা কথা লিখেছেন। অনেকে আবার অন্যের বই পড়েটড়ে নজরুলের জীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু আমি যা লিখেছি, লিখেছি তাঁর সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্কসূত্রের ভিত্তিতে।

৯. প্রসঙ্গ নজরুল

আমি যেভাবে নজরুলকে জানতে পেরেছি, আর যে ঘনিষ্ঠতা তাঁর সঙ্গে আমার ছিল, কীভাবে তার সূচনা হলো, কীভাবে এত বছর একসঙ্গে কাটল, কখন তিনি কোন কাজটা কীভাবে করেছেন, নিজের লেখাটা কীভাবে লিখেছেন, তারই বিবরণ আমি আমার ওই লেখাতে তুলে ধরেছি। এবং তিনি যেকোনো সময় সভা-সমিতিতে যেতে পছন্দ করতেন না, সে কথাও আমি লিখেছি। সভা-সমিতিতে যাওয়ার ব্যাপারে ওপরে ওপরে প্রতিশ্রুতি দিলেও সেখানে যাবার সময় হওয়ার আগেই তিনি পালিয়ে যেতেন। কোথায় পালাতেন? হয় ফুটবল খেলার মাঠে, নয়

দাবা খেলার আসরে চলে যেতেন। নয়তো চলে যেতেন কোনো আড্ডায়। কারণ, তাঁর এসবকিছুই ভালো লাগত। সভা-সমিতিতে গিয়ে হাত তালি নেওয়া বা বক্তৃতা দেওয়া—এমন কিছু নজরুলের জীবনে খুব অল্পই হয়েছে। যখনই তিনি কোনো সভা-সমিতিতে গিয়েছেন, মনে করতে হবে, তাঁকে সেখানে জোর করেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই সব সভা-সমিতিতে গিয়ে তিনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। আমার খুব ভালো লাগত তাঁর সেসব অভিভাষণের কথা। যেমন বর্ধমানে নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুব সম্মেলনে উদ্যোক্তারা তাঁকে ধরেই নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি যে ভাষণটা দিয়েছিলেন, সেটা সত্যিকার অর্থেই, একটা স্মরণীয় ভাষণ। তারপর—'চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' বলে যে গানটি গেয়েছিলেন, সেটা গাওয়ার পর তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেছেন এই রকম গান আর নেই। কেউ বলেছেন, যেভাবে গানটা গেয়েছেন, সেটা ঠিক নয়, *সওগাত*-এ যেটা ছাপা হয়েছে তার টেক্সটাই সঠিক। টেক্সট অনুসরণ করেই তিনি গানটা সব সময় গাইতেন। এ ছাড়া যুবকদের সম্পর্কে তিনি এত সব কথা বলেছেন যে তার শেষ নেই। বলেছেন তাদের অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে, মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে। বলেছেন আমাদের দুর্দশার নেপথ্যের কারণ সম্পর্কে। বলেছেন আমাদের মধ্যে ভাস্কর নেই, কবি নেই, গায়ক নেই, শিল্পী নেই। তিনি যুব সমিতিতে যেসব কথা বলেছিলেন, তারও বিবরণ আমি তুলে ধরেছি আমার স্মৃতিকথায়। আর একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি, *সওগাত*-এ আসলে নজরুলের যেসব কাজ করার কথা ছিল, তিনি তা করতে পারেননি। তাঁকে দিয়ে আমি লিখেয়েছি *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন একটা উপন্যাস লিখতে হলে আগের থেকে একটা প্লট ঠিক করে নিতে হয়। কিন্তু নজরুলের মাথায় তেমন কিছু ছিল না। হয়তো প্রাথমিক একটা ধারণা ছিল। অথচ নজরুল সেই উপন্যাস *সওগাত*-এ ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। তিনি *সওগাত* অফিসে একদিন এলেন লিখবেন বলে। আগের লেখা কিছু ছিল না। এসেই আমার মেয়েকে বলতেন, নুর (নুরজাহান বেগম) গত মাসের *সওগাত*টা নিয়ে আয় তো কী লিখেছিলাম একটু দেখে নিই। তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে একটা উপন্যাস লিখে যাচ্ছেন তিনি, এত বড় একটা কাজ আর তিনি বলছেন যে গত মাসের কাগজটা নিয়ে আয়। অনেক জায়গায় হয়তো বইটা একটু খাপছাড়া হয়েছে, তার কারণ উপন্যাসটা তিনি একনাগাড়ে লেখেননি। তাকে ধরে আনতাম আর অফিসে বসিয়ে তার পরের অংশটা লিখিয়ে নিতাম। *জিনের বাদশা*, *শিউলি মালা* নামের গল্প দুটো তাঁকে দিয়ে আমিই লিখিয়ে নিয়েছিলাম। তাতে দেখা যায় যে তাঁর বেশির ভাগ গল্পই আমার অনুরোধে বা চাপাচাপিতে লেখা। তার তিনখানা উপন্যাসের দুখানাই আমি তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে

নিয়েছিলাম। উপন্যাস দুটো হলো—*মৃত্যুক্ষুধা* আর *কুহেলিকা*। আর একটা পত্র-উপন্যাস করাচিতে বসে লিখেছিলেন। সেটা ছাপা হয়েছিল *মোসলিম ভারত*-এ। এই তিনটিই তাঁর উপন্যাস। কিন্তু এসব কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কারণ, নজরুল ছিলেন একজন প্রকৃত কবি। তাঁর মনে যখন যে ভাবের উদয় হতো, তা-ই তিনি লিখতেন, তা-ই তিনি বলতেন। আপনার কথামতো, আমার কথামতো যা-কিছু লিখেছেন, সেগুলো ভালো কিছু হয়নি। বলেছি, এ ধরনের লেখা তিনি হয়তো বিপদে পড়ে লিখেছেন। নজরুলের গল্প বলুন, উপন্যাস বলুন, যেগুলো আপনারা এখন পড়ছেন, আমি বলব, সেগুলো ঠিক গল্প-উপন্যাস হিসেবে উতরায়নি। ওসবে যে ধরনের সাহিত্য বা শিল্পগুণ থাকা উচিত ছিল, তার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কারণ, তাঁকে দিয়ে এসবই জোর করে লিখিয়েছি আমরা। কিন্তু তাঁর গান ও গজলগুলো তিনি তাঁর অন্তর থেকেই লিখতেন। সেগুলো আমাদের কথামতো লেখেননি। তাই সেগুলো ভালো হয়েছে। কীভাবে তাঁর মনে গজল গান লেখার ভাবের উদয় হয়েছিল, এবার সে কথা আপনাদের একটুখানি বলছি।

১০. নজরুলের গজল

ঘটনাটা এখনো আমার মনে গেঁথে আছে। মিসর থেকে একজন আরব মহিলা এসেছিলেন। তার নাম ছিল ফৌজিয়া। তিনি আরবিতে গান গাইতেন। কলকাতার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে গান গাওয়ানোর জন্য তাঁকে চুক্তির ভিত্তিতে এখানে আনা হয়েছিল। নজরুল এসে আমাকে বললেন যে, ফৌজিয়া ভালো গান করে এবং নাচেও ভালো। চলেন শুনে আসি। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনি বসে বসে লিখতে থাকুন। আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে বললাম যে, তুমি ওপরের ক্লাসের তিনটা টিকিট নিয়ে আসো। নজরুলের একটা, তোমার একটা আর আমার জন্য একটা। নজরুলের লেখা শেষ হলে আমরা সন্ধ্যার সময় গেলাম আলফ্রেড মঞ্চে। গিয়ে দেখি খুব সাজানো হয়েছে মঞ্চটা। চারদিকে জৌলুশের ছড়াছড়ি। আমরা তিনজন বসলাম। এমন সময় ফৌজিয়া মঞ্চে এলেন। এসেই প্রথমে একটা নাচ দেখালেন। তারপর কয়েকটা আরবি গান গাইলেন। আমরা তো কিছুই বুঝলাম না। নজরুলও কী বুঝল না-বুঝল জানি না। তবে গানের সুরে সুরে, তালে তালে তিনি একাই মাথা নাড়াতে শুরু করলেন। নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলেন। মানে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। এরপর ফৌজিয়া একটা উর্দু গজল গাইলেন। গজল গানটা শুনে নজরুল একেবারে বিমোহিত হয়ে গেলেন। এই ভালো লাগার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে নজরুল বললেন যে, আমার গজল গান লিখতে ইচ্ছে করছে। আমি একটা গান লিখে আপনাকে দেব। আপনি

এ মাসের *সওগাত*-এ সেটা ছাপবেন। তিনি ঠিক সময়মতোই নিয়ে এলেন। *সওগাত*-এ তাঁর প্রথম যে গজল গানটা বেরিয়েছিল, তার প্রথম দুটো লাইন ছিল এরকমের :

'আজি এ বসন্ত ফুলবনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।'...

সবগুলোর কথা আমার আজ মনে পড়ছে না। যা-ই হোক, এই গানটা *সওগাত*-এ ছাপা হলো। এরপর দেখি যে অনবরতই তিনি গজল গান লিখে চলেছেন। এবং প্রত্যেক মাসেই তা *সওগাত*-এ ছাপতে দিচ্ছেন। গজল লেখায় তাঁর বিরাম নেই। সত্যি বলতে কী গজল গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়ে গেল বহুগুণে। আর আমাদেরও তা শুনতে এত ভালো লাগত যে বলে শেষ করার নয়। সবাই এ গান পছন্দ করত।

ওদিকে গজলের দিকে বেশি করে ঝুঁকে যাওয়ার ফলে কবিতা লেখার অভ্যাসটা তিনি বলতে গেলে ছেড়েই দিলেন। কবিতা আর লিখতেই চান না। লিখলেও লিখতেন তাঁর খেয়ালখুশিমতো। যেমন ফজিলাতুন্নেসার সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠলে তিনি লিখলেন 'রহস্যময়ী' কবিতা। এই সময় তাঁর আর্থিক অবস্থাও একটু ভালোর দিকে যাচ্ছিল। কারণ, হিজ মাস্টার ভয়েজ গ্রামোফোন কোম্পানির তরফ থেকে তাঁকে বলা হলো, তুমি আমাদের গানের বিভাগটা একটু তদারকি করবে আর যারা গান করে তাদের চালিয়ে নিলে ভালো হয়। সেখানে তাঁর আয়-রোজগার বেশ ভালোই হচ্ছিল। পাশাপাশি তিনি গান, গজল ও অন্যান্য গান গ্রামোফোন কোম্পানিকে দিতে আরম্ভ করলেন। তারপর 'হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানি' এসে বলল, আমাদেরও গান দিতে হবে। তারপর তার পেছনে এসে জুটল যত থিয়েটার কোম্পানি। আর যারা সিনেমার লোকজন, তারাও এসে বলল, আমাদেরও গান লিখে দিতে হবে। এর মূলে আর কিছুই না, নজরুলের গান ছাড়া কোনো আসর তখন জমে না। যেমন সিরাজউদ্দৌলা নাটকের আলেয়া এবং লুৎফুন্নেসা চরিত্রের মুখের গান তাঁকেই লিখে দিতে হলো। আমার আশ্চর্য লাগত লোকটা একাকী কী করে রোজ এতগুলো গান লিখতেন আর সেসব গানে সুরও দিতেন! তখন গান লেখা আর সেই গানে সুর দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল না নজরুলের। এই গানের জগতে যাওয়ার পর তাঁর কবিতা লেখা খুব কমে গিয়েছিল। তিনি গানই লিখেছেন বেশি। মাঝেসাঝে দুই একটা চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছেন। তবে তিনি অভিনয়ে সফল হতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কবি।

এ সময় মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে সেই সমাজের রক্ষণশীল অংশটি নানাভাবে নজরুলের বিরোধিতা করত। কেন করত, সে কথা বলতে গেলে আবার

গোড়ার কথায় যেতে হয়। প্রথম দিকে নজরুল করাচি থেকে যা-কিছু লিখতেন, সেগুলো উঁচু দরের কবিতা ছিল না। সেগুলোতে অনেকটা উচ্ছ্বাস ছিল। তখন তাঁর বয়সই-বা কত! আর তখন তিনি অত বেশি সাহিত্যচর্চা করার সুযোগ পাননি। আল্লাহ তাঁকে অসীম প্রতিভা দিয়েছিলেন। এবং সেই প্রতিভার জোরেই তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম দিকে নিজের থেকেই তিনি লিখতেন। করাচি থেকে তাঁর প্রথম দিকে পাঠানো লেখাগুলো আমি ছাপতে পারতাম না। কারণ, সেগুলো কাঁচা হাতের লেখা ছিল। সেগুলোয় যথেষ্ট উচ্ছ্বাস থাকলেও কাব্যের বিচারে সর্বাংশে সুন্দর ছিল না। তবে তাঁর তখনকার সব কবিতাই যে আমরা ফেলে দিতাম, সেকথা বলব না। রেখেই দিতাম। এভাবে সেগুলো আর ছাপা হতো না। তখন নজরুল ইসলাম লিখলেন যে আমি এত কবিতা লিখলাম, কিছুই ছাপা হলো না। তার পরই তিনি 'কবিতার সমাধি' বলে একটা কবিতা লিখে তাতে জানালেন যে, আমি আর *সওগাত*-এ কবিতা দেব না। 'কবিতার সমাধি' ছিল একটা ব্যঙ্গ কবিতা এবং এটাই *সওগাত*-এ প্রকাশিত নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা। তিনি তখন যা-কিছু লিখতেন, সে ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি যে, তাঁর লেখার একটা নতুন ধরন পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর লেখায় একটা প্রাণ ছিল, চাঞ্চল্য ছিল। এরই পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম নজরুলের প্রথম লেখাতেই। তারপর নজরুল যখন করাচি থেকে এখানে এলেন, তখন আমাদের মুসলমান সমাজে এমন কোনো আশ্রয়স্থল তিনি পাননি, যেখানে থাকলে তিনি তাঁদের সাথে মেলামেশা করতে পারেন বা তাদের হয়ে লিখতে পারেন। এমন কোনো সুযোগ-সুবিধা তিনি পাননি। তিনি মুসলমান সমাজের সাহচর্য বিশেষ পাননি। তার কারণ, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিক কম ছিল। তাদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকাও ছিল না। কাজেই কংগ্রেস দলের হয়ে যাঁরা রাজনীতি করতেন, তাঁরাও তাঁকে ডাকতেন, আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা লেখক, কবি এবং সাহিত্যিক, তাঁরাও তাঁকে টেনে নিতেন। তাঁদের কথাই বলেছেন তিনি তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে। অনেক সময় এমন অনেক কবিতা লিখেছেন, যেগুলো চমকে দিয়েছে মুসলমান সমাজকে। যেমন তাঁর 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার কথাই ধরা যেতে পারে। এটা যে তিনি লিখেছিলেন, তাতে মুসলমানদের কিছু যায় আসেনি। তিনি তখন যাঁদের (হিন্দুদের) সাথে ছিলেন, তাঁরা তাঁর খুবই প্রশংসা করেছিলেন। এই লেখার দরুন আমাদের যে সমাজ, ধরুন কট্টর মোল্লা সমাজের কথাই যদি বলি, তাঁরা এসব লেখা সহ্য করতে পারতেন না। নজরুলের এসব প্রগতিশীল লেখার জন্য তাঁরা বলতে শুরু করলেন যে তিনি এসব কী লিখছেন? যত সব হিন্দুয়ানি লেখা! বলতে বলতে এমন অবস্থা হলো যে তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমতো অপপ্রচার শুরু করে দিলেন মৌলবি সাহেবরা। তাঁরা বলতে লাগলেন যে, নজরুল ইসলাম যা

লিখছেন, তা ইসলাম বিরুদ্ধ। অথচ আমাদের সমাজের সঙ্গে কিন্তু ওইসব লেখার কোনো সম্পর্কই ছিল না। তিনি কীর্তন লিখেছেন কিন্তু একজন মুসলমান লেখকের পক্ষে সফলভাবে কীর্তন লেখা কম কৃতিত্বের কথা নয়। যথেষ্ট কৃতিত্বের কথাই অথচ তাঁরা এ নিয়ে মোটেও ভাবেননি।

তাঁরা বলতেন, তিনি কীর্তন কেন লিখলেন? তিনি শ্যামা সংগীত কেন লিখলেন? এই নিয়ে তাঁরা ঝগড়াবিবাদ করতেন। কিন্তু একজন কবি যেকোনো বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি অন্য ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। ভাই গিরীশচন্দ্র সেন কোরআন শরিফের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছেন, তাতে তো ব্রাহ্মরা তাঁকে বলেনি যে তুই ব্যাটা কোরআন শরিফ কেন অনুবাদ করলি, তোর ধর্ম গেল। এ রকমটা কেউ বলেনি। অনেক ইংরেজ মুসলমান সম্পর্কে, মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে লিখেছেন। কিন্তু তারা তো ইংরেজদের বলেনি তোরা মুসলমানদের সম্পর্কে কেন লিখলি? আমাদের সমাজের মোল্লারা খুবই অবিবেচক। নজরুলের লেখার জন্য তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বহু রকমের ফতোয়া দিয়েছেন, এমনকি 'কাফের' বলেও ফতোয়া দিয়েছেন। কিছু বাকি রাখেননি তাঁরা। কিন্তু তাতে করে নজরুলের কিছু এসে যায়নি। আমরা যতই চিৎকার করেছি, তার ফলে তাঁর যে প্রতিভা, তাঁর যে লেখার বা বলার শক্তি, সেটা বরং আরও বেড়েছে। কোনো মতেই কমেনি।

১১. নজরুলকে নিয়ে বিতর্ক

নজরুলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য আমাদের ওপর যে আক্রমণ এসেছে, সেটা ঠিক নজরুল ইসলাম, আমার বা আমাদের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে থাকেনি। এই আক্রমণের মধ্যে একটা মস্তবড় বিষয় ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের সমাজে প্রগতিশীল, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার কোনো লেখক নেই। কাজেই আমরা চেয়েছিলাম যে আমরাও আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করব, চিন্তাশীলতার মাধ্যমে, স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে সমাজকে, সাহিত্যকে উন্নত করব। এবং এই যে একটা প্রোগ্রাম, কর্মসূচি বা অভিযান, এটা যদি কার্যকর করা যায়, তাহলে তখন যাঁরা লিখতেন অর্থাৎ যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী ধারার লেখক-কবি ছিলেন, তাঁরা ভেবে বসলেন যে, আমাদের গোষ্ঠীটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, তাদের পায়ের নিচের মাটি যদি শক্ত হয়ে যায়, তাহলে তাদের অর্থাৎ রক্ষণশীল তথা প্রাচীনপন্থীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না—আমাদের তাদের আক্রমণ করার এটাই ছিল মূল কারণ। তাঁরা মনে করলেন যে আধুনিক লেখকেরা যদি নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনামতে কথা বলতে পারে, তাহলে তো আমাদের কোনো মূল্যই থাকবে না। আসলে এই ব্যাপারটাই ঝগড়ার

মূল কারণ। নজরুল ইসলাম বা আমাদের গোষ্ঠীর লেখকেরা যখন ইসলামকে, ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে কিছু লিখেছেন, তখনই কুসংস্কারপন্থীরা হই-হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই রকম হই-হট্টগোল আর মারমুখী প্রবণতার মুখে আমাদের গোষ্ঠীর লেখক-কবিরা যুক্তি দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, ইসলাম ধর্ম কি বাস্তবিকই এমন একটা ধর্ম, যা মানুষজনকে কিছুই বুঝতে দেয় না! তাঁরা আরও বলেছেন যে, ইসলাম বলেছে তোমরা বোঝো, আরও বেশি করে বোঝো, পয়গম্বররা বলেছেন, তোমরা প্রশ্ন করো; কিন্তু রক্ষণশীলদের কথা হলো, তোমরা প্রশ্ন করতে পারবে না। যা আছে তাই মুখস্থ করতে হবে। আমাদের দলের যাঁরা তরুণ লেখক, তাঁরা বললেন যে, আমরা ইসলামকে বুঝব এবং ইসলাম কী জিনিস, তা আমাদের সমাজকে বোঝাব। তাদের মনে যে কুসংস্কার, তাদের মনে যে গোঁড়ামি আছে, সেগুলো দূর করতে হবে। গোঁড়ামি মানে ইসলাম নয়, তরুণ সমাজ বলতেন, আমরা সেগুলো দূর করব। এবং দূর করব বলে তাঁরা যখন লিখতে আরম্ভ করলেন, তখনই রক্ষণশীল যাঁরা, তাঁরা বললেন যে, আমাদের আঘাত করা হয়েছে। এবং তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে জনসমাজ, সেই সমাজের উদ্দেশ্যে একটা ধর্মের দোহাই দিয়ে বলতে লাগল যে, এই যে নজরুল যা-কিছু লিখছেন, তার সবই অনৈসলামিক, ইসলামবিরুদ্ধ। এভাবে তাঁরা নজরুলকে তথা তরুণ সমাজকে জব্দ করা যাবে বলে মনে করলেন। কাজেই সেভাবেই তাঁরা তাঁদের আক্রমণ শানাতে শুরু করলেন।

১২. *সওগাত*-এর সমালোচনা

বস্তুত আমি *সওগাত* যখন আরম্ভ করি, তখন *মোহাম্মদী* পত্রিকার সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ ভাবতেও পারেনি যে বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোনো পত্রিকা দুই মাসও টিকে থাকতে পারবে। তাদের ধারণা ছিল, ওর যা ইচ্ছা তা-ই করুক। আমরা এ নিয়ে কিছু করব না বা বলব না। মুখোমুখি হলে বলত ভালো কাজই করেছ। তাদের আরও ধারণা ছিল যে, এই লোকটা যা করতে যাচ্ছে, এই সমাজে তা চলতে পারে না বা চলবে না। প্রথম দিকে সে কারণেই তাঁরা এসব কিছু উপেক্ষা করেছেন আর আমাকে মুখে মুখে প্রশংসা করেছেন। বার্ষিক *সওগাত* যখন বের করলাম, তখন মওলানা আকরম খাঁ সাহেব আমাদের আশীর্বাদ জানালেন এই বলে যে মুসলমান সমাজের এই অধঃপতিত সমাজে ইনি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সেটা খুব ভালো একটা কাজ। একথা আমি লিখেওছি বার্ষিক *সওগাত*-এ।

১৩. নতুন লেখকের আবির্ভাব

এ সব করতে করতে একপর্যায়ে এসে আমাদের ভেতর থেকে আমাদের সাহিত্যের

ক্ষেত্রে শক্তিশালী বেশ কিছু লেখক আবির্ভূত হলেন। ব্যাপারটা দেখে তাঁরা মানে রক্ষণশীলরা ভাবলেন যে এরা যদি এভাবে আরও এগিয়ে যান, তাহলে তাদের অর্থাৎ রক্ষণশীলদের, সেকেলেদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এবং এটাই ছিল সংঘাতের মূল কারণ। আসলে ব্যক্তিগত কারণে এটা হয়নি। ব্যক্তিগত কারণটা তখনই দেখা দিয়েছে, যখন তাঁরা মনে করলেন যে, নজরুল যদি এভাবে উঠে যান, তাহলে ছোটখাটো কবি যাঁরা, তাঁদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। আসলে হয়েও ছিল তা-ই। নজরুলের সঙ্গে তরুণদের দল যতই এগিয়ে চলল, তাঁদের একটু আগে থেকে যাঁরা কবিতা লিখতেন— যেমন গোলাম মোস্তফাসহ আরও কারও কারও ধারণা হলো যে নজরুল যা লিখছে, সেগুলো তো ঠিক কবিতা হচ্ছে না। তবে পদ্য ভালো হচ্ছে। এই ধারণা ছিল তাদের। এই দলে আরও অনেকে ছিলেন, নাম বলব না। গোলাম মোস্তফা তো ভালো ছিলেন। অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু অন্য আর যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা এই আধুনিক কবিতা লেখকদের পাত্তাই দেননি এবং এখান থেকেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের সাহিত্য জগৎ স্পষ্ট দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটা রক্ষণশীলদের দল আর একটা আমাদের আধুনিক প্রগতিশীলদের দল। আমাদের সাহিত্য জগতের যা-কিছু উন্নতি দেখছেন বা যেসব শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে কিন্তু প্রগতিশীলরা। তবে এসব কিছু এক দিনে হয়নি। এই সূত্রেই একে একে আমাদের সাহিত্য জগতে প্রথমে এলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, তারপর এলেন আবুল মনসুর আহমদ। তারপর এলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, এস ওয়াজেদ আলি, বরকতুল্লাহর মতো ধীমান লেখকেরা। এ রকমভাবে আস্তে আস্তে তাঁদের আগমন ঘটল, যাঁদের শক্তি ছিল, তাঁদের সবাই একে একে সাহিত্য ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। কাজেই এই যে আমাদের দলটা ছিল, যতই ঝগড়া হোক না কেন, তাঁদের রুখতে পারা যায়নি। আর যাঁরা কলহ করেছেন, তাঁরা আর কোনো দিন উঠতে পারেননি। তাঁরা যদি প্রগতিশীল তরুণ সমাজকে এ কথা না বলতেন যে, এরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করছে, এরা মুসলমান নয়, এরা মেয়েদের ছবি ছাপছে, এরা গানবাজনা করছে, এরা মঞ্চে নাচছে, নাচ শিখছে—এ ধরনের কথা যদি তাঁরা না বলতেন, এই কলহটা যদি না হতো, তাহলে আমরা এত সহজে উঠতে পারতাম না। এবং তাঁদের এই আক্রমণের ফলেই যাঁরা আধুনিক স্কুল-কলেজে পড়ে বা যারা একটু শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন, তাঁরা এসব লেখা পড়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করলেন। তাঁরা এঁদেরকে খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, এ ধরনের লেখা আরও বেশি বেশি করে লিখতে। কাজেই আমাদের প্রগতিশীল লেখক-কবিরা আরও বেশি বেশি উৎসাহ পেলেন। আর যাঁরা ধর্ম নিয়ে কলহ করেছেন, ধর্ম গেল, সমাজ গেল বলে বলে যাঁরা প্রতিনিয়তই শোরগোল তুলেছেন, তাঁদের অস্তিত্ব আস্তে

আস্তে লুপ্ত হয়ে গেল। আরও আশ্চর্যের বিষয়, যাঁরা নজরুলকে 'কাফের' বলেছেন, এমন একটা সময় এল, যখন তাঁরা নজরুলের একটা লেখা পাওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে দিন-রাত ঘুরঘুর করেছেন। ফলে, আমি বলব যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রগতিশীল লেখকদেরই জয় হয়েছে। আপনারা শুনে আরও অবাক হবেন যে, যে সময়ের কথা বলছি, তখন মুসলমানদের উদ্যোগে প্রকাশিত একটা কাগজের ৫০০ গ্রাহক হওয়াটা ছিল একটা উল্লেখ করার মতো ঘটনা। কিন্তু একসময় যখন আমাদের কাগজের সতেরো হাজার গ্রাহক হয়েছে, তখন পোস্ট অফিস থেকে আমাদের এই বলে চিঠি দেওয়া হতো যে আপনাদের *সওগাত* যদি পোস্টিং করতে হয়, তাহলে দুই-তিন দিন আগে আমাদের জানাতে হবে। কারণ এত বেশি প্যাকেট হ্যান্ডল করার মতো লোক আমাদের নেই। কাজেই সেদিন হেড অফিস থেকে আমরা স্পেশাল লোক এনে রাখব। এবং আরও অবাক হওয়ার ব্যাপার এই যে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল দলের কাগজ তখন আর চলল না—এটা একটা দারুণ ব্যাপার। এই ব্যাপারটার একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিল। তার মানে তখন আমরা জাগ্রত হয়েছি, আমাদের কবি-সাহিত্যিক, সাহিত্য জগৎ জাগ্রত হয়েছে, আমাদের পাঠকসমাজ জাগ্রত হয়েছে। *সওগাত*-এর কল্যাণে নজরুল এবং তাদের দলের কার্যকলাপ এবং লেখনির প্রভাবে, তাঁর কবিতা এবং গানের মাধ্যমে, বলা যেতে পারে, একটা নিদ্রিত সমাজকে তখন আঘাত করা হয়েছিল।

১৪. *সওগাত*-এর প্রথম পর্যায়ের লেখা

প্রথম আমি যখন *সওগাত* বের করলাম, তখন আমি ভালো লেখক পাইনি। সেই রক্ষণশীল দলের লেখক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সেই একঘেয়ে লেখাই ছাপাতাম। কারণ মুসলমান সমাজে সে রকম লেখক তখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। আর লেখকেরাও তখন সুযোগ পাননি। চিন্তাভাবনা করলেও তেমন কিছু লেখার সুযোগ তাঁরা পাননি। মনে করতেন, ও রকম কিছু যদি আমি লিখি, তাহলে লোকে আমাকে নিন্দা করবে। আমি অপমানিত হব। তখন আমাদের সমাজটাই ছিল এ রকমের। কাজেই আমাদের মধ্যে যাদের শক্তি ছিল, তাঁরাও তখন লেখেননি। আমি তখন মনে করলাম যে এ ধরনের লেখাই আমি ছাপব। তখন আমি লেখার মতো উপযুক্ত লোক খুঁজে পাইনি। ফলে আমার খুব অসুবিধা হয়েছিল।

বলতেই হবে, প্রথম তিন বছরে আমার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। ফলে আমার অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। আমার মনে হয়, *সওগাত* তখন জোর এক হাজার কপি ছাপা হতো। তখন আমি কিছুদিন কাগজটা বন্ধ রেখে দিয়ে লোক জোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার পরিকল্পনা আমি নতুন করে সবকিছু

আরম্ভ করব। ফলে আমি আবার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চাকরি নিলাম। তবে আমি জানতাম যে যারা চাকরি করে তারা সাধারণত কোনো দায়িত্ব নিতে পারে না। সাধারণত দায়িত্বটা এভাবে নিতে হয় যে যত বিপদই আসুক, এটা আমি চালাবই—এ ধরনের মনোভাব না থাকলে এ জাতীয় কাজ করা যায় না। চাকরিতে থাকা অবস্থাতেও আমার মাথায় কী যে ব্যারাম ঢুকল, আমার কেবলই ভাবনা আমাদের সাহিত্য নেই কেন? সাহিত্যিক নেই কেন? এই যে একটা ব্যারাম, এই যে একটা চিন্তা—এটা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। কাজেই এই কাজটা আমি কোনো লাভের আশায় করিনি। এটা যে লাভজনক কাজ নয়, সেটা সকলেই জানে। এবং এ কাজের পরিণতি কী হবে, আমি জানতাম না। কোনো লাভ-লোকসানের চিন্তা আমার মাথায় ঢোকেনি। কী করে *সওগাত* বের করব, কী করে লেখক সৃষ্টি হবে, কী করে লেখিকা সৃষ্টি হবে—এই চিন্তাতেই আমি বিভোর ছিলাম। এবং এখন পর্যন্ত এ চিন্তা আমাকে ছেড়ে যায়নি।

১৫. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

কাগজ বন্ধ রেখে দ্বিতীয়বার যখন তার প্রকাশনা শুরু করি, তখন প্রথম পেলাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীকে। তিনি *মোহাম্মদী* অফিসে চাকরি করতেন। ওখানে চাকরি করলেও তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন। স্বাধীনভাবে লিখতেন; কিন্তু সে লেখা *মোহাম্মদী*-তে ছাপা হতো না। এই নিয়ে তিনি খুব মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। কোনো সাহিত্যিককে যদি ক্ষুদ্র গণ্ডির বৃত্তে ধরে রাখতে চান, এবং তাঁকে যদি বলেন, কেবল এ ধরনের লেখাই লিখবেন, তাহলে সারা জীবনেও তিনি আর সাহিত্যিক হতে পারবেন না। আমার মনে সব সময় এ ধরনের একটা বিশ্বাস কাজ করেছে। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তখন *মোহাম্মদী* অফিস থেকে আমার এখানে চলে এলেন। এ প্রসঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার কথা না বললেই নয়। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী যখন *মোহাম্মদী* অফিসে চাকরি করতেন, তখন বাইরের একটা পার্টির সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়। পার্টি তাঁকে বলল যে, আপনি একটা বই লিখবেন, আমরা সেটা ছাপব। উনি কিছু টাকা পেয়ে তার প্রস্তাব মেনে নিলেন এই মর্মে। বিজ্ঞাপনও দেওয়া হলো যে, এ রকমের একটা বই বেরুচ্ছে, তার গ্রাহক করা হবে। অনেকে টাকা পাঠালেন। কিন্তু বইটা আর বের হলো না। ফলে গ্রাহকদের কেউ হয়তো এই বলে পুলিশে খবর দিল যে, এরা প্রতারক। বই ছাপার কথা বলেও বই ছাপেনি। অথচ টাকা নিয়েছে। কিন্তু ওয়াজেদ আলী এসবের কিছুই জানতেন না। কোম্পানির নাম ছিল মিনার কোম্পানি এবং তারাই এটার জন্য দায়ী। কিন্তু পুলিশ এসে লেখককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। থানায় নিয়ে যাওয়াতে কে-বা কারা দৌড়ে গেলেন মওলানা আকরম খাঁর কাছে। গিয়ে তাঁকে

তাঁরা অনুরোধ করল যে তাঁকে থানা থেকে জামিনে নিয়ে আসুন। উনি বললেন, লোকটা বড় বেয়াড়া। ও তো যা-ইচ্ছে তাই লেখে। আমি এসবের মধ্যে যাব না। তখন একজন লোক দৌড়ে এলেন *সওগাত* অফিসে। এর আগে ওয়াজেদ আলীকে সামনাসামনি দেখিনি। কিন্তু একজন সাহিত্যিকের বিপদ। তাঁর লেখাও পড়েছি। তখন একটা ট্যাক্সি করে গেলাম বেনিয়াপুকুর থানায়। এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমাকে দেখে তিনি হু-হু করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না। নিশ্চিন্তে থাকেন। ওসিকে জিজ্ঞেস করলাম এ দেশে যদি একজন কবি-সাহিত্যিকের এই দশা হয়, তাহলে আমরা যাব কোথায়? আপনি তাকে গ্রেপ্তার করলেন একটা চিঠির ওপর নির্ভর করে!

ওসি বললেন, সুপারিশ ছিল কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কারও। এ কথা শুনে আমি বললাম, আমি তার জামিনদার হব। আপনি জামিন দেবেন?

ওসি বললেন, আপনি তো *সওগাত*-এর মালিক, তাই না?

আমি বলি, হ্যাঁ।

শুনে তিনি বললেন, আপনাকে আমরা জামিন দিতে পারি না এ জন্যে যে কলকাতায় আপনার কোনো বাড়িঘর নেই। যাদের ল্যান্ড প্রপার্টি আছে, কেবল তাকেই জামিনদার করার নিয়ম আমাদের। আপনি যদি একজন উকিল বা মোক্তার আনতে পারেন, তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি তখনো ট্যাক্সিটা ছাড়িনি।

ড্রাইভার বললেন, আমার জানা একজন মুসলমান মোক্তার আছেন। খুব ভালো লোক।

তাঁর কথামতো গেলাম তার কাছে। তখন দু-একজন মুসলমান মোক্তার ছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে শুনি যে, তিনি বাড়ি চলে গেছেন। বাড়ি কোথায়? জানা গেল অমুক জায়গায় গ্রামের ভেতরে। খুব কষ্ট করে ওখানে গিয়ে দেখি মোক্তার সাহেব বাড়িতে নেই। বলি, কোথায় গেছেন?

জানানো হলো, কোর্ট থেকে এখনও তিনি আসেননি। একটুক্ষণ বসলাম। বসার পর মোক্তার সাহেব এলেন। আমি তাকে বললাম, আসসালামু আলাইকুম।

ওয়াআলাইকুম আসসালাম, মোক্তার সাহেব আমার মুখের দিকে তাকান। বলেন, কী ব্যাপার?

তাকে বলি ঘটনার আদ্যোপান্ত।

শুনেটুনে তিনি বললেন, আপনি *সওগাত*-এর এডিটর নাসিরউদ্দীন সাহেব না?

বলি, হ্যাঁ।

তিনি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা থানায় এসে জামিনদার হলেন। অবশ্য পরে ওই কেসে কিছু হয়নি।

ওয়াজেদ আলীর বইটা ছিল মুসলিম ইতিহাসের ওপর। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, বইটার যেখানে যেখানে চিন্তার খোরাক ছিল, জাতির জন্য যা উপকারী হতে পারত, সেই জায়গাগুলো মওলানা আকরম খাঁ ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি ওয়াজেদ আলীকে বলেছিলেন, ইসলামি লেখা লেখেন। ওসব ছেড়ে দেন। তাই তাঁর সঙ্গে আমার আর বনিবনা হচ্ছে না।

আমি বললাম, আমি *সওগাত* আবার বের করব। আপনার মতো যদি তিন-চারজন লোক পাই, তা হলেই আমার কাগজ চলবে।

১৬. আবুল মনসুর আহমদ

এটা বাংলা ১৩৩২ আর ইংরেজি ১৯২৬ সালের কথা। ওয়াজেদ আলী সাহেব এসে *সওগাত*-এ যোগ দিলেন। আর তাঁর সঙ্গে এসে জুটলেন আবুল মনসুর আহমদ। আবুল মনসুরের কথা ছিল, আমি অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। আমার মাথায় এসব চিন্তা সব সময় কিলবিল করে। কিন্তু কথা হলো আমার লেখা কেউ ছাপবে না।

আমি বলি, কেন ছাপবে না?

তিনি বললেন, মুসলমান সমাজে এমন কোনো কাগজ নেই যারা আমার লেখা ছাপবে। কারণ, আমি প্রথমেই আক্রমণ করব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, এই সংসারে যত ভণ্ড আছে, তাদের বিরুদ্ধে। বলুন ভণ্ডরা কি তাদের কাগজে ছাপবে এ রকমের লেখা? এসবই বললেন আবুল মনসুর আহমদ।

আমি বললাম, আমি ছাপাব আপনার লেখা। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন।

তিনি বললেন, আপনি যে ছাপবেন আপনাকে তারা পিটুনি দেবে।

আমি বললাম, তাহলে তো আর সাহিত্যকর্ম করা যাবে না। পিটুনির ভয়ে যদি সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা না বলি, তাহলে এ পথে আমার চলাই উচিত হবে না।

মনসুর সাহেব কতক্ষণ ভেবে বললেন, আপনি বেশ সাহস করেছেন। ঠিক আছে, আমি লিখব।

এরপর তিনি লেখা দিলেন। নাম 'লীডরে কওম'! তারপর 'হুযুর কেবলা'। তার মানে আবুল মনসুর আহমদের *আয়না* বইতে যত ব্যঙ্গ রচনা আছে, তার সবই আমি তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছি। এ ছাড়া আরও অনেক লেখা আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। আর এদিকে ছিলেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আমাদের কলেজ সহপাঠী কবি ফজলুর রহমান, পরে বড় কবি হয়েছেন আর হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। হবীবুল্লাহ তখন সম্পাদকীয় লিখতেন। এসব লোক জোগাড় করে আমি ১৯২৬ সালে নতুন করে *সওগাত* বের করতে শুরু করলাম।

তখন আমি একটা জিনিস চালু করলাম, যা এর আগে অন্য কেউ করেননি। আমি মনে করলাম যে একটা সাহিত্য মজলিশ করে তাতে যদি সাহিত্যিকদের আপ্যায়ন করা যায়, তা হলে তাঁরা আরও উৎসাহিত হবেন। কারণ, সাহিত্যিকদের তো টাকা পয়সা দিয়ে খুশি করা যায় না, তাদের মন ভালো রাখতে হবে, তাদের খুশি রাখতে হবে। এ রকম একটা ধারণা নিয়েই আমরা কাজ শুরু করলাম।

১৭. *সওগাত*-এর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

সিনেমায় যখন কোনো ভালো সিনেমা আসত দল বেঁধে সবাই গিয়ে তা দেখে আসতাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল কোরআন-হাদিসের সঠিক তথ্য, তার আসল যা-কিছু, তা মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচার করতে হবে। আর যা-কিছু আধুনিক, সমাজের জন্য তত দরকারি না, তা নিয়ে আমরা মাতামাতি করব না। করিওনি। মূল কথা হলো আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ এবং জাতির জন্য যেটুকু দরকার, কেবল সেসব কিছুই বেশি বেশি করে প্রচার করা হতো।

আর যারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি করবে, তাদের সেই ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করা হবে, তাদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এমন আঘাত হানা হবে, যাতে করে এসব কিছু তারা আর না করে। করার সাহস না পায়। ফলে আমাদের দলভুক্ত লেখকেরা উৎসাহিত হলেন, উদ্দীপিত হলেন। বয়সে তখন তাঁরা সবাই তরুণ। লেখার শক্তি আছে। সেই লেখার শক্তিও প্রবল। এই সময় ফুরফুরা শরিফের পীরসাহেব এই বলে ফতোয়া দিলেন যে, বল খেলা হারাম। লেখকেরা পীর সাহেবের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে এমন লেখা লিখলেন যে, একেবারে তাঁর বারোটা বাজিয়ে ছাড়লেন।

আসলে রক্ষণশীলেরা যা বিশ্বাস করতেন, সেগুলো প্রকৃত ইসলামের চিন্তাধারার সঙ্গে কিছুমাত্র যুক্ত ছিল না। সভ্য জগতেরও কোনো কিছু ছিল না। কাজেই আমি আমার দলভুক্ত লেখকদের বলেছিলাম যার ওপরে ভর দিয়ে জাতি উঠে দাঁড়াতে পারবে, ঠিক সেভাবেই প্রচারটা চালান—এটাই ছিল আমার বক্তব্য।

তখনকার দিনে আবুল মনসুর আহমদ ও তাঁর সতীর্থ আর যেসব লেখক ছিলেন, তাঁদের সবাই এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন এবং জোরেশোরেই তাঁদের সেই লেখনী-অভিযান চালিয়ে গিয়েছিলেন। আবুল মনসুর সাহেবই এ ব্যাপারে বেশি উদ্যমী ছিলেন। তিনি যখন *হুযুর কেবলা* লিখলেন, তখন রক্ষণশীলরা বা আরও একটু বেশি বিশেষণ যোগ করে বলতে গেলে বলতে হয় কাঠমোল্লারা ভীষণ খেপে গিয়েছিলেন। আবার যখন *লীডরে কওম* লিখলেন মওলানা আকরম খাঁকে লক্ষ করে, সেটা তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। তাঁরা খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং চারদিকে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যে,

সওগাত-কে তাঁরা একটা বিভীষিকা বলেই মনে করতেন। একটা মাসিক কাগজকে নিয়ে এ রকম আলোড়ন বা আন্দোলন খুব কমই হয়। কিন্তু সে সময় এসব শক্তিশালী লেখক সমাজের কুকর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত দেওয়ার ফলে সারাটা সমাজ যেন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

তখন আমাদের ভয়ানক সাহস দেখাতে হয়েছিল। অফিসের কাজ শেষে বিকেলে বাসায় ফিরতে পারব কি-না, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তবে আমরা বুঝেছিলাম যে এ টুকু ঝুঁকি না নিলে কাজ হবে না। কাজ করতে হলে এ টুকু দায়িত্ব তো নিতেই হবে। এ রকম কাজ করে যদি কেউ মারাও যায়, তবু তো বলবে, লিখে রাখবে যে লোকটা এ রকম একটা কাজ করেছিল। এ কাজের জন্য সে মারা গেছে। তাতেও একটা লাভ আছে। আর এ রকম কিছু না করে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, তার কোনো মানেই হয় না।

যা-ই হোক, আমি সাধারণত যাঁরা রাজনীতি করেন, সভা-সমাবেশ করেন, তাঁদের সঙ্গে বেশি মিশতাম না। কারণ, তাঁদের কাজই হলো ওসব করা। আর আমরা যারা ব্যবসা করি, পত্রিকা চালাই, প্রেস চালাই, তারা যদি ওসব করতে যাই, তাহলে আমাদের কারবার বা পত্রিকা ফেল করবে। এ ধারণা আমার মনে এখনো খুবই দৃঢ়। নজরুলের সঙ্গে আমার যেমন দীর্ঘদিনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাঁর অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের সেই বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

১৮. এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ

এ কে ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গেও সে রকম একদিন হঠাৎ করেই আমার দেখা হয়ে যায়। কথাবার্তাও হয়। এর আগে তাঁর মতো এত বড় নেতার সঙ্গে কোনো দিন আমার দেখা-সক্ষাৎ হয়নি। কারণ, আমি আগেই বলেছি, সমাজের যাঁরা নেতা বা লিডার, তাঁদের কাছে বেশি যেতাম না। ফজলুল হক সাহেবের বাড়ি ছিল তালতলা রোডে। তাঁর বাড়ির পাশের একটা বাড়ি আমি ভাড়া নিয়েছিলাম। তাঁর বাড়ির সঙ্গে আমার বাড়ির ব্যবধান ছিল মাত্র চার ফুট সরু একটা গলির। আমি সেখানে নিচের তলায় থাকতাম। ফজলুল হক সাহেবের নিজের বাড়ি ছিল ঝাউতলায়; কিন্তু সেখানে এত লোকের ভিড় আর এত হই-হল্লা হতো যে, আমি কোনো দিন ওসবের মধ্যে যাইনি। একদিন আমি আমার গাড়ি চালু করার চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু স্টার্ট নিচ্ছিল না কিছুতেই। হক সাহেব ওপর থেকে দেখে বললেন, 'কী গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না!' এই বলে উনি নিচে এসে প্রথমেই আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, পাশের বাড়িতে আপনি থাকেন। আমার স্ত্রী জিনাতুন্নেসা আপনার পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। *সওগাত* আমার ঘরে এখনো বাঁধাই করা আছে। আর আপনি কি-না আমার বাড়িতে একদিনও এলেন না।

দেখাও করলেন না! এটা কী রকম ব্যাপার, বলুন তো!

আমি বলি, আমি তো একজন ব্যস্তসমস্ত মানুষ, আর আমি সাধারণত বড় লোকদের বাড়িতে যাই না।

উনি বললেন, 'মনে কষ্ট পেলাম আপনার কথা শুনে। এই দুঃখ আমার মন থেকে যাবে না। এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে গরিব আর কেউ নেই।' কথাটা শেষ করেই বললেন, 'সন্ধ্যার পর আপনি আমার এখানেই খাবেন।'

আমি তাঁর দাওয়াত কবুল করলাম।

উনি আরও বললেন, 'জানেন, আমার নামে কয়টা মামলা আছে? কয়টা ওয়ারেন্ট আছে? আমি দেনার দায়ে ডুবে রয়েছি। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াই। আমার নামে কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট আসে। রাতের বেলা আমি ঘুমাই না। একটা টেবিলের ওপর কোনো মতে মাথা রেখে সারা রাত আমি কাত হয়ে পড়ে থাকি।'

বললাম, এত কিছু তো আমি জানতাম না।

এসবই বরিশালে স্যার নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর ভোটযুদ্ধ হওয়ার মাস কয়েক আগেকার কথা। প্রথম যখন স্বায়ত্তশাসনের ওপর ভোট হলো, ঠিক তখনকার কথা। সাক্ষাতে উনি বললেন, 'আমি একটা কথা বলার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আসেন, আগে খাওয়াদাওয়া করে নিই।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আমার হাতে টাইপ করা একটা কাগজ তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে দাঁড়াব আর গরিবের ডাল-ভাতের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। এটাই হলো আমার নির্বাচনী প্রচারের মূল কথা। গরিবের জন্য আমি খাটব, কৃষক প্রজা পার্টির জন্য কাজ করব; কিন্তু আমার মুশকিল হলো যে, যখন মুসলমানের কথা বলি, তখন হিন্দুরা বলে সাম্প্রদায়িক, আবার যখন হিন্দুদের কথা বলি, তখন মুসলমানরা দেয় গাল। দেখেন আমার সমস্যাটা তাহলে কী রকম! কাজেই আমি যে কথাগুলো বলি, আমি ঠিকই বলি; কিন্তু বুঝবার ভুলে লোকজন আমাকে এ রকমভাবে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। কাগজে নানা ধরনের লেখালেখি হয়।'

ফজলুল হক সাহেবের কথা শুনে আমি বলি, যারা কাজ করে যারা কর্মী, তারা এসব কথা গায়ে মাখে না। তারা কাজ করেই যায়।

উনি বললেন, 'খুব খুশি হলাম। আপনি আমার এই প্রোগ্রামটা একবার দেখেন।'

দেখলাম এ দেশের গরিবদের জন্য, কৃষক-প্রজাদের উন্নতির জন্য কী কী করা যায়, এসব লেখা আছে হাতে লেখা নির্বাচনী কর্মসূচিতে। আমি বললাম, আপনার নির্বাচনী-কর্মসূচির সঙ্গে আমার *সওগাত*-এর লক্ষ্যের অনেকটা মিল আছে।

আমিও সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কার, কৃষকের উন্নতি, জাতির উন্নতি—এগুলো চাই। কাজেই আপনার কর্মসূচি আমার খুব ভালো লেগেছে।

উনি বললেন, 'আমি যে ইলেকশন করব, তার প্রচারকাজের জন্য আমার নিজস্ব প্রেস, টাকাপয়সা নেই। খরচ জোগাতে পারছি না। আপনি আমার জন্য কী করতে পারেন?'

আমি বললাম, আমারও পকেট খালি, তবে আপনার যে উদ্দেশ্য সেটা আমি সমর্থন করলাম এবং আমার প্রেসে ছাপার যাবতীয় বিল আপনি নির্বাচনের পরে দিতে পারেন।

তিনি বললেন, 'তাহলে তো একটা সমস্যা মিটল। তবে কাগজ পাব কোথা থেকে, কীভাবে?'

আমি বললাম, দেখি ভোলানাথ দত্তের ওখান থেকে কাগজ আনতে পারি কি না। দোকানে গিয়ে বলি যে হক সাহেব নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, আপনি কাগজটা দেবেন।

শুনে দোকান থেকে বলা হলো যে আমার কাছ থেকে কাগজ নিয়েই উনি *নবযুগ* চালিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার টাকা বাকি পড়ে আছে। এখনো দেননি। হাইকোর্টে কেস করেছি। তাঁর নামে ডিক্রি হয়ে আছে; কিন্তু আমি অ্যাকশন নিইনি।

আমি বলি, আপনি এক কাজ করেন, ইলেকশনের জন্য যা কাগজ লাগবে দেন। বিল করবেন *সওগাত*-এর নামে।

এ কথা শুনে তাঁরা বললেন, তাহলে দিতে পারব।

তারপর ফজলুল হক সাহেব নাজিমুদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে কী রকম পোস্টার ছাপলেন, তাতে কী লিখলেন, জানেন? লিখলেন, 'ভাইসব, তোমাদের পোস্ট কার্ডের দাম ছিল এক পয়সা, সেই পোস্ট কার্ডের দাম তিন পয়সা করল কে?—নাজিমুদ্দিন।'

'ভাইসব, তোমরা যে নুন দিয়া পান্তাভাত খাও, সেই নুনের ওপর ট্যাক্স বসাল কে?—নাজিমুদ্দিন।' এ ধরনের কথাবার্তাই লিখলেন।

নির্বাচন হলে ১২/১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে হক সাহেব পাস করলেন। নাজিমুদ্দিন সাহেবের পক্ষে গভর্নর নিজে সব ধরনের নির্বাচনী রসদ জুগিয়েছেন। তিনি তাঁকে মোটর লঞ্চ দিয়েছেন, লোকজন দিয়েছেন, নৌকা ভাড়া করে দিয়েছেন। অন্যদিকে ছেঁড়া কাপড় পরে হক সাহেবের পক্ষে গ্রামের ছেলে-ছোকরারা নৌকা ঠেলেছে। ইলেকশনের খবর শুনে আমি আমার পরিচিত লোকজনদের বলি, হক সাহেব জিতেছেন, যাও রাস্তার ধারের রেলিংয়ে রেলিংয়ে মোমবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করো। ফলে তারা বাতি জ্বালিয়ে উৎসব শুরু করে দেয়। কতক্ষণ পর হক সাহেব রাস্তা থেকে ওপরের দিকে চেয়ে দেখেন অবাক

কাণ্ড। দৌড়ে এসেছেন ওপরে। আমি সামনে পড়তেই বলে ওঠেন, এখানে বাতি জ্বালাল কে?

আমি বলি, খবর জানেন না?

বললেন, না তো।

আমি বলি, আপনি এত হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতে গেছেন। কথাটা শুনে ওখানে দাঁড়িয়েই দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলেন তিনি। বললেন, 'দেখি আমাদের সমাজের জন্য, সকলের জন্য কিছু করতে পারি কি না। চেষ্টা করব।'

তবে নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা করতে গিয়ে তিনি বিপাকে পড়লেন। প্রথমত, তিনি হিন্দুদের ছাড়া মন্ত্রিসভা করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি কৃষক প্রজা পার্টির লোক হলেও পার্টিতে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'দেখো, যদি দেশের কাজ করতে হয়, তাহলে শত্রুকে মিত্র বানাতে হবে। তা না হলে কাজ করতে পারবে না।'

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, শত্রু কে? বললেন, নাজিমুদ্দিন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তাঁকেও মন্ত্রিসভায় নিতে হবে। নাজিমুদ্দিন সাহেব যখন আমার সঙ্গে মন্ত্রিসভায় আসবেন, তখন দুনিয়া দেখবে—আমি প্রধানমন্ত্রী আর নাজিমুদ্দিন আমার সঙ্গে কাজ করছেন। এতবড় একটা ব্যাপার। এ কথা বলার পরপরই তিনি আরও বললেন, 'আরে, বন্ধু তো বন্ধু আছেই। শত্রুকে যে আপন করতে পারে, আসলে সে-ই বড়।' এই সাংঘাতিক কথাটা তিনি আমাকে বলেছিলেন। শেষে দেখলাম, ঢাকার নবাব স্যার নাজিমুদ্দিন, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নলিনীরঞ্জন সরকার, সৈয়দ নওশের আলী (এই একজনই কৃষক প্রজা পার্টি থেকে গেলেন)—এঁদের নিয়ে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হক সাহেব মন্ত্রীদের যাঁকে যা বলতেন, তাঁদের সবাই তা-ই করতেন। কোনো প্রতিবাদ করতেন না। তাঁরা তাঁকে খুবই মানতেন। এই যে তিনি বিরোধী দলের লোক নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, তাঁদের কেউই কোনো দিন তাঁর বিরোধিতা করেননি। এ দেশে এক অর্থে রাজনীতি করা কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়, যেখানে নীতির কোনো বালাই নেই, যেখানে আমাদের নেতারা সকালে একদিকে তো বিকালে আর একদিকে যান। এসবই খুব খারাপ ব্যাপার। অসুবিধা হয়। তা সত্ত্বেও তিনি জীবনভর এভাবেই চালিয়ে গেছেন। এভাবেই চলেছেন। এমনটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। বিশেষ করে, মানুষটা যা-কিছু করতেন, করতেন আন্তরিকতার সঙ্গেই। দরিদ্র মানুষের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। আর মুসলমান সমাজের জন্য এমন কাজ নেই, যা তিনি করতে পিছপা হতেন।

একদিন তাকে বললাম, কলকাতার উপকণ্ঠে এক জায়গায় মুসলমান আর হিন্দু গোয়ালাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। আপনি না গেলে মারামারি আরও ছড়িয়ে পড়বে।

শুনে বললেন, 'চলেন এখনই যাই।'

আপনার জামাটা ছেঁড়া, যাওয়ার আগে জামাটা পাল্টে নিলে ভালো হয়।

আমার কথার জবাবে বললেন, জামা যায় না, ফজলুল হক যায়।

আমি আর কিছু বললাম না। সোজা ঘটনাস্থলে চলে এলাম। আসার পর গোয়ালারাও পায়ে পড়ে সালাম করে আর মুসলমানরাও এসে সালাম করে। দুপক্ষই সালাম করে। তখন বেশ মজা হলো।

উনি বললেন, 'কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া? ব্যাপারটা তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। মানো তো?'

ওরা বলল, হ্যাঁ, মানি।

বললেন, 'যাও, দুপক্ষই হ্যান্ডসেক করো।'

আমি বলি, তাতে কী হলো?

ফজলুল হক সাহেব বললেন, চলেন, বাড়িতে 'চলেন। দুদিন পর ওদের মধ্যে আপনা-আপনিই মিল হয়ে যাবে।'

আফতাব আলী বলে সিলেটের একজন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন জাহাজের কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি একদিন এসে ফজলুল হক সাহেবকে বললেন, 'স্যার, আমার একটা মামলা আছে। যেতে হবে।'

বললেন, 'তোমার কাজ, তখন তো যেতেই হবে।'

মামলা শেষে আফতাব আলী বললেন, 'আপনাকে টাকা বেশি দিতে পারলাম না। সামান্য কিছু দিলাম।' টাকা পাওয়ার পর তিনি সেগুলো কিসের ওপর যেন রেখেছিলেন। গোসল করে খাওয়াদাওয়া সারার পর দেখলেন যে, টাকাটা যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে নেই। তখন তিনি বললেন, 'কী আর করা যাবে! আফতাব, আমার রেলের টিকিটটা করে দাও।'

ফজলুল হক একবার মুন্সিগঞ্জ এসেছিলেন মামলা করতে। তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁকে দেখার জন্য লোকজন খুবই ভিড় করত। তারাও বলতেন, স্যার, গরিব মানুষ। টাকা বেশি দিতে পারলাম না।

যে যৎসামান্য টাকা তিনি তাঁদের কাছ থেকে পেতেন, সেটা তাঁদেরকেই দিয়ে বলতেন, 'তোমাদের টাকা তোমরাই নিয়ে নাও।'

এতসব ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। তেঁতুলিয়ার একটা মামলার কথা এখানে বলি। তখন হিন্দুদের কোনো মেয়ে যদি কোনো মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে যেত, তখন বলা হতো মুসলমানরা সব গুন্ডা। আমার মেয়েকে তারা জোর

করে ধরে নিয়ে গেছে। তাকে জেলে দাও। তেঁতুলিয়ায় মহিউদ্দিন নামে হক সাহেবের বাড়ির একজন কাজের লোক ছিল। তার সঙ্গে বরিশালের এক উকিলের মেয়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এলে দলের বিরুদ্ধে মামলা করা হলে দল ঘাবড়ে যায়। হক সাহেব বললেন, 'ঘাবড়িয়ো না। এই কেসটা আমি লড়ব।'

আমাকে বললেন, 'চলেন, হাইকোর্টে একটা মামলা দেখবেন।'

কোর্টে যাওয়ার পর দেখা গেল, মেয়ের মা-বাবা আর তার আত্মীয়স্বজনদের প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। হক সাহেব মেয়েকে বললেন, 'এই মেয়ে, তুমি সত্যি করে বলো তো, মহিউদ্দিন কি তোমাকে ফুসলিয়ে এনেছে? সত্যি কি না, বলো?'

মেয়ে বলল, না ফুসলিয়ে আনেনি।

তবে কী করে এসেছ?

মেয়েটা বলল, 'আমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি। আমি আর হিন্দু থাকব না।'

ওর কাছে এগিয়ে গেল ওর মা। মাকে বলল, 'এই তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।' দিল জোরসে এক ধমক। বাপ এগিয়ে গেলে বাপকেও বলল, 'আমাকে ছুঁয়ো না। আমি মুসলমান হয়ে গেছি।' তখন মামলায় মহিউদ্দিন খালাস পেয়ে গেল।

হক সাহেব বললেন, 'নারী অপহরণের যত মামলা, তার নাইন্টি নাইন পারসেন্ট মামলার রায় হয় মুসলমানদের পক্ষে। হিন্দুসমাজের আচারব্যবহার এত খারাপ যে, তা বলার নয়। বিধবা হলে তার বিয়ে হয় না। হয়তো ১৮ বছরের মেয়ে বিধবা হয়েছে। বিয়ে হয় না। এরাই এদিক-ওদিক চলে যায়। আর যত দোষ চাপে আমাদের মুসলমান সমাজের ঘাড়ে। কাগজে বের হয় যে, মুসলমানরা অসভ্য, মুসলমানরা এটা করছে, সেটা করছে। আপনারাই কাগজে এসব ছাপেন। সে জন্যই আমি আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি।'

দেখেন, কী রকম দূরদর্শী ছিলেন হক সাহেব। তারপর আমরা মহিউদ্দিনের ঘটনাটা *সাপ্তাহিক বেগম*-এ ছেপে দিই। উনি দেখে বলেছিলেন, 'সাব্বাশ!'

নির্বাচনের পর ভোলানাথ টাকা না পেয়ে আমার নামে কোর্টে নালিশ করে দিলেন। আমি সমনটা নিয়ে হক সাহেবের ওখানে গিয়ে বলি, দেখুন, কী সর্বনাশা ব্যাপার!

শুনে বললেন, 'মন্ত্রী হলাম মাত্র কয়দিন হলো। সমনটা পেয়ে আপনারা ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমার নামে তো কোর্ট থেকে ডজন ডজন নোটিশ আসে। আমি তো একদিনও ঘাবড়াইনি।'

আমি বলি, এখন বলেন আমাকে কী করতে হবে?

বললেন, 'আপনাকে নোটিশ দিয়েছে তো, আপনি চুপ করে থাকেন। আবার

নোটিশ পাবেন। তারপর ছয় মাস পর তারিখ পড়বে। আমি এই সময়ের মধ্যে কিছু রোজগার করতে পারব। আপনি এক কাজ করেন, সমনটা আমার জুনিয়রের কাছে রেখে দেন। সে এটার জবাব দিয়ে দেবে। ভোলানাথ দত্ত পাঁচ বছরেও টাকা পাবে না। আর যদি আপনি দিতে চান তো আমি মাইনেটা পেয়ে নিই টাকাটা দিয়ে দেব।'

এরপর অবশ্য টাকাটা তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এত বেশি বিপদ হয়েছিল যে, উনি সামাল দিতে পারতেন না। সেটা হলো এই, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উনি যা মাইনে পেতেন, তার দশগুণ বেশি তাঁর আত্মীয়স্বজন এসে বলত, এর মেয়ের বিয়ে হয় না—এই সেই নানা কথা। সবাই বাড়িতে ভিড় করতেন আর অনেকে তাঁর বাড়িতে থেকে খাওয়াদাওয়াও করতেন।

আমাদের এলাকায় একটা লোক ছিল। নাম রায় বাহাদুর সুখলাল কার্নানি। খুব বড় ধনী লোক।

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন রাজনীতি করতেন, তখন কার্নানির কাছ থেকে টাকা আনতেন আর ওদের একটা কিছু টাইটেল দিতেন। তাঁরা আর কিছু চাইতেন না, চাইতেন কেবল সম্মান।

হক সাহেবের মাথা তোলার উপায় ছিল না। দেনায় দেনায় তিনি জর্জরিত। তাঁর এসব দেনা পরিশোধ করবে কে? সবে নির্বাচন করে এসেছেন—বরিশালে দেনা, কলকাতায় দেনা। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভাগ্যকুলের রাজারাও তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে দিয়ে দুই একটা কাজ করিয়ে নিতে চাইলেন। তাঁরা সোজা তাঁর কাছে হাজির হয়ে বললেন, টাকা দেন। আর হক সাহেব বললেন, 'সবুর করেন।'

তারা বললেন, সবুর আর কত করব?

তখন নান্না মিয়া আমাকে বললেন, তারা সবুর করত কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তো ভিন্ন। আসলে উনি প্রধানমন্ত্রী বলে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে দিয়ে তারা তাদের সব কাজ করিয়ে নিতে চায়।

একজন আমাকে বলেছিলেন, যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা বিপদে পড়লে রায় বাহাদুর সুখলাল কার্নানি তাঁদের নাকি ঋণমুক্ত করে থাকেন। তাঁকে বলে দেখেন তো হক সাহেবকে ঋণমুক্ত করা যায় কি না? তাঁর কথামতো আমি গেলাম সুখলাল কার্নানির কাছে। যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'আপনি কে?'

বললাম, *সওগাত* নামে আমার একটা কাগজ আছে। প্রেস আছে। আর হক সাহেব আমার খুব বন্ধু মানুষ।

শুনে তিনি বললেন, 'ফজলুল হক সাহেবের কাছে তো আমি কয়েক হাজার টাকা পাব। সেই টাকা তিনি আর দেননি। হাইকোর্টে নালিশ হয়েছিল, ডিক্রি হয়ে

পড়ে আছে। আমি আর কিছু করিনি।'

বললাম, কার্নানি সাহেব, একটা মুশকিল আছে।

বললেন, কী?

বলি, হক সাহেব যদি প্রধানমন্ত্রী থাকেন, হিন্দুদের অনেক উন্নতি হবে। আর নাজিমুদ্দিন যদি প্রধানমন্ত্রী হন, হিন্দুদের শেষ করে ফেলবেন। কারণ, উনি সাম্প্রদায়িক, আর হক সাহেব সাম্প্রদায়িক নন। ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেন। আপনার তো টাকার অভাব নাই। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি ওনাকে ঋণমুক্ত করা হলে উনি নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের সমাজের জন্য কাজ করতে পারবেন।

বললেন, 'বলেন কত টাকা?'

বললাম, কত আর হবে, সব সুদ্ধ এক লাখ হতে পারে।

বললেন, 'এক লাখ টাকা—এ আর এমন কি! কিছুই না।' বলেই একটু ভেবে বললেন, 'আমি কাল সকালে আপনার বাড়ি যাব। কোথায় থাকেন আপনি?'

আমি বলি, হক সাহেবের পাশের বাড়িতে।

বললেন, 'আমি একটু ভেবেচিন্তে নিই। কাল সকালে আপনাদের ওখানে যাব।'

কথামতো কার্নানি সাহেব পরদিন সকাল নটার সময় বিরাট একটা গাড়ি চেপে হাজির হলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমি বললাম, হক সাহেবের ওখানে যান।

বললেন, 'না, ওখানে যাব না। আমি আপনার সঙ্গে আগে কথা বলব।' বললেন, 'তাঁর কাছে কে কত টাকা পাবেন, তার একটা তালিকা করে আপনি আমার কাছে দেন। আমি ধাপে ধাপে সবাইকে টাকা দিয়ে দেব। টাকাটা আমি পাওনাদারকে সরাসরি দেব।'

বললাম, ভালো কথা। আমি তালিকা করে আপনাকে জানাব।

রাতে আমি হক সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম, রায় বাহাদুর সুখলাল এসেছিলেন।

বললেন, 'আরে উনি তো আমার কাছে টাকা পাবেন। আমি তো টাকা দিইনি।'

বললাম, সে কথাই তো আপনাকে বলছি। উনি কী বললেন জানেন, আপনার সব দেনা তিনি শোধ করে দেবেন।

ফজলুল হক সাহেব অবাক হলেন, আগেরই তো অনেক টাকা পাবেন তিনি। আবারও নতুন করে টাকা দেবেন!

আমি বলি, সবকিছু আমি দেখব। আপনি কেবল পাওনাদারদের তালিকাটা দেবেন।

বললেন, 'আমি তো বলতে পারব না কে কে আমার কাছে টাকা পাবে। যে চেয়েছে তাকেই দিয়েছি। আবার যেখান থেকে এনেছি, তাকে আর দিইনি। আমি টাকা এনেছি। এনে আমার পকেট থেকে সেই টাকা আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু আমার কাছে কোনো হিসাব নেই।'

ফজলুল হক সাহেবের একজন অ্যাটর্নি ছিলেন। নাম সুখময় দত্ত। তাঁকে ডাকলেন আর চরণ দাস নামের একজন জুনিয়র উকিল ছিলেন, তাঁদের ডেকে এনে তিনি বললেন, 'তোমরা তালিকা করে দেখো তো আমার কাছে কে কত টাকা পাবে!'

তাঁর নির্দেশে তাঁরা দুজন কে কত টাকা পাবে তার একটা তালিকা করে নিয়ে এলেন।

তালিকাটা পাওয়ার পর আমি রায় বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। সেটা দেখে তিনি বললেন, 'এক দিনে একজনের বেশি পাওনাদারকে আমি টাকা দিতে পারব না।'

তিনি আরও বললেন, 'আগে ভাগ্যকুলের রাজাকে ধরেন দেখি। ব্যাটা কত পাবে! বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে।'

এই হলো কাহিনি। আর নির্বাচনের সময় তাঁর জন্য যে কিছু কাজ করেছিলাম, সে কথা তিনি সারাজীবনেও ভুলতে পারেননি। তার নিজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার কোনো ধরনের আয়োজন করলেই তিনি বলতেন, 'নাসিরউদ্দিনকে ডাকো। না হলে খাওয়াই জমবে না।' এ নিয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা রীতিমতো খেপে গিয়েছিলেন।

আর একটা কাজ তিনি জীবনে করেছিলেন, যা এর আগে আমি কারও কাছে বলিনি। আজ বলে ফেলছি। সেটা হলো এই—তিনি যখন কলকাতা মহানগরের মেয়র ছিলেন, তখন বা তার কিছু আগে জিন্নাতুন্নেসা নামের এক নারীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর আগের বিবি তো আলাদা থাকতেন। যা-ই হোক, হক সাহেবের বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল। জিন্নাতুন্নেসাই প্রতিপালন করেছিলেন তাকে। মেয়েটা তাঁর বাড়িতেই থাকত। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করত। এখানে কখন কোথা দিয়ে কী ঘটনা ঘটে গেছে, আমি বা আমরা জানতে পারিনি।

হক সাহেব বললেন, 'আমার এখন পরিচর্যা, সেবা পাওয়া দরকার। আর এই বয়সে আমি তো বাইরে থেকে একটা মেয়েকে জাঁকজমক করে বিয়ে করে আনতে পারি না। আর এই মেয়েটিকে এমনি রাখলে গুনার কাজ হবে। একটা অবিবাহিতা মেয়ে আমার সেবা করবে—এটা রীতিমতো গুনার কাজ হবে। তার চেয়ে ওকে আমি নিকাহ করে নিই। সে আমার কাজকর্ম করবে। আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা দেখবে। কথা শুনবে।' ব্যাপারটা নান্না মিয়া জানতেন। যা হোক, মেয়েটাকে তিনি নিকাহ করে ফেললেন। এই খবর পেয়ে তাঁর আগের বিবি হক সাহেবের বাড়িতে চড়াও হলেন। বাড়িতে ঢুকেই তাঁদের ওপর রীতিমতো হামলা করে বসলেন। তোরা কেন আছিস? মেয়েটাকে বললেন, 'ও তোর কী হয়?' চাকু

বা ছোরার মতো কী একটা হাতে নিয়ে তিনি ওদের ভয় দেখান, 'তোদের এক্ষুনি আমি মেরে ফেলব।' এই রকম অবস্থার মুখে হক সাহেবের নিকাহ করা মেয়েটা তো পালিয়ে এসে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিল। হক সাহেবের কাছে এই খবর দ্রুতই পৌঁছে যায়। তিনি তখন দরবারে ছিলেন। সেখানে গিয়ে কে একজন তাঁকে এই বলে খবর দেয় যে দুটো মেয়ে তাঁর বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। খবর পেয়ে হক সাহেব দৌড়ে এলেন। আমি তখন ডাক্তারখানায় ছিলাম। আমার বাড়ি থেকে একটা লোক গিয়ে আমাকে খবর দিল যে, হক সাহেব আপনার বাড়িতে দৌড়ে ঢুকেছেন। বলি, হায়, হায় কি বিপদ হলো তাহলে? কী ব্যাপার? গিয়ে দেখলাম, উনি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'বসেন।'

বলি, কী খবর?

হাত দিয়ে ঘরের কোনা দেখিয়ে বললেন, বড্ড বিপদের মধ্যে আছি। এই বাড়িতে যে আমি একটু শান্তিতে থাকব, তাও পারলাম না। কোথা থেকে এসে হামলা চালিয়েছে। ওরা ভয়ে পালিয়ে আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে।'

আমি বললাম, আপনি প্রধানমন্ত্রী। যে আপনার বাড়িতে কোনো দিন আসে না, হঠাৎ করে সে এসে এই রকম কাণ্ড ঘটাবে, আপনি বেত দিয়ে পিটুনি দেন না কেন?

বললেন, ফজলুল হক তো পিটুনি দিতে পারে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পারে না। আমি এ রকম একটা কিছু করলে কালকে দেখবেন *আনন্দবাজার, অমৃত বাজার* পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে কী বের হয়!

হক সাহেবের কথা বলতে গেলে *নবযুগ*-এর কথাও একটুখানি বলতে হয়। *নবযুগ* তো দুবার বের হয়েছে। প্রথমবার বের করেছিলেন মোজাফফর আহমেদ আর হক সাহেব মিলে। তখন আমি ছিলাম না। দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার সময় হক সাহেব বললেন, 'আমি *নবযুগ* বের করব। আপনি একটু সাহায্য করবেন।' আর বললেন, 'একটা কাজ করলে ভালো হয় না?'

বললাম, কী?

তিনি বললেন, 'নজরুলকে সম্পাদক করে এবার কাগজটা যদি ছাপি, তাহলে কাগজ খুব বিক্রি হবে, তাই না?'

আমি বললাম, নজরুলকে তো কেউ আনতে পারবে না। আসবেন না। তাঁকে আনতে হলে আমাকে যেতে হবে।

বললেন, 'কাল তিনটার সময় আমি এখানে বসে থাকব তাঁর আশায়। আপনি তাঁকে যে করেই হোক নিয়ে আসবেন।'

আমি গেলাম নজরুলের বাড়িতে।

তাঁর শাশুড়ি বললেন, 'ও তো কোনো কাজকর্ম করতে পারে না।'

বললাম, তাহলে কী করেন?

বললেন, 'আবোল-তাবোল কী সব বকে।'

জিজ্ঞেস করি, কী হলো তাঁর আবার?

বললেন, 'কিছু বুঝিটুঝি না। যা খুশি করে। খায় না। ভারি গোলমালে পড়েছি।'

এটা ১৯৪১-৪২ সালের কথা। নজরুলের শাশুড়ি আরও বললেন, 'এখন ওকে বাইরে যেতে দিই না। তবে তুমি যদি নিতে চাও, নিয়ে যেতে পারো। আবার সঙ্গে করে দিয়ে যাবে।'

ওপর থেকে নিচে নেমে নজরুল আমার সঙ্গে এলেন। আগে হাসতেন, হইচই করতেন, এখন কিছুই করেন না। কেবল ঝিম ধরে বসে থাকেন।

আমি নজরুলকে বললাম, আমার সঙ্গে যেতে হবে আমার বাড়িতে।

নজরুল বললেন, আচ্ছা।

আর কিছু বললেন না। বললাম, আমি আবার দিয়ে যাব।

বলেন, আচ্ছা।

আর কিছুই বলেন না।

নজরুলের শাশুড়ি ব্যাপারটা লক্ষ করে বললেন, 'বুঝতে পারছ কী হয়েছে?'

আমি বলি, আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আসার পথে নজরুল আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলেননি। আমার বাসায় আসার পর তাঁকে দেখিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, এই দেখো, কে এসেছে!

অন্যদিন আমার স্ত্রীকে নজরুল (আমার স্ত্রী নামাজ পড়ত বলে) 'মৌলভি সাহেব' বলে ডাকতেন। বলতেন, 'মৌলভি সাহেব' কোথায়? দেখা হওয়া মাত্র বলতেন, আদাব আদাব। কিন্তু আজ ওসবের আর কিছুই বললেন না। নজরুল আমার সঙ্গে বসে ভালোই খাওয়াদাওয়া করলেন।

হক সাহেবের বাসায় নিয়ে আসার পরও একই অবস্থা। দুজনই চুপ করে বসে থাকলেন। কেউ কথা বলেন না।

ব্যাপারটা দেখে আমি নজরুলকে বললাম, হক সাহেব পত্রিকা বের করবেন। আপনাকে তার সম্পাদক হতে হবে। সে জন্যই আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে নজরুল এক 'আচ্ছা' ছাড়া আর কিছুই বললেন না।

হক সাহেব বললেন, কী ব্যাপার?

হক সাহেবকে লক্ষ করে এবার নজরুল বললেন, 'আজকাল আমার কাছে গভীর রাতে অনেক বাণী আসে। আপনার জন্য যদি কোনো বাণী আসে, তা হলে আমি জানাব।'

নজরুল তখন কিছুই লিখতেন-টিখতেন না। হক সাহেবের ওখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে তাঁর শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়ে বললাম, এই দিয়ে গেলাম।

শাশুড়ি বললেন, 'ওকে নিয়ে তো আমি আর চিন্তায় বাঁচি না। কী হলো ওর, কিছুই বুঝি না।'

বললাম, হক সাহেবের ওখানে কিছুই খেলেন না।

তাঁর শাশুড়ি বললেন, 'বাড়িতেও কিছু খায় না। একটু খায়, খেয়েই ফেলে দেয়।'

এসবই ছিল নজরুলের চিরকালের জন্য 'নিশ্চুপ-নির্বাক' হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ। তার পরের ঘটনা তো সবারই জানা।

অনুলিখন : **রীতা ভৌমিক**

বই আলোচনা

কর্মী থেকে নেতা : উত্তরণের অসমাপ্ত কাহিনি

আবুল মোমেন

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবর রহমান, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২।

একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতির ভূমিকা পালন এবং অবশেষে জাতির পিতার মর্যাদা লাভ বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি সাম্প্রতিক কালেই ঘটেছে। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ উত্তরণ সম্পর্কে দেশের বিদ্বৎসমাজের মনের, ঘটনার চমৎকারত্বের কারণে বিস্ময়ের ঘোর থাকলেও এতকালের নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব মিলবে এবং এতে তাঁর প্রতি তাদের আগ্রহ ও আস্থাও অনেকখানি বেড়ে যাবে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, পাকিস্তানি সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ নিবর্তনমূলক পদক্ষেপের বিপরীতে শেখ মুজিবের সাহসী সংগ্রামী ভূমিকা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। কীভাবে একজন সাধারণ কর্মী দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিণত হন, আর সংগঠক থেকে নেতা হয়ে ওঠেন, তারপর কীভাবে এক জনপ্রিয় নেতা দলের গণ্ডি ছাপিয়ে জনগণের একচ্ছত্র নেতায় রূপান্তরিত হন, সেটা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা আজও এ দেশে রাজনৈতিক কলাম রচনা আর রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন। দেশের এ রকম শিক্ষিত শ্রেণীর সাধারণ ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না, বাগ্মিতা, দেশপ্রেম আর সাহসের জোরে তিনি এত দূর উঠে এসেছেন। অনেকের মনে এমনকি আত্মজীবনীটি তাঁর লেখা কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল।

কিন্তু আত্মজীবনীটির গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো, লেখক এতে কোনো বিশেষত্ব আরোপের চেষ্টা করেননি। সোজাসাপটা নিজের অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ হলো শেখ মুজিবের কথা, তাঁরই জবানিতে। সাহিত্যের কোনো কৃত্রিম আবরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বা আগ্রহ ছিল না; তিনি সত্যের নিরাভরণ সরল এক ভাষ্য রচনা করে গেছেন। অকপট সরল সত্যের আকর্ষণ প্রায় সর্বব্যাপী, পাঠকমাত্রকেই তা জয় করে নেয়। ফলে, এরও একটা সাহিত্য-মূল্য তৈরি হয়, ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি।

এই বইটি প্রকাশিত হওয়ায় দেশের বিদ্বৎসমাজ বঙ্গবন্ধু-চরিত্রের নতুন একটি দিক সম্পর্কে জানতে পারল, যা তাঁর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে। এটি বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সফল ব্যক্তিটির স্বরোচিত জীবনকাহিনি বলেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনকালের প্রথম পর্ব, যা এ উপমহাদেশ ও বাংলা-বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে অকপট সত্য বর্ণনা ও অত্যন্ত বিচক্ষণ বিশ্লেষণ হাজির করে ইতিহাসচর্চার অমূল্য এক ভান্ডার তিনি গড়ে তুলেছেন।

১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্ম। তাঁদের পরিবারের এবং তাঁর শৈশবের কথা বেশ বিস্তারিতই তিনি লিখেছেন। তাতে শেখ বংশের বনেদি সংযোগ জানা যায়, শরিকদের ওঠা-পড়া, শরিকিবিবাদও বাদ থাকে না। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শৈশবের ডানপিটে ছেলে ও ডানপিটেদের সরদার শেখ মুজিবকে আমরা চিনতে পারি। শৈশব থেকেই দেখি, তাঁর ছিল নিজের একান্ত গণ্ডি ছাপিয়ে দলবল নিয়ে অন্যদের বা সবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা, যা প্রমাণ করে, তাঁর মধ্যে নেতৃত্বগুণের উন্মেষ হয়েছে তখনই। এমনকি স্কুলজীবনেই চলমান রাজনৈতিক ঘটনা অনুধাবন করে নিজে তাতে ভূমিকা গ্রহণ ও পালন করার মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে ওঠার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর সাহস ও ত্যাগী মনোভাব, দেশ ও মানবপ্রেমের স্ফুরণও জীবনপ্রভাতেই শুরু হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটি অসমাপ্ত, ১৯৫৫ সালে এসে একটু আকস্মিকভাবেই শেষ হয়। এতে স্বভাবতই পাঠকের মনে অতৃপ্তি তো জাগেই, সেই সঙ্গে আফসোসও হয় এবং আফসোস বহু গুণ বেড়ে যায়, যখন দেখি পরবর্তীকালের কথা, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের আরও গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, কিছুটা তিনি নিজেই এবং কিছু তাঁর ডিক্টেশনে অন্যে লিখলেও সেগুলোর হদিস এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশের পর পরবর্তী অংশগুলো পড়ার তাগিদ পাঠকমহলে অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠবে। এ কারণে সেগুলো উদ্ধার ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার পরিবার, দল ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের

কর্মকর্তাদের। এ ছাড়া এ বইয়ের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান আরও কয়েকটি খাতার কথা, যেগুলোয় তাঁর আরও স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ রয়েছে। জাতীয় প্রয়োজনে ও পাঠকের আগ্রহে এগুলোও দ্রুত প্রকাশিত হওয়া দরকার।

দুই.

আত্মজীবনী পড়তে পড়তে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু একজন সহজ-সরল বাঙালি, যাঁর শিকড় বাংলার গ্রামেই প্রোথিত। সরলতার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ সততা ও আন্তরিকতা শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই গুণাবলির রসায়নে তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছে জনদরদি মন, আর এর প্রেরণায় সমাজসেবার সূত্রে তাঁর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে, তা পুষ্ট হয়েছে মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমে। ফলে, অল্প বয়সেই তিনি হয়ে ওঠেন অঙ্গীকারবদ্ধ এক রাজনৈতিক কর্মী।

কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকে তা ছিলেন না। বরং বেপরোয়া স্বভাবের রগচটা রাগী ছোকরা ছিলেন। নিজের সম্পর্কে অকপটে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'দরকার হলে সমানে হাতও চালাতে পারতাম, আর এটা আমার ছোট্টকাল থেকে বদঅভ্যাসও ছিল' (পৃ. ৯৬)। নিজেকে একগুঁয়ে প্রকৃতির তরুণ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। তরুণ বয়সে অন্যায়ভাবে বন্দী হওয়া এক আত্মীয়কে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়েও এনেছিলেন। তলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়তে গিয়েই এই সংগ্রামী তরুণ অল্প বয়সে আত্মসংবরণ করতে পারতেন না। মানুষের, বিশেষ করে বাঙালি চরিত্রের কিছু বদভ্যাস তাঁকে খুবই কষ্ট দিত, প্রতিবাদ না করে তিনি পারতেন না। নানা সময়ে সমাজের উঁচুতলার মানুষের মধ্যে নীচতা, ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতার নিদর্শন দেখে দেখে তিনি তিক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন, যা তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, 'আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। ... এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ার খুব অল্প দেশেই আছে, তবুও এরা গরিব, কারণ যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।' (পৃ. ৪৭-৪৮)

সরল মানুষের মনে সহজাতভাবেই ন্যায়বোধ থাকে। এ কারণে চোখের সামনে যেকোনো অন্যায় সহ্য করা কঠিন হয়, কোনো বিহিত করতে না পারলে নিজেকেই দোষী মনে হয়। ন্যায়বোধ এমন একটি চেতনা, যা মানুষকে প্রতিকারকামী

সোচ্চার সক্রিয় কর্মীতে রূপান্তরিত করে। শেখ মুজিব এভাবে পারিবারিক ও অ্যাকাডেমিক গণ্ডি ছাপিয়ে স্কুলজীবনেই দেশের ও দশের কাজে জড়িয়ে পড়ে একজন সচেতন রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠেন।

তাঁর তরুণ বয়স কেটেছে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাবহুলকালে, যখন মঞ্চস্থ হয়েছে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষ অধ্যায়। একদিকে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ আরেক দিকে দেশের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও হিংসার সংঘাত—দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের দোলাচল, স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা মিলে এ ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা সমস্যাসংকুল দুঃসময়। এই কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হয়েই শেখ মুজিব একজন খাঁটি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গড়ে উঠেছেন।

স্কুলজীবন থেকেই তিনি মাঠপর্যায়ের কর্মী। ফলে যেকোনো পরিস্থিতির ভেতর থেকে চলমান ঘটনার একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে তিনি আমাদের এই ভাঙাগড়ার ইতিহাসের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা লক্ষ করি, তিনি কর্মী হলেও ঘাড় গুঁজে নেতাদের আদেশ তামিল করার পাত্র নন, প্রতিটি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতামত তো থাকতই, সেই সঙ্গে চলমান ঘটনাবলি নিয়ে মূল্যবোধাশ্রয়ী ন্যায়-অন্যায়বোধও ছিল প্রখর। ফলে, শেখ মুজিব অল্প বয়সেই হয়ে উঠেছিলেন অনুগত কর্মীবাহিনীর নেতা। আর সে কারণে খুব অল্প বয়সেই তিনি যেমন নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তেমনি তাঁদের কাছে গণ্য হওয়ার মতো একজন রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে ওঠেন। অধিকাংশই তাঁর ওপর নির্ভর করেছে, আবার অনেক সময় তাঁর প্রতি বিরূপ হলেও তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেনি কেউ।

স্কুলে থাকতেই গোপালগঞ্জে শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সংবর্ধনা সভার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক গুরু শহীদ সাহেবের নজরে পড়েন। তাঁর স্কুলের সংবর্ধনার পর যখন শহীদ সাহেব, 'হাঁটতে হাঁটতে মঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম।' (পৃ. ১১) একপর্যায়ে মন্ত্রী শহীদ সাহেব, 'নোটবুক বের করে আমার নাম ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটি চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম।' (পৃ. ১১) সেই থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবের নেতা-কর্মীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূচনা হয়। লক্ষ করার বিষয়, প্রবীণ নেতা ও মন্ত্রী আঠারো বছরের এক কিশোর-কর্মীকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে যেমন সোহরাওয়ার্দীর উদার গণতান্ত্রিক মানসের পরিচয় মেলে, তেমনি বোঝা যায়, গ্রাম্য কিশোর শেখ মুজিবের মধ্যে চোখে পড়ার মতো অনন্যতাও কিছু ছিল।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাড়াও সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ সব মুসলিম নেতার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। শেরেবাংলা ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখের সঙ্গে তাঁর কখনো সহজ আর কখনো দ্বন্দ্ব-কঠিন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সে প্রসঙ্গে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

তিন.

শেখ মুজিবের জন্ম হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু এক বনেদি মুসলিম পরিবারে। তাঁদের এলাকাটি ছিল হিন্দু-অধ্যুষিত। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় নিজের সম্প্রদায়ের পিছিয়ে থাকার বেদনা ও গ্লানি নিয়ে। তিনি খেলার মাঠ ছেড়ে রাজনীতির মাঠে নামেন স্বজাতির কল্যাণের ব্রত নিয়ে। ব্রিটিশ শাসন আমলের 'ভাগ করে শাসন করো' নীতির আড়ালে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ফলে, ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে বাঙালির জাতি-চেতনা ও জাতি গঠনের যিনি কান্ডারি, সেকালে তাঁরও জাতি-চেতনায় ধর্মীয় বোধই প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর সে সময়ের মনের কথা এ রকম, 'তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ' যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।' (পৃ. ১৫)

কিন্তু এই তরুণ ছাত্রনেতার চোখ-কান খোলা, বিচার-বিশ্লেষণের মন আছে, পক্ষ-বিপক্ষ বুঝতে সক্ষম এবং নিজের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের সাহস ও সামর্থ্য দুটোই আছে। সে আমলে মুসিলম লীগে দুটি উপদল সক্রিয় ছিল, 'এই সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটি প্রগতিবাদী দল, আর একটি প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদসাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই, জনগণের প্রতিষ্ঠান করতে চাই।' (পৃ. ১৭) শেখ মুজিব ওই বয়সেই পীড়িত বোধ করেছেন দেখে মুসলিম লীগ তখনো জনগণের নয়, 'জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল।' (পৃ. ১৭)

দেখা যাচ্ছে, গোড়া থেকেই তিনি রাজনীতি করেছেন জনকল্যাণের জন্য, যদিও তখনো জনগণ বলতে প্রধানত পূর্ব বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রজাদের কল্যাণই তাঁর বিবেচনার বিষয় ছিল। তাঁর মনে সাধারণভাবে হিন্দুবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকলেও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে তাঁকে 'হিন্দু বেনিয়া ও জমিদারদের আক্রমণ' (পৃ. ২৩) করেই বক্তব্য দিতে হয়েছে।

পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েও এবং মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েও শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিষয় বাদ রাখেননি। সে আমলে একদিকে 'হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারে বাংলার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল' আর অন্যদিকে 'ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতার পথ ধরে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ছিল।' পাশাপাশি হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি বৈরী ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাদের মধ্যেই অনেকে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে ফাঁসিতে যেতে বা কারা ভোগ করতে দ্বিধা করেনি। বাস্তবতার সবটা দিকই তিনি দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেছেন বলে তাঁর উপলব্ধি, 'এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ *(হিন্দু)* স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না। (পৃ. ২৩-২৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষ বসু ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অনেক সময় এ ব্যাপারে হিন্দুদের হুঁশিয়ার করেছেন, সে প্রসঙ্গও টেনেছেন। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এই টানাপোড়েনের ধকল ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেও সইতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মনোজগতে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়েনি। পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হয়েও কীভাবে তিনি অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধকে টিকিয়ে রাখলেন, সেটা তাঁর লেখা থেকেই বুঝতে হবে। তিনি লিখেছেন—

'অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষে মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরাও সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে, ভারতবর্ষের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে।' (পৃ. ৩৬)

পরবর্তীকালে দুই দেশের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় সংখ্যালঘুদের ভোগান্তিতে যেন প্রমাণিত হলো, এ ছিল এক আদর্শবাদী তরুণের সরল বিশ্বাসের প্রকাশ।

অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদে তাঁর বিশ্বাস গোড়া থেকেই পোক্ত ছিল এবং তা অটুট থেকেছে বরাবর। জেলে এক আদর্শবান হিন্দু সমাজসেবককে তিনি বলেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।' (পৃ. ১৯১) এই বিশ্বাস থেকে তিনি সরে আসেননি কখনো। হয়তো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে

তাঁর এ বিশ্বাস রক্ষা করা সম্ভব কি না, সেটা আগাম আঁচ করতে পারেননি তিনি, যেমন দেশভাগের অনুষঙ্গ হয়ে দাঙ্গা কী ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, তা বুঝতে পারেননি নেহেরু-জিন্নাহর মতো অনেক বর্ষীয়ান বাঘা নেতাও। কিন্তু শেখ মুজিব যখনই বুঝতে পেরেছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান সব ক্ষমতার মালিক হয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং 'বাঙালি ও পাঞ্জাবি সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখে শাসন করতে' (পৃ. ১৭২-৩) চাইছেন, তখন তিনি প্রস্তুত হতে থাকেন কঠিন ভবিষ্যতের জন্য। আর যখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় নিহত হলেন, তখন 'পাকিস্তানে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে, তাতেই ভয় হল' (পৃ. ১৯৫) এই প্রজ্ঞাবান রাজনীতিকের। তিনি লিখেছেন, 'এরপর আমলাতন্ত্রের প্রকাশ্য খেলা শুরু হল পাকিস্তানের রাজনীতিতে। একজন সরকারি কর্মচারী হলো গভর্নর জেনারেল *(গোলাম মোহাম্মদ)*, আরেকজন হলেন অর্থমন্ত্রী *(চৌধুরী মোহাম্মদ আলী)*। খাজা সাহেব *(খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী)* ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির লোক। তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন, তবে কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগের অভাব ছিল। এ কারণে আমলাতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়াল।' (পৃ. ১৯৫)

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ। দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নেতা হিসেবে শেখ সাহেব স্পষ্টভাবেই নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এভাবে, 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি।' এরপর সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত ও পুঁজিবাদের প্রতি অবিশ্বাস একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।' (পৃ. ২৩৪)

আওয়ামী লীগ গঠন করার পর পাকিস্তানি শাসকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি লিখছেন—'আওয়ামী লীগ ও তার কর্মীরা যেকোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তারা জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র জনগণের মুক্তির পথ। ধনতন্ত্রবাদের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করা চলে। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনো দিন কোনো রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান।' (পৃ. ২৫৮)

তখনো শেখ মুজিবের মনে আশা, আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে তাঁদের স্বপ্নের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। যে

দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের কৈশোর-যৌবনের আরাম এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন সেই সাধের দেশ সম্পর্কে সব আশা ত্যাগ করা সহজ ছিল না। যখন 'লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব নূরুল আমিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী' তখন তাঁর বিচারে, 'যে নির্যাতন ও নিপীড়ন রাজনৈতিক বন্দিদের উপর *(হয়েছে)* তা দুনিয়ার কোনো সভ্য দেশে কোনো দিন হয় নাই।' (পৃ. ১৭২) কিন্তু তবুও তখনো পাকিস্তান সম্পর্কে আশা তিনি ছাড়েননি, স্বাধীন পাকিস্তানে জেলজুলুম-অত্যাচারকে 'ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস' আখ্যায়িত করলেও এই স্বাধীনতার তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেও নিজের কর্তব্য তিনি ভোলেন না—'ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে, যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই পাকিস্তানই করতে হবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম।' (পৃ. ২০৯)

কিন্তু ক্ষমতা একবার আমলাতন্ত্রের হাতে কুক্ষিগত হলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির দাপটে সেখানে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সহজে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। ফলে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বাংলার দেশপ্রেমিক তরুণসমাজ এবং এই পাকিস্তান রাষ্ট্র পরস্পরের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। ফলে, পাকিস্তানের কেন্দ্রে যখন ক্ষমতার ভোগদখল নিয়ে খেয়োখেয়ি চলছে, তখন ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে বসে বাংলার ছাত্র-তরুণেরা মাতৃভাষা ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার নিয়ে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। আমরা জানি পরবর্তী ইতিহাসে প্রমাণিত হয় যে এই তরুণসমাজই সেই চ্যালেঞ্জে শেষ পর্যন্ত সফল হয়। আর তাতে আন্দোলনের সামনের কাতারের একজন হয়ে দেখা দেন তরুণ শেখ মুজিব। সেই রোমাঞ্চকর চমৎকার গৌরবময় কাহিনির সূচনা-পর্বটুকুটই এখানে তাঁরই জবানিতে জানতে পারি আমরা।

চার.

মুসলিম লীগের সুবিধাবাদী নেতাদের চরিত্র শেখ মুজিব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তবে তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যে কঠিন ছিল, সেটা বুঝতেও কষ্ট হয়নি, 'যদিও এই সমস্ত নেতাদের আমরা একটু বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারি নাই। যার ফলে পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই এই খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীরা তৎপর হয়ে উঠে ক্ষমতা দখল করে ফেলল।' (পৃ. ৩৫)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল।' (পৃ. ৭৫) এ ছিল মূলত শেরেবাংলা ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবি ও অন্য অবাঙালি নেতাদের ষড়যন্ত্র, মূল লক্ষ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের বাসভূমি পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখা।

শেখ মুজিবের মতো নেতাদের প্রথম ধাক্কা খেতে হয় বাংলা ভাগের ফলে। তাঁরা কেবিনেট মিশনের কাছে যুক্ত বাংলা প্রত্যাশা করেছিলেন, পরে শরৎ বসু-সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত বাংলার উদ্‌যোগের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাস্তবে অন্য রকম ঘটায় শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া হয়েছে বেশ তীব্র—'আমরা কর্মীরা কি জানতাম যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে এই ভাগের ফর্মুলা? বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা।' (পৃ. ৭৩)

কিছু পরে আবার লিখছেন, 'নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম।' (পৃ. ৭৯)

নেতাদের ভুলগুলো শেখ সাহেব তাঁর সহজ বুদ্ধিতেই যেন ধরতে পারতেন। একদিকে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আর অন্যদিকে লীগের বাঙালি নেতাদের দুর্বলতা, দোলাচল, আপসকামিতার মধ্যে শেখ মুজিব বাংলার জনস্বার্থে ক্রমেই সোচ্চার হয়েছেন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা যেন ছিল জন্মগত, কৈশোর থেকেই তিনি দক্ষ সংগঠক, নিষ্ঠাবান কর্মী ও সহজাত নেতা।

পাকিস্তান আন্দোলন এবং পরে আওয়ামী লীগ গঠনের সময় আমরা লক্ষ করি, নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতা কীভাবে তাঁকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশিষ্ট করে তুলছে। এই উভয় দলেই তাঁর চেয়ে প্রবীণ নেতা ছিলেন সংখ্যায় বেশি, তাঁর চেয়ে বিদ্বান নেতার সংখ্যাও কম ছিল না, এমনকি সাংগঠনিক পদে তাঁর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন অনেকেই, কিন্তু মুজিব—একজন তরুণ কর্মী হয়েও—দিনে দিনে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। আন্দোলন-সংগ্রামের নানা বাঁকে, সরকারি জুলুম প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের নানা ফাঁদে অনেকেই পথ হারিয়েছেন। আর শেখ মুজিব পথ চলতে চলতে রাজনৈতিক গুরু, যেমন আবুল হাশিম, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব, যেমন মৌলানা আকরাম খাঁ, বর্ষীয়ান নেতা, যেমন খাজা নাজিমউদ্দিন, রাজনৈতিক সতীর্থ, যেমন অলী আহাদ—এ রকম অনেককে ছেড়ে এসেছেন, অনেককে ছাপিয়ে উঠেছেন।

কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের ও পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আর তার বিপরীতে বাঙালি রাজনীতিবিদদের আপসকামিতা ও দুর্বলতায় তিনি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এর বিপরীতে শেখ মুজিবের চরিত্রটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মধ্যে দেশ ও দশের জন্য কাজ করার প্যাশন ছিল তীব্র, তাঁর চরিত্রে দলীয় বা রাষ্ট্রীয় পদ বা অর্থবিত্তের মোহ ছিল না, ভীরুতা-কাপুরুষতা-আপসকামিতাকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন। কোনো রকম লুকোছাপা, ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও কপটতা তাঁর মধ্যে ছিল না। বরাবর সরল, খাঁটি ও সৎ

থেকেছেন তিনি। ফলে, তাঁর পক্ষে আত্মত্যাগ যেমন সহজ ছিল, তেমনি সাহসী ভূমিকা বা ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিতে পেরেছেন অনায়াসে। আর দীর্ঘদিন রাজনীতির ভেতরে থাকার ফলে কেন্দ্রের চালগুলো যেমন বুঝতেন, তেমনি সময়োচিত রাজনৈতিক চাল কী হওয়া উচিত, সেটাও ভালো বুঝতেন। কিছু ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবজাত প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতায় অর্জিত বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

যখন তিনি বর্ষীয়ান আবুল হাশিমকে মিল্লাত প্রেস বিক্রি না করার জন্য চাপ দিয়ে ভয় দেখান, তখন সেটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত চাল, আবার পরে যখন তাঁর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন সেটা তাঁর স্বভাবজাত প্রজ্ঞারই প্রকাশ ঘটায়। তিনি লিখেছেন, 'তাঁর (*আবুল হাশিম)* সাথে ভিন্নমত হতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছি, সেটা তো ভোলা কষ্টকর। আমার যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনো দিন কষ্ট হয় নাই।' (পৃ. ৮০) তেমনি আবার শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন সেটাও যে ভুল হয়েছে, তা নিজের রাজনৈতিক গুরুকে জানিয়ে দিতে তিনি দ্বিধা করেননি— 'শহীদ সাহেব ভুল করলেন, লাহোর ও ঢাকায় না যেয়ে, দেশের অবস্থা না বুঝে মন্ত্রিত্বে যোগদান করে।' (পৃ. ২৮৩)। হ্যাঁ, এমনকি ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের মোহেও জড়াননি তিনি।

পাঁচ.

শেখ মুজিবুর রহমানের জেদ ছিল মুসলিম লীগকে ব্রিটিশের খয়ের খাঁ আর জোতদার-জমিদারদের কবজা থেকে বের করে গণমানুষের দলে পরিণত করবেন। আর সেভাবে সদ্য স্বাধীন দেশটি যাতে এদের মতো অপদার্থ নেতাদের কারণে আমলাতন্ত্রের হাতে ষড়যন্ত্রের পীঠস্থানে পরিণত না হয়, সে তাগিদ বোধও তাঁর মধ্যে কার্যকর ছিল।

কিন্তু তাঁর এই জনদরদি মন, দেশ ও মানুষের প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার, বিভিন্ন ইস্যুতে ক্ষমতার অন্ধ অনুকরণ না করে জনকল্যাণের বিচারে অবস্থান গ্রহণের ফলে তিনি হয়ে ওঠেন পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের চোখে বিপজ্জনক ব্যক্তি। অবশ্য পাকিস্তান তাঁর তুলনায় মধ্যপন্থী ও নমনীয় নেতা শেরেবাংলা বা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহী আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। আর শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলন, বন্দিমুক্তি, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে স্বাধীনতার পরের বছর থেকেই পাকিস্তান সরকারের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছেন। এদিকে বাংলার মুসলিম লীগ রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল অংশে বিভক্ত ছিল গোড়া থেকেই। পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হওয়ার পরে এবং ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

এই বিভাজন থেকে দলের মধ্যে নানা রকম মেরুকরণ হতে থাকল। এ সময় ফজলুল কাদের, শাহ আজিজসহ অনেক তরুণ নেতা ক্ষমতার প্রসাদ পেতে রক্ষণশীল দলে যোগ দেন। এসবই হয়েছে লিয়াকত আলীর নেতৃত্বে কোটারি ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হওয়ার কারণে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে তরুণ নেতা শামসুল হকের কাছে মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নী পরাজিত হন। পাকিস্তানের জন্য জোয়ার সৃষ্টিকারী দলের এ পরিণতির কারণ, শেখ সাহেবের ভাষায়, 'কোটারি, কুশাসন, জুলুম, অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করার ফলে।' (পৃ. ১১৯) আর তাই জেলে বসে তিনি কর্মী সম্মেলনের সংগঠকদের জানাতে কুণ্ঠিত হন না, 'আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না।' (পৃ. ১২০) শেখ সাহেব জেলে থাকতেই কর্মী সম্মেলন থেকে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

এবার শেখ মুজিবের লক্ষ্য হলো পাকিস্তানকে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। তাই স্বভাবতই তিনি থাকলেন নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে। তিনি হলেন প্রথম কমিটির প্রথম জয়েন্ট সেক্রেটারি। সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং সম্পাদক শামসুল হক; আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আলী আমজাদ খান প্রমুখ হলেন সহসভাপতি।

আওয়ামী লীগের খসড়া মেনিফেস্টোতে এ দেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল। এই দাবি এবং সরকারবিরোধী ভূমিকার আশঙ্কা থেকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান জন্মলগ্নেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আওয়ামী মুসলিম লীগের ওপর—'নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান সভায় ঘোষণা করলেন, 'যো আওয়ামী লীগ করে গা, উসকো শের হাম কুচাল দে গো।' (পৃ. ১৩৪)

আওয়ামী লীগের ওপর পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে মওলানা ভাসানীর পরামর্শে শহীদ সাহেবের সহযোগিতায় দলকে সারা পাকিস্তানভিত্তিক করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর প্রত্যুত্তরে লিয়াকত আলী সোহরাওয়ার্দীকে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়ে বলেছেন, 'ভারত কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে।' (পৃ. ১৩৫)

একদিকে পাকিস্তান সরকারের আক্রমণ, ষড়যন্ত্র ও নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি চলেছে আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগ দল গঠনের কাজ চলছিল। আমরা লক্ষ করি, একদিকে দলকে পাকিস্তানভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোতে গড়ে তোলার কাজ

কখনোই যথেষ্ট শক্ত ভিত্তি পায়নি, আর অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে এ দলের সাংগঠনিক ভিত্তি সরকার ও ষড়যন্ত্রকারীদের শত বাধার মুখেও কেবল শক্তিশালী ও ব্যাপ্ত হয়েছে। দেখা যায় সভাপতি মওলানা ভাসানীর মধ্যে নানা সময়ে দোলাচল থাকলেও—যা শেখ সাহেব নিজেও লক্ষ করেছেন—তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে সভা-সমিতির মাধ্যমে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে শেখ মুজিবকে সহায়তা দিয়েছেন। সম্পাদক শামসুল হক তত দিনে অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলের সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব প্রধানত জয়েন্ট সেক্রেটারি মুজিবের কাঁধে এসে পড়েছে। বস্তুত শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন দলের সাংগঠনিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু এবং তারও চেয়ে বড় কথা, কেন্দ্রে ও সারা দেশের কর্মীবাহিনীর প্রেরণা, ভরসা ও দিশারি নেতা হয়ে উঠেছেন শেখ মুজিব। ফলে, শামসুল হকের অসুস্থতার পর সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তাঁর কথাই যে নেতা-কর্মী সবার মনে পড়বে, সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

সাংগঠনিক কাজ আর জেল-জুলুম-অত্যাচারের ভেতর দিয়ে শেখ মুজিব এক দৃঢ়চেতা তরুণ দলীয় নেতা থেকে ক্রমে জনগণের নেতায় পরিণত হচ্ছিলেন। মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় সারা দেশে সংগঠন গড়ে তোলার কাজের মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব—'শহীদ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলায় ঘুরে ঘুরে প্রতিষ্ঠান গড়তে সাহায্য করতে লাগলেন। প্রত্যেকটা জনসভার পরেই আমি জেলা ও মহকুমার নেতাদের ও কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা করে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহায্য করতে লাগলাম।' (পৃ. ২৩৫)।

অন্যত্র লিখেছেন—'মওলানা ভাসানী, আমি ও আমার সহকর্মীরা সময় নষ্ট না করে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। পূর্ব বাংলার জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে এক নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম।' (পৃ. ২৪৩)

শেখ মুজিব কেবল সংগঠন গড়ে তোলেননি, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংকট এবং বাঙালির ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিগ্‌দর্শনেরও সন্ধান পাচ্ছিলেন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন; পূর্ব বাংলার সম্পদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন, অর্থাৎ বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয়টি তিনি তখনই অনুধাবন করেছেন। এ ছাড়া পাঞ্জাবি আমলা চক্রের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার এবং এর অংশ হিসেবে 'পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার ধুয়া তুলে রাজনীতিকে বিষাক্ত করে' (পৃ. ২৪১) তোলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন। একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করে সংগঠন দাঁড় করাতে গিয়ে শেখ মুজিব একদিকে অনেক নেতা-কর্মীর দোলাচল, দুর্বলতা ও দলাদলি দেখে হতাশ হয়েছেন আর অন্যদিকে কর্মীদের ত্যাগ

ও সংগ্রামী স্পৃহা দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন-পর্যায়ে শেখ মুজিব কিন্তু এর বিরোধিতা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত বেশ কঠোর ছিল বলা যায়। সভায় যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধিতা করে তাঁর বক্তৃতায় শেখ সাহেব বলেছিলেন—'যাদের নীতি ও আদর্শ নাই তাদের সাথে ঐক্যফ্রন্ট করার অর্থ হল কতকগুলি মরা লোককে বাঁচিয়ে তোলা। এরা অনেকেই দেশের ক্ষতি করেছে। রাজনীতি এরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে করে, দেশের কথা ঘুমের ঘোরেও চিন্তা করে না।' (পৃ. ২৪৮)

এ বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন বেশ প্রণিধানযোগ্য—'যাদের সাথে নীতির মিল নাই, তাদের সাথে মিলে সাময়িকভাবে কোন ফল পাওয়া যেতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ঐক্য থাকতে পারে না, তাতে দেশের উপকার হওয়ার চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে।' (পৃ. ২৪৫) তিনি এ সময় শেরেবাংলার কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলামী বা কমিউনিস্টদের সম্পর্কেও প্রায় সমভাবেই অনাস্থা পোষণ করছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর একজন খাঁটি গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এটি রক্ষার এবং নির্বাচনী বিজয়ের জন্য কাজ করে গেছেন।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনি সাধারণ কর্মী ও জনসাধারণের কাছাকাছি এসে তাদের মন জয় করেছিলেন। এবার তাঁর উপলব্ধি হয়, 'মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে, যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্যে জীবন দিতেও পারে।' (পৃ. ২৫৭) এই হলো তাঁর দলের নেতা থেকে জননেতায় পরিণত হওয়ার সূচনা। তাঁর অঙ্গীকার যেমন বাড়ল, তেমনি বাড়ল সংগ্রামের সাহস, ত্যাগের স্পৃহা এবং বাড়ল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। এ যেন তাঁর শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সরকার ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়—বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা লাগিয়ে, ক্ষমতালোভী নেতাদের ভাগানোর চেষ্টা চালিয়ে, দুর্বলচিত্ত নেতাদের ভয় দেখিয়ে। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত তাদের কাজ হাসিলও করে নেয়। ৯২ ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া, শেখ মুজিবসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবকে দিয়ে ভুল স্বীকার করিয়ে বিবৃতি লিখিয়ে পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক বিজয় তারা ছিনিয়ে নেয়। শেখ সাহেবের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হলো। শেখ সাহেবের মনে হয়েছে, 'এই দিন থেকেই বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশ সেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়।' (পৃ. ২৭৩)

আমরা লক্ষ করি হক সাহেব, এমনকি শহীদ সাহেব, তা ছাড়া আতাউর রহমান খানসহ যুক্তফ্রন্টের সিনিয়র নেতাদের পাকিস্তান সরকার আপসে বাধ্য করতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে শেখ সাহেবের জন্য তাঁদের অগ্রাহ্য করে বা প্রয়োজনে মোকাবিলা করে এগোনো ছাড়া পথ থাকেনি।

পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে আমরা দেখি আরও জঘন্য সব ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ডিগবাজি, চরম নির্যাতন ও স্বৈরাচারী দুঃশাসনের বাধা ডিঙিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী মানুষের জয়যাত্রার রথ সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় নেতা ও সমসাময়িক কালের নেতৃবৃন্দকে ধীরে ধীরে ছাপিয়ে উঠেছেন তিনি। সে কাহিনি সবার জানা হলেও তাঁর জবানিতে সে ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার স্বাদ যেমন ভিন্ন হতো, শিক্ষাও হতো সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা আশা করে থাকলাম, অদূরভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পূর্ণতা লাভ করবে। হারানো অমূল্য সম্পদ একদিন নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

লে খ ক প রি চি তি

সিরাজুল ইসলাম

ইতিহাসবিদ ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। বাংলাপিডিয়ার সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি। *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*-এর সম্পাদক। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সিনিয়র কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো ও ব্রিটিশ একাডেমির অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা—[সম্পা] *হিস্টোরি অব বাংলাদেশ* (১৯৯০); *পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল* (১৯৭৮); [সম্পা] *রুরাল হিস্টোরি অব বাংলাদেশ: আ সোর্স স্টাডিজ* (বাংলাদেশ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, ১৯৭৭)।

মির্জা হাসান

সমাজবিজ্ঞানী এবং বর্তমানে ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থা-বিষয়ক মুখ্য গবেষক। পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন এবং এমআইটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তাঁর গবেষণা মূলত—রাজনৈতিক উন্নয়ন, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, জাতীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এবং দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিচারব্যবস্থা ও মানবাধিকার বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ।

পাভেল পার্থ

লেখক ও গবেষক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*মধুপুরের প্রাণবৈচিত্র্য*, *অরণ্যের লড়াই*, *খাদ্য-লংঘন ও লড়াই*, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা*, *কৃষকের বীজ অধিকার* ইত্যাদি। ছোট কাগজ, জার্নাল ও নানান স্থানীয় প্রকাশনাসহ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বারসিক নামের এক বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

রাহমান চৌধুরী

লেখক, গবেষক ও নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*মহাবিদ্রোহ ও সম্রাট বাহাদুর শাহ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫); *ক্রীড়নক* (বাংলা একাডেমী, ২০০১); *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক* (বাংলা একাডেমী, ২০০৭); 'মুক্তিযুদ্ধ, 'দুই বিঘা জমি' এবং বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের পুড়ে যাওয়া বিবেক' (সাপ্তাহিক ২০০০, ২০০৫)।

আবুল মোমেন

কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*বাঙালির আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (সময়, ২০০৯); *বাংলাদেশের হৃদয় হতে* (প্রতিক্ষণ, ১৯৯৯); *বাংলা ও বাঙালির কথা* (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫)।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক-কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১